ইতিহাসের অন্তরালে

ফারুক মাহমুদ

ইতিহাসের অন্তরালে

ফারুক মাহমুদ

ওয়েসিস বুকস

www.nagorikpathagar.org

ইতিহাসের অন্তরালে

ওয়েসিস বুকস–তিন

লেখক	ঃ	ফারুক মাহমুদ
প্রকাশক	ঃ	চৌধুরী মোহাম্মদ ফারুক
প্রথম প্রকাশ	ঃ	ডিসেম্বর, ১৯৮৯
ব্যবস্থাপনা	ঃ	কামাল পাশা বাদশা মন্ডল
পরিবেশক	ঃ	ওয়েসিস বুকস্ ২৮, টয়েনবি সার্কুলার রোড মতিঝিল, ঢাকা–১০০০
প্রচ্ছদ	ঃ	হামিদুল ইসলাম
কম্পিউটারাইজড টাইপ সেটিং ও মুদ্রণ	ঃ	বুক প্রমোশন প্রেস ২৮, টয়েনবি সার্কুলার রোড মতিঝিল, ঢাকা–১০০০

মূল্য ঃ	শোভন	ঃ	১০০·০০ (একশত) টাকা মাত্র
	স্টুডেন্টস	ঃ	৩৫·০০ (পয়ত্রিশ) টাকা মাত্র

সর্বস্বত্ব লেখক কর্তৃক সংরক্ষিত

www.nagorikpathagar.org

উৎসর্গ

কালের অতল অন্ধকারে নিমজ্জিত মুসলিম বাংলার ইতিহাস উদ্ধারে
আজীবন ডুবুরীর ভূমিকায় কাজ করে জাতিকে যিনি উপহার দিয়ে গেছেন
অমূল্য ঐতিহাসিক তথ্যসম্ভার, সেই
ডক্টর মুহম্মদ আবদুর রহীমের
রূহের মাগফেরাত কামনা করে
এবং
তাঁর অনুসারী মুসলিম বাংলার ইতিহাস উদ্ধারে নিবেদিতপ্রাণ, অগ্রজপ্রতিম
ডক্টর মুহম্মদ মোহর আলীর
দস্তমুবারকে

www.nagorikpathagar.org

ITIHASHER ANTORALEY

Oasis Books - 3

Author	:	Farook Mahmood
Publisher	:	Chowdhury Mohammad Farouque
Price	:	BDT 100 Only & U. S. $ 5

www.nagorikpathagar.org

প্রকাশকের কথা

ইতিহাস হলো একটি জাতির দর্পণ। এ দর্পণে প্রতিবিম্বিত হয় যে কোন একটি জাতির অতীত রাজনৈতিক ও আর্থ-সামাজিক কর্মকাণ্ডের সাফল্য-ব্যর্থতা, দোষ-ত্রুটির প্রতিচ্ছবি। এই রাজনৈতিক ও আর্থ-সামাজিক কর্মতৎপরতা সব সময়ই যে সাফল্যের ও গৌরবের জয়টিকা বহন করে এমনও নয়। এতে থাকতে পারে ত্রুটি-বিচ্যুতির গভীর ক্ষতচিহ্ন। এতে অনুরণিত হয়ে উঠতে পারে না-পাওয়ার শত সহস্র মৌন বেদনা। এ সাফল্য ও ব্যর্থতাকে বুকে নিয়েই ইতিহাস কথা বয়ে নিয়ে যায় কাল থেকে কালান্তরে। উত্তরাধিকারীরা ইতিহাসের এই রাজনৈতিক, আর্থ-সামাজিক ঘটনাবলীর চুলচেরা বিশ্লেষণপূর্বক ভুলত্রুটি পরিহার করে নতুন যাত্রাপথের সন্ধান পায়। আর এ কারণে ইতিহাস একটি জাতির উৎসভূমিও বটে।

উপমহাদেশের যে অঞ্চলে আমাদের বসবাস-কালের যাত্রাপথে এর বিভিন্ন নামকরণ হয়েছে। বঙ্গ, বাংলা, সুবে বাংলা এবং হালে বাংলাদেশ। এরও রয়েছে এক সুপ্রাচীন ইতিহাস। জাতি হিসাবে আমাদের এ ইতিহাস গৌরবোজ্জ্বল অনেক শৌর্য-বীর্যের কাহিনীতে ভরপুর। এর সীমাহীন সম্পদ, জীবন, প্রাচুর্যের কথা রূপকথার মতো শোনাতো বিশ্ববাসীর কাছে। এ সম্পদের আকর্ষণে ছুটে এসেছে ভাগ্যান্বেষীর দল। এসেছে অগণিত বিদেশী পর্যটক। তারা লিখে গেছেন এ শান্তির দ্বীপের সীমাহীন সম্পদ আর প্রাণ প্রাচুর্যের কথা। অষ্টাদশ শতকের মাঝামাঝি পর্যন্ত, যখন এ এলাকা 'সুবে বাংলা' হিসেবে পরিচিত, এর সম্পদ ও জীবনবৈভব ছিল কিংবদন্তীর মতো। কিন্তু এরপর ষড়যন্ত্রের পথ বেয়ে এলো সর্বনাশা এক ঝড় পরাধীনতার শৃঙ্খল নিয়ে। এ ঝড় ১৭৫৭ সালে পলাশীর ময়দানে এখানকার রাজনীতি, অর্থনীতি ও সমাজ জীবনকে সমাধিস্থ করে দিল। এদেশবাসী হারালো দেশ শাসনের রাজনৈতিক অধিকার, ব্যবসা-বাণিজ্যের সকল সুযোগ-সুবিধা এবং সর্বোপরি জীবন ধারণের ন্যূনতম সুযোগ। এ দেশের সীমাহীন সম্পদ লুণ্ঠিত হলো। প্রতিবাদে বিদ্রোহে মুখরিত হলো জনপদ। বর্বরভাবে স্তব্ধ করে দেয়া হয় সে বিদ্রোহকে। স্বদেশী এক সম্প্রদায়ের লোকদের সহযোগিতায় বিদেশী ঔপনিবেশিক শক্তি এ বিদ্রোহকে দমন করে বর্বরোচিতভাবে। তাদের রোষানলে জনপদের পর জনপদ জ্বলেপুড়ে ছারখার হয়ে যায়। বিরান হয়ে যায় অনেক জনপদ। একই সাথে নিশ্চিহ্ন করে দেয়া হয় প্রকৃত ইতিহাসকে। শৃঙ্খলিত হতচকিত কঙ্কালসার জাতির স্কন্ধে চাপিয়ে দেয়া হয় বিকৃত তথ্যে ভরপুর এক নয়া ইতিহাস। বিদেশী লেখকদের রচিত এ ইতিহাসে ক্ষমতাচ্যুত শাসককুল ভোগ বিলাসে মত্ত চরিত্রহীন অপদার্থ বৈ আর

www.nagorikpathagar.org

কিছু নয়। আর দেশপ্রেমিক বিদ্রোহীরা এদের চোখে তস্কর লুটেরা। অন্যদিকে স্বদেশী সম্প্রদায়বিশেষের রচিত ইতিহাস বিদেশী প্রভুর মনোরঞ্জন আর পদলেহনের সর্বাত্মক অপপ্রয়াসের অনবদ্য দলিল। এ ইতিহাসে নেই এই জাতির শৌর্য-বীর্যের কথা, বিদ্রোহের কথা, দেশপ্রেমের কথা।

মিথ্যার কুয়াশা ভেদ করে সাম্প্রতিককালে এদেশের সত্যিকারের ইতিহাসের পাতা উন্মোচিত হচ্ছে। অনুসন্ধিৎসু ইতিহাস গবেষকগণ সাহসিকতার সাথে এগিয়ে আসছেন। জনাব ফারুক মাহমুদ তেমনি এক অক্লান্ত সাহসী গবেষক। 'ইতিহাসের অন্তরালে' বইটিতে লেখক ফারুক মাহমুদ বিদেশী পর্যটক ও বিদ্বানদের রচিত গ্রন্থরাজি থেকে প্রমাণপঞ্জি সংগ্রহ করে দীর্ঘদিন অক্লান্ত পরিশ্রম ও গবেষণার মাধ্যমে ইংরেজ ও হিন্দু ঐতিহাসিকদের রচিত মুসলিম বিদ্বেষী বানোয়াট ইতিহাস-এর অসারতা প্রমাণের সযত্ন প্রয়াস চালিয়েছেন। "ইতিহাসের অন্তরালে" বইটি জাতীয় ইতিহাসের উৎসভূমি খুঁজে বের করতে ভবিষ্যতের গবেষকদের কাছে সহায়ক গ্রন্থ হিসেবে বিবেচিত হবে বলে আমাদের বিশ্বাস।

চৌধুরী মোহাম্মদ ফারুক

www.nagorikpathagar.org

লেখকের কথা

রহমান ও রহীম আল্লাহর নামে।

ইতিহাস কেবল অতীতের অন্ধকারে ফেলে আসা ঘটনাবলীর সমাহারই নয়। কালের প্রেক্ষিতে ইতিহাস অতীতের কোন এক অধ্যায়কে ধারণ ক'রে থাকলেও তার প্রভাব, প্রতিক্রিয়া ও দুর্নিরীক্ষ সর্বপ্লাবিতা বর্তমানকে অতিক্রম করে অনন্ত ভবিষ্যত অবধি কার্যকারণসূত্রে ঘটনা-পরম্পরায় ক্রিয়াশীল থাকে। বলা চলে, কি ব্যক্তিজীবনে, কি সমাজ জীবনে, ইতিহাস পেছন থেকে বীকন লাইটের মতো আলোক-সম্পাত ক'রে চলমান ব্যক্তি বা জাতিকে পথের দিশা দেয়। সমৃদ্ধ ইতিহাসের উজ্জ্বল আলো সঠিক কৌনিক অবস্থান থেকে সম্পাতিত হলে তাতে যেমন অভ্রান্ত পথের সন্ধান মেলে, তেমনি ভাবিকালীন পথচারীদের পথ-পরিক্রমনও সহজ হয়। এখানেই ইতিহাস ও ইতিহাসলালিত ঐতিহ্যের গুরুত্ব।

কোন জাতির ইতিহাস না থাকা দুঃখজনক। কিন্তু ইতিহাস থাকা সত্ত্বেও যে জাতি আপন ইতিহাস জানে না তারা সত্যিই হতভাগ্য।

বাংলাদেশের, সংখ্যাগুরু মুসলমানের দেশ বাংলা মুলুক-এর ইতিহাস আছে। ১৫, ১৬, ১৭ ও ১৮ শতকের পৃথিবীতে সবচেয়ে সমৃদ্ধ ইতিহাসের অধিকারী ছিল বাংলা মুলুক। ইউরোপ, আফ্রিকা ও এশিয়ার শত শত পর্যটক, বণিক ও বিদ্বজ্জনের লেখা গ্রন্থরাজি, লেন-দেনের হিসাব-পত্র, বর্ণনা-পঞ্জী সাক্ষ্য দেয় যে, সেকালের পৃথিবীতে সবচেয়ে বিত্তশালী, শিক্ষিত ও সমৃদ্ধ দেশ ছিল এই বাংলা মুলুক। বাংলা মুলুকের কোন মুসলিম সন্তান অশিক্ষিত ছিল না, ছিল না অভাবগ্রস্ত। কিন্তু সম্পদের প্রাচুর্যই তাদের সর্বনাশ ডেকে আনলো। 'সম্পদ মানুষকে কবরে না যাওয়া পর্যন্ত বিপথগামী করবেই'-আল-কুরআনের এই অমোঘ হুঁশিয়ারীই ললাটলেখা হয়ে দাঁড়ালো বাংলার মুসলমানের।

মোঘলাই মুসলমানেরা বাংলার ক্ষমতা দখলের সময় থেকেই সুরা ও নারীর যোগানদার হিসেবে হেরেমবালাদের আঁচল ধরে বাংলায় আগত রাজপুত ও হিন্দুস্তানী তথাকথিত কুলীন বর্ণহিন্দু রাজা-মহারাজারা সুবাহ বাংলার প্রশাসন কব্জা করতে থাকেন। কালে তুর্ক আফগান, খান পাঠান সামন্তকূলকে উৎখাত করে মুর্শিদ কুলী খাঁর আমল অবধি এসে তারা হয়ে ওঠেন সর্বেসর্বা। ১৮ শতকের প্রথমার্ধে দক্ষিণ এশীয় উপমহাদেশব্যাপী রাজপুত-মারাঠা-জাঠ-শিখ শক্তির নেতৃত্বে মুসলিম নিধন অভিযান পরিচালনার অধ্যায়ে বাংলার এই অবাংগালী রাজা মহারাজারাও ষড়যন্ত্রের জাল বুনতে শুরু করেন। ইংরেজকে ডেকে এনে তারা

www.nagorikpathagar.org

বাংলার মুসলমানদেরকে নিশ্চিহ্ন করার প্রথম নাটক মঞ্চস্থ করেন পলাশীতে, ১৭৫৭–এর ২৩শে জুন। ঘটনাচক্রে ইংরেজই সিনিয়র পার্টনার হিসেবে রাজা হয়ে বসে।

অতঃপর বৃটিশ বর্ণহিন্দু যৌথ অভিযানে লুন্ঠিত হয় সোনার বাংলা। প্রতিবেশীর প্রতি ঈর্ষা–বিদ্বেষে অন্ধ হয়ে স্বদেশের বিপুল সম্পদ বিদেশে পাচারের এমন আত্মঘাতি দৃষ্টান্ত পৃথিবীর ইতিহাসে আর নেই।

মাত্র ১৩ বছরের মধ্যে কৃত্রিম দুর্ভিক্ষ সৃষ্টি করে হত্যা করা হয় বাংলার ৭৫ লক্ষ মুসলমান ও ২৫ লক্ষ শূদ্রাদি জনসাধারণকে। এতো কালের মুসলিম সংখ্যাগুরু বাংলায় মুসলমানেরা হয়ে পড়েন সংখ্যালঘু। কেড়ে নেয়া হয় তাদের জমি–জিরাত ভ–ূসম্পত্তি। ১৮৩৮ সালের মধ্যে সম্পূর্ণ ধ্বংস করে দেয়া হয় তাদের ১ লক্ষ অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয়, হাজার হাজার অবৈতনিক স্কুল–কলেজ ও কয়েক গন্ডা বিশ্ববিদ্যালয়। ১৮৫৮ সালের মধ্যেই, এক কালের সারা বিশ্বের সবচেয়ে শিক্ষিত ও সমৃদ্ধ জাতি বাংগালী মুসলমানকে পরিণত করা হয় নিরেট–নিরক্ষর কুলীকামিন ক্ষেত–মজুরের জাতিতে। 'ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ ষড়যন্ত্রের' মাধ্যমে ইংরেজী ভাষাকে রাষ্ট্রভাষারূপে বরণ করে নিয়ে, সাড়ে পাঁচ শত বছরব্যাপী বাংলার সরকারী ভাষার মর্যাদায় আসীন ফারসী ভাষাকে বিসর্জন দেয়া হয়– ছুঁড়ে ফেলে দেয়া হয় তার পাশাপাশি গড়ে ওঠা এদেশবাসীর মুখের জবান বহমান বাংলাভাষা আর সে ভাষায় রচিত সাহিত্যসম্ভারকে। সেই সাথেই নিশ্চিহ্ন করা হয় বাংলা মুল্‌কের মুসলিম আমলের সব ইতিহাস ঐতিহ্যগাঁথা।

এ সময়েই, পলাশী যুদ্ধের ৯০ বছর পর, ইংরেজ দস্যুদের জুনিয়র পার্টনার সেকালের রাজা মহারাজা গোষ্ঠীর বংশধর কোলকাতায়ী বাবু বুদ্ধিজীবীরা মিলিতকন্ঠে চিৎকার করে ওঠেন ''বাঙ্গালার কোন ইতিহাস নেই।'' সুতরাং, সিনিয়র পার্টনার ইংরেজ কর্মচারীদের আত্মপক্ষ সমর্থনে লেখা ''সাফাই"–তথ্য অবলম্বনে প্রথম বাঙ্গালার ইতিহাস রচনা করেন হিন্দু জাগরনের বৃটিশপোষ্য পুরোধা পন্ডিত ঈশ্বর চন্দ্র, ১৮৪৮ সালে। বাংলার আসল ইতিহাসকে অস্বীকার করে বানোয়াট ইতিহাস বানানোর যে উদ্যোগ বিদ্যাসাগর মহাশয় গ্রহণ করেন তাকে আরো জোরদার করার লক্ষ্যে হিন্দু পুনর্জাগরণের ঋষি বংকিমচন্দ্র আহবান জানান বাবু বুদ্ধিজীবীদের কাছে, ''বাঙ্গালার কোন ইতিহাস নাই। বাঙ্গালার ইতিহাস লিখিতে হইবে। কে লিখিবে? তুমি লিখিবে, আমি লিখিব। আমরা সকলে মিলিয়া লিখিব।'' সে আহবানে সাড়া দিয়ে তারা লিখেছেনও। বাংলার ধ্বংসপ্রাপ্ত মুসলমান সমাজের বুকের উপর দাঁড়িয়ে তারা এক শতাব্দী ধরে রাশি রাশি বানোয়াট বায়া

www.nagorikpathagar.org

দলীলের রঙ্গীন সূত্রে রচনা করেছেন ইতিহাসের নয়নাভিরাম উর্ণাজাল। এ উর্ণাজাল পূর্ণরূপ লাভ করে চলতি শতকের চল্লিশের দশকে, তৎকালীন কোলকাতা ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সহ অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কর্মরত বাবু অধ্যাপকদের হাতে। তাই তারা এক দিকে সাড়ে পাঁচ শত বছর ব্যাপী মুসলিম শাসনামলের উজ্জ্বল দিকগুলোকে পাইকারীভাবে বাদ দিয়ে সর্বক্ষেত্রে সাধ্যমতো কলংক লেপন করেছেন এবং অন্যদিকে, ইংরেজ শাসনামলে বৃটিশ-বর্ণহিন্দু যৌথ অভিযানে বাংলার মুসলমানদের ধ্বংস করার কাহিনীও গোপন করে গেছেন।

ত্রিশ-চল্লিশের দশকে যে দু-এক জন বাংগালী মুসলিম সন্তান তাদের কাছে ইতিহাসের পাঠ গ্রহণের সুযোগ পান তারাও বাধ্য ছিলেন বাবুদের লেখা ইতিহাস মুখস্ত করে পরীক্ষায় ভাল ফল লাভের প্রয়োজনে তাদের মনোরঞ্জন উপযোগী উত্তরপত্র লিখতে। পাকিস্তান কায়েমের পর বাবু অধ্যাপকেরা ভারতে চলে গেলে শূণ্য আসনগুলো তাদের দখলে আসায় সহজে অনাস্বাদিত সুখী জীবনের স্বাদ পেয়ে তারা উত্তরোত্তর আরো বেশী সুখৈশ্বর্য আহরণে ব্যস্ত থাকায় শ্রমসাধ্য গবেষণায় লিপ্ত হবারসুযোগ পাননি।

তবু চল্লিশ-পঞ্চাশ দশকে উচ্চশিক্ষা প্রাপ্ত কিছু সংখ্যক মুসলিম তরুণের মনে বাবুদের বানোয়াট ইতিহাস প্রতিবাদের ঝড় তোলে। তাঁদের মধ্যে ডক্টর আবদুর রহীম, ডক্টর মোহর আলী, ডক্টর হাসান জামান, ডক্টর মমতাজুর রহমান তরফদার, ডক্টর আব্দুল করীম, ডক্টর এ, আর, মল্লিক, অধ্যাপিকা লতিফা আখন্দ, ডক্টর সুফিয়া আহমদ, ডক্টর শীরিন আখতার, ডক্টর এনায়েতুর রহীম, ডক্টর মঈন উদ্দিন খান, ডক্টর এম, এফ, ইউ, মোল্লা ডক্টর বজলুর রহমান খান প্রমুখ কয়েকজন কঠিন পরিশ্রম করে বাংলার ইতিহাসের যে তথ্যাবলী তুলে ধরেছেন, তাতে দিকপাল বাবু ঐতিহাসিকদের বুদ্ধিবৃত্তিক চেহারা অত্যন্ত নগ্ন উৎকটভাবে ধরা পড়েছে। কিন্তু বেদনাদায়ক হলেও সত্য যে এদের উদ্ধার করা তথ্যাবলী এখনো বাংলার মুসলিম তরুণদের হাতে পৌঁছানো হচ্ছে না। সাম্প্রতিক ও সমকালীন রাজনৈতিক ও অন্যবিধ কারণে বাবুদের রচিত বানোয়াট ইতিহাসেরই চর্বিত-চর্বণ এদেশের স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদেরকে গলধঃকরণ করিয়ে হীনমন্যতার শিকারে পরিণত করা হচ্ছে।

এমন কি, বাংলাদেশসহ দক্ষিণ এশীয় উপমহাদেশের চলতি শতকের ইতিহাসও বৃটিশ-বর্ণহিন্দু চক্রান্তের দরুন ব্যাপক বিকৃতির হাত থেকে রেহাই পায়নি। মুসলমানদের আর্থ-সামাজিক অস্তিত্ব অবলুপ্ত করার বৃটিশ-বর্ণহিন্দু ষড়যন্ত্রের অংশ হিসেবেই যে পরিকল্পিতভাবে 'ক্ষণস্থায়ী' "ছেঁড়া-কাটা পোকায়-

www.nagorikpathagar.org

খাওয়া" পাকিস্তান চাপিয়ে দেয়া হয়েছিল; ব্রাহ্মণ্যবাদী কংগ্রেস নেতৃত্বের সাথে যোগসাজস করেই যে বাংলা ও পাঞ্জাবকে বিভক্ত করা হয়েছিল তৎসম্পর্কিত দলীল-দস্তাবেজ মাত্র এক দশক আগেও বিশ্ববাসীর অজ্ঞাত ছিল। আজ তা অকাট্যভাবে প্রমাণিত, দিবালোকের মতোই সত্য।

সন্ত্রাসী তৎপরতার মোকাবিলা করা সন্ত্রাসবাদ নয়। সাম্প্রদায়িক আগ্রাসনের বিরুদ্ধে নিন্দাবাদ উচ্চারণও আগ্রাসী সাম্প্রদায়িকতা নয়। সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশ ও ব্রাহ্মণ্যবাদী পশ্চিমা-রাজা-মহারাজাদের ষড়যন্ত্রমূলক নৃশংসতার নিন্দাভাষণ অর্থ বাংলার সাধারণ হিন্দু সমাজের বিরুদ্ধে বিষোদ্গার নয়।

ইসলাম শান্তির ধর্ম। সপ্তম থেকে অষ্টাদশ শতক অবধি হাজার বছর ধরে বিশ্বব্যাপী মুসলিম প্রাধান্যের যুগে সারা পৃথিবীতে, তাই, মুসলমানেরা অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের সাথে শান্তি ও সম্প্রীতি বজায় রেখেই সহ-অবস্থান করেছেন। বাংলা মুল্‌কেও সাড়ে পাঁচ শত বছর ব্যাপী মুসলিম শাসনামলে কোথাও কখনো সাম্প্রদায়িক শান্তি ক্ষুন্ন হয়নি। এমন কি বৃটিশ শাসনের অবসানে পূর্ব পাকিস্তান বা বাংলাদেশেও সাম্প্রদায়িক শান্তি ও সম্প্রীতি অক্ষুন্ন রয়েছে- যদিও অসাম্প্রদায়িকতার নামাবলী গায়ে কাশ্মীরী-মারাঠী-রাজপুত শাসিত ভারতে সাম্প্রদায়িক সংঘাত-সংঘর্ষ ও হত্যালীলা নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে আছে।

মুসলিম শাসিত বাংলা মুল্‌কে সাম্প্রদায়িক বিভেদের বীজ প্রথম বপণ করেন, ইংরেজদেরকে ক্ষমতায় বসানোর পূর্ববর্তী চার দশকে, বাংলার প্রশাসনের গুরুত্বপূর্ণ আসনগুলোতে জেঁকে বসা পশ্চিমা কুলীন বর্ণহিন্দু রাজা মহারাজারা। আর বৃটিশ শাসনের অবসানে বাংলাকে দ্বি-খন্ডিত করেন বাংলার মুসলিম-অমুসলিম জনসাধারণের ব্যাপক বিরোধিতাকে উপেক্ষা করে, গান্ধী-নেহেরু-প্যাটেল-মেনন-কৃপালনী প্রমুখ পশ্চিমা ব্রাহ্মণ্যবাদী নেতৃত্ব। কোলকাতা মহানগরীকে অযৌক্তিকভাবে জোরপূর্বক ভারতভুক্ত করার পরিণতিতে বাংগালী বাবুরা বড় বড় প্রাসাদের দারোয়ান ঝাড়ুদারের সম্মান পেয়েছেন ঠিকই, আর যা পাবার সবই অব্যাহতভাবে পাচ্ছেন পশ্চিমা কুলীন কোটিপতিরা।

সত্যকে যত গভীরেই মাটিচাপা দেয়া হোক তা আপন বিভায় বিকশিত হবেই। সত্যের স্বাদ যত তিক্তই হোক না কেন, কারো না কারো জবানীতে তা প্রকাশ পাবেই। ইসলামী জীবনাদর্শের অনুসারী হিসাবে আমার কোন সম্প্রদায়ের প্রতি অহেতুক বিদ্বেষভাব পোষণ করা হারাম। তাই সাধ্যমতো বিদ্বেষমুক্ত মনে সত্য ভাষণের চেষ্টা আমি করেছি। তা সত্ত্বেও কোদালকে কোদাল বলায় কেউ যদি অস্বস্তি বোধ করেন সেক্ষেত্রে আমি নেহায়েত লাচার।

www.nagorikpathagar.org

আমি নিজে ইতিহাসের পন্ডিত, অধ্যাপক বা ছাত্রও নই; একজন উৎসাহী পাঠক মাত্র। বাংলার ইতিহাস পড়তে গিয়ে যে প্রশ্নগুলো আমাকে পীড়া দিয়েছে, তার উত্তর খুঁজতে গিয়ে আরো কিছু পড়াশোনা করেছি, চিন্তা-ভাবনা করেছি এবং সেই চিন্তা-ভাবনাগুলোকে কয়েকটি প্রবন্ধ আকারে তুলে ধরেছি এই আশায় যে, বাংলার তরুণ সমাজ এ থেকে নিজেদের বর্ণাঢ্য উজ্জ্বল ইতিহাস, পূর্ব পুরুষের সৌর্য-বীর্যে মাহাত্ম্যমন্ডিত পরিচয় এবং নিকট অতীতে পরাক্রান্ত প্রতিবেশীদের মোকাবিলায় নিজেদের অসহায় পিতামহদের মর্মন্তুদ সংগ্রামের করুণ কাহিনীর পরিপূর্ণ চিত্র উদ্ধারের প্রেরণা পাবেন।

এ কাজে বাংলার মাত্র কয়েক ডজন তরুণকেও যদি অনুপ্রাণিত করা সম্ভব হয়, আজকের এ উর্ণাজাল ফুৎকারে মিলিয়ে যাবে, এ বুদ্ধিবৃত্তিক সংকট অবশ্যই কেটে যাবে। আর তা হলেই আমার শ্রম সার্থক হবে। তবে আল্লাহর অসীম রহমতে আশাতীত অল্প সময়েই আমার এ অনধিকার চর্চা ফলপ্রসূ হবার আলামত স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। বড় বিলম্বে হলেও বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ইতিহাস বিভাগের অনেক শিক্ষক গত ছয় মাসে মুখ খুলতে শুরু করেছেন। 'ভাসুরের নাম মুখে আনা পাপ' বিধায় বাবু বুদ্ধিজীবিদের নামোল্লেখ না করে বিভিন্ন সম্মেলন, সিম্পোজিয়ামে তারা বলতে শুরু করেছেন যে, "সাম্রাজ্যবাদের এ দেশীয় সহায়তাকারীদের রচিত 'ইতিহাস গ্রন্থে' বাংলার ইতিহাসের সঠিক চিত্র মেলেনা।" লজ্জার বাঁধ যখন একবার ভেঙ্গেছে, সেদিন বেশী দূরে নয় যেদিন বাবুদের বানোয়াট ইতিহাস The History of Bengal-এর সৃষ্ট বিভ্রান্তি থেকে আমাদের ভাবী বংশধরেরামুক্তি পাবে।

এ বইয়ে প্রকাশিত প্রবন্ধগুলো প্রথমে দৈনিক ইনকিলাব, দৈনিক সংগ্রাম, দৈনিক মিল্লাত ও সাপ্তাহিক পূর্ণিমায় প্রকাশিত হয়েছে এবং পরে প্রত্যেকটি প্রবন্ধই বিভিন্ন সাময়িকীতে আরো একাধিকবার পুণর্মুদ্রিত হয়েছে। এ কাজে আমাকে শুরু থেকেই সক্রিয়ভাবে উৎসাহ ও সহযোগিতা প্রদান করেন জনাব সানাউল্লাহ নূরী, জনাব এ. কে. এম. মহিউদ্দিন, জনাব আখতার-উল-আলম, জনাব আবুল আসাদ, জনাব এ, এম, এম বাহাউদ্দিন, অধ্যাপক আব্দুল গফুর, কথাশিল্পী ইউসুফ শরীফ, সাংবাদিক গিয়াস সিদ্দিকী, সুসাহিত্যিক সাজ্জাদ হোসেন খান, নিবন্ধকার হাসনাত করীম, কলামিষ্ট সাহিত্যিক ওসমান গনি, সাংবাদিক-আইনজীবি আ, ক, ম, বদরুদ্দোজা, অনুজপ্রতিম জিন্নাতুল হক প্রমুখ সুহৃদ শুভানুধ্যায়ীরা।

তা সত্ত্বেও অনিবার্য কারণে এর প্রকাশনা বিলম্বিত হলো। তবে আরো বেশি বিলম্ব হতো যদি এ কাজে ওয়েসিস-এর স্বত্ত্বাধিকারী জনাব চৌধুরী মোহাম্মদ

www.nagorikpathagar.org

ফারুক-এর আন্তরিক সহযোগিতা না পেতাম। মুদ্রণের ব্যাপারে ওয়েসিস বুকস-এর মহাব্যবস্থাপক কামাল পাশা দোজার আন্তরিকতাও উল্লেখের দাবী রাখে।

পেশাদার বিদ্যোৎসাহী বা জীবিকান্বেষী গবেষক আমি নই। আমার এ শ্রম-সাধনার পেছনে কোনরূপ আর্থিক প্রাপ্তিযোগের সম্ভাবনাও কাজ করেনি। তার ফলে, কণ্ঠে আর্থিক তথা বুদ্ধিবৃত্তিক আনুগত্যের বেড়ি না থাকায়, কোন কর্তা বা কর্তৃপক্ষের খুশি না-খুশির ভাবনা আমার বক্তব্যকে আড়ষ্ট করেনি। কিন্তু এ পথে সময়, শ্রম ও সম্পদের চক্রবৃদ্ধি ব্যয়ের ধারা আমাকে আর্থিক অনটনের আবর্তে জড়িয়ে ফেলেছে। তবু, তজ্জনিত সর্বমুখী চাপের মধ্যেও, সবকিছু নীরবে সহ্য করে, সরবে আমার এ কাজে নিরন্তর সমর্থন যুগিয়েছেন আমার সহধর্মিনী সাজেদা বেগম।

এ ছাড়া যারা যেভাবে আমাকে সহযোগিতা করেছেন সবার কাছেই আমি ঋণী।

ফারুক মাহমুদ
৩ ডিসেম্বর, ১৯৮৯ইং

শেখদী,
পোঃ মাতুয়াইল,
ডেমরা রোড, ঢাকা-১২০৪।

www.nagorikpathagar.org

॥ সূচী ॥

১। এপার বাংলা ওপার বাংলা এক হও ঃ তাইলে দুইহান কতা আছে । ১৭

২। ভারত–বিভাগ রংগমঞ্চের গ্রীনরুমে । ৪৫

৩। সলংগা হত্যাকান্ড ঃ হারিয়ে যাবার প্রেক্ষাপট । ৬৯

৪। বাংলা নববর্ষ ঃ প্রসংগ–কথা । ৭৯

৫। সোনার বাংলার সন্ধানে । ৮৩

৬। সোনার বাংলার অংগনে । ৯২

৭। সোনার বাংলার সোনাদানা । ১১৬

৮। 'কোটি টাকা পাচারকারী' নওয়াব শায়েস্তা খাঁ । ১৪৩

৯। মীর জাফর নয়, জগৎশেঠ । ১৪৭

১০। 'চরিত্রহীন' সিরাজউদ্দৌলা । ১৬১

১১। ইতিহাসে জালিয়াতির ফসল বাংলার 'সন্ন্যাসী বিদ্রোহ' । ১৭৫

১২। পলাশীর আগের বাঁকে । ১৯৬

১৩। পলাশীর পরের বাঁকে । ২১০

www.nagorikpathagar.org

লেখকের অন্যান্য বই

* 'জাগ্রত মুসলিম আফ্রিকা' ('৬৬)
* 'মধ্যযুগের পাক-ভারতীয় সংস্কৃতি' ('৬৬)
* 'ধোলাইকাব্য' (সম্পাদিতঃ ১৯৬৩)
* 'দ্বীপমালার দেশ ইন্দোনেশিয়া' ('৬৪),
* 'সংস্কৃতির স্বরূপ' (১৯৬৮),
* Nature of culture. (1969)
* 'সাংস্কৃতিক ষড়যন্ত্র' (১৯৬৯),
* বিধ্বস্ত ভ্রমরের স্বগতোক্তি' (১৯৮৫)
* 'পোড়া ফসলের গান' (১৯৮৫)
* 'অপ্রিয় কবিতাগুচ্ছ' (১৯৮৬),
* 'বাংলা ব্যঙ্গ কবিতায় সমাজ-মানস,' '
* সাম্প্রদায়িকতার রকমফের' (যন্ত্রস্থ)
* 'মজলুমের মুক্তি সনদ' (যন্ত্রস্থ)।

ওয়েসিস বুকস-এর বই

* আলমগীর কবির
* প্যালেস্টাইনের গল্প
* সাম্প্রদায়িকতার রকমফের
(প্রকাশের পথে)

www.nagorikpathagar.org

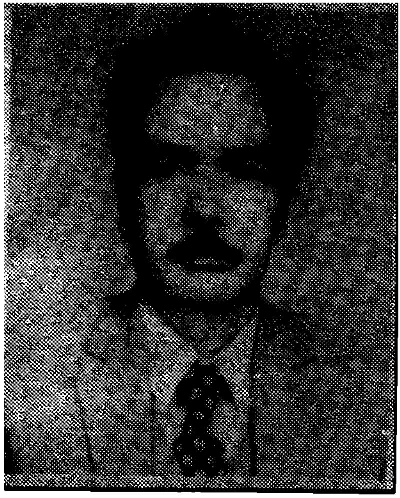

ভিন্ন স্থানে পাকিস্তান তমদ্দুন মজলিসের শা
য়েক দফা গ্রেফতার হন। ১৯৫৩-এর আগে
কিস্তান ছাত্রশক্তি গঠন করেন। প্রথমে স
ম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন। সাংস্কৃতিক
ম্পাদক হিসাবে কাজ করেন। পাকিস্তান যুব
াতি লীগের কোষাধ্যক্ষের দায়িত্ব পালন করেন
নিক সংবাদে সাব-এডিটর (১৯৫৪), দৈনি
নিক নাজাত-এ সহকারী বার্তা সম্পাদক ('
হযোগী সম্পাদক ('৫৭), দৈনিক পূর্বদেশ-
জাদ-এ সহকারী সম্পাদক ('৭৪), দৈনি
৯৭৭-৮৯) দায়িত্ব পালন করেন। সাপ্তাহিক
নিক (১৯৫৮) ও মাসিক নিরিখ (১৯৬৯)
ত্রিকার সহযোগী সম্পাদক হিসাবে কাজ করে
র প্রকাশিত গ্রন্থগুলোর মধ্যে 'জাগ্রত মুসলি
রতীয় সংস্কৃতি' ('৬৬) দীর্ঘকাল ধরে বাংল
ফারেন্স গ্রন্থরূপে স্বীকৃত হয়ে আসছে।
ধালাইকাব্য' (সম্পাদিতঃ ১৯৬৩) 'দ্বীপমাল
প' (১৯৬৮), Nature of culture,
ধ্বস্ত ভ্রমরের স্বগতোক্তি' (১৯৮৫) 'পোড়া য
৯৮৬), 'বাংলা ব্যঙ্গ কবিতায় সমাজ-মানস
জলুমের মুক্তি সনদ' (যন্ত্রস্থ)।

www.nagorikpathagar.org

নবাবী আমলের বাংলা মুলক—বাংলাদেশ, পশ্চিম বঙ্গ, বিহার, উড়িষ্যা ও আসামের কিয়দংশ

www.nagorikpathagar.org

'এপার বাংলা ওপার বাংলা এক হও' —'তাইলে দুইহান কতা আছে'

মিথ্যা বারবার উচ্চারিত হলে সত্যের মতো শোনায়। অবশ্য শেষতক মিথ্যা ধরা পড়েই যায়, সবখানে, সব যুগেই। বাংলাদেশেও এমনি একটা নিরেট মিথ্যা গত কয়েক দশক ধরে চলে আসছে।

বলা হয়ে থাকে, সাম্প্রদায়িক মুসলমানেরাই ভারত উপমহাদেশকে তিনভাগ করেছে, দ্বিখন্ডিত করেছে 'বাংলা মায়ের' দেহকে। প্রতিক্রিয়াশীল মুসলিম লীগের নেতৃত্বে মুসলমানেরাই 'এপার বাংলা' 'ওপার বাংলা'কে আলাদা করেছে। কিন্তু কথাটা একেবারেজলজ্যান্তমিথ্যা।

ভারতকে বিভক্ত করার প্রথম একটি প্রস্তাব সম্বলিত বিবৃতি দেন মিঃ গান্ধীর স্নেহভাজন কেন্দ্রীয় কংগ্রেস নেতা মিঃ রাজা গোপালাচারী ১৯৪৪ সালের এপ্রিল মাসে (The great divide, H.V. Hodson, P-113; মোঃ ওয়ালি উল্লাহ, আমাদের মুক্তিসংগ্রাম, পৃঃ ৩৯৮) এবং পরে পুনরায় গুঞ্জরন তোলেন নিখিল ভারত জাতীয় কংগ্রেসের প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক ও সভাপতি বল্লভ ভাই প্যাটেল ১৯৪৬ সালের ডিসেম্বর মাসে। [ডাঃ আবদুল ওয়াহিদ, উপ–মহাদেশের রাজনীতিতে সাম্প্রদায়িকতা ও মুসলমান, মাওলানা আযাদের উদ্ধৃতি, পৃঃ ৩৬০–৬১]। যুক্ত ভারতের আওয়তায় 'মুসলমানদের সাথে একত্রে না থাকার ঘোষণা' প্রকাশ করেন, নিখিল ভারত জাতীয় কংগ্রেসের তৎকালীন সভাপতি পন্ডিত জওহর লাল নেহেরু বোম্বাইয়ে প্রেস কনফারেন্সে ১৯৪৬ সালের ১০ই জুলাই [মওলানা আবুল কালাম আযাদ, ইন্ডিয়া উইনস ফ্রীডম, পৃঃ ১৬৪–৬৫] আর এর পেছনে কলকাঠি নাড়েন নাটের গুরু 'ধর্মনিরপেক্ষতার অবতার' বলে প্রচারিত মিঃ এম, কে গান্ধী। ১৯৪৬ সালের ৮ আগষ্ট নিখিল ভারত কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সভায় সর্দার প্যাটেল, পন্ডিত গোবিন্দ বল্লভ পন্থ, আচার্য কৃপালনী, মিঃ জওহরলাল নেহেরু এবং মিঃ গান্ধী একযোগে মওলানা আবুল কালাম আযাদকে খোলাখুলি জানিয়ে দেন যে, গ্রুপ সরকারের প্রস্তাবিত শাসনতান্ত্রিক কাঠামোতে তারা মুসলমানদের সাথে এক রাষ্ট্রে থাকবেন না–এর কয়েকদিন পূর্ব পর্যন্ত একটানা সাত বছর ধরে মওলানা আযাদই ছিলেন নিখিল ভারত জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি [মওলানা আযাদ, India wins freedom]। শুনতে অবাক লাগলেও তাদের এরূপ স্পষ্ট ঘোষণায় কিছুদিন আগে ১৯৪৬ সালে কেবিনেট মিশন প্রস্তাব অনুযায়ী তিনটি গ্রুপে গাঁথা সারা ভারতের

www.nagorikpathagar.org

সবগুলো প্রদেশ নিয়ে একটি ফেডারেশন রাষ্ট্র গঠনের পরিকল্পনা হিন্দু-মুসলমান দুই সম্প্রদায়ই মেনে নেয়। ১৬ই জুন তারিখে পরিকল্পনাটি প্রকাশ করার এক সপ্তাহের মধ্যেই কায়েদে আযম মুহম্মদ আলী জিন্নাহর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত নিখিল ভারত মুসলিম লীগের কার্যকরী কমিটির সভায় তা মেনে নেয়া হয়। [ডাঃ আবদুল ওয়াহিদ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৬৬] অতঃপর ৭ই জুলাই তারিখে মওলানা আবুল কালাম আযাদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত নিখিল ভারত জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনেও হিন্দু-মুসলিম একত্রে থাকবে এ প্রস্তাবটি গৃহীত হয়। [মওলানা আযাদ, India wins freedom P- 164] কংগ্রেস অধিবেশনে এ প্রস্তাব গৃহীত হবার তিনদিন পরই মিঃ এম, কে, গান্ধীর ইংগিতে জাতীয় কংগ্রেসের নবনির্বাচিত প্রেসিডেন্ট মিঃ নেহেরু-তার বিরোধিতা করে বিবৃতি দেন ১০ই জুলাই [মওলানা আযাদ-ইন্ডিয়া উইন্স ফ্রিডম পৃঃ ১৬৪-৬৫] পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে এরূপ করার উদ্দেশ্যেই এর কয়েকদিন পূর্বে, মওলানা আযাদকে সভাপতির পদ থেকে সরিয়ে দিয়ে পন্ডিতজীকে কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট পদে বরণ করা হয় এবং পরবর্তী কংগ্রেস অধিবেশনেই কেবিনেট মিশন প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করা হয়।

কেবিনেট মিশনের প্রস্তাব ছিল উত্তর পশ্চিম ভারতের পাঞ্জাব, সিন্ধু, বেলুচিস্তান ও সীমান্ত প্রদেশ নিয়ে একটি গ্রুপ, বাংলা ও আসাম প্রদেশ নিয়ে একটি গ্রুপ এবং ভারতের অবশিষ্ট বিহার, উড়িষ্যা, মধ্যপ্রদেশ, যুক্তপ্রদেশ, বোম্বাই ও মাদ্রাজ প্রদেশ নিয়ে আকেটি গ্রুপ গঠন করা হবে। সব গ্রুপের সব প্রদেশই স্বায়ত্তশাসন পাবে; গ্রুপভুক্ত প্রদেশগুলো নিজেদের 'কমন' বিষয়গুলো যৌথভাবে সমাধান করবে। তিনটি গ্রুপের সমন্বয়ে সবগুলো প্রদেশ নিযে গঠিতহবে নিখিল ভারত ফেডারেল রাষ্ট্র সরকার। [Hodson, the great Divide, P-162, জামিলুদ্দিন, ফাউন্ডেশন অব মুসলিম লীগ, হিস্টরি অব ফ্রিডম মুভমেন্ট-পৃঃ '৮৬-৮; মওলানা আযাদ, প্রাগুক্ত- পৃঃ ১৮৫-৮৮]। এতে কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে পররাষ্ট্র, দেশরক্ষা ও যোগযোগ এ তিনটি বিষয় রেখে অবশিষ্ট যাবতীয় বিষয় প্রদেশের হাতে রাখা হয়। তাছাড়া প্রথমোক্ত দু'টি গ্রুপভুক্ত বাংলা, আসাম, পাঞ্জাব, সিনধু, বেলুচিস্তান ও সীমান্ত প্রদেশ ছিল মুসলমান সংখ্যাগুরু। ভারতীয় ফেডারেল সরকারের অধীনে থেকেও এসব প্রদেশে মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রাদেশিক সরকারের অধীনে মুসলমানেরা নির্ভয়ে নিজেদের কৃষ্টি-সংস্কৃতি নিয়ে জীবনযাপন করতে পারতো। এ কারণেই পাকিস্তানের দাবী প্রত্যাহার করে নিয়ে নিখিল ভারত মুসলিম লীগ কেবিনেট মিশনের গ্রুপ সরকার পদ্ধতি মেনে নেয়। কংগ্রেস প্রথমে দেখতে পায়, সারা ভারতে ৫০ কোটি জনসংখ্যার এক-চতুর্থাংশ মাত্র মুসলমান এবং মোট প্রদশেগুলোরও অধিকাংশ হিন্দুপ্রধান। সুতরাং কেন্দ্রীয় সরকারের পার্লামেন্টে বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ হবে হিন্দুরা। তারা

www.nagorikpathagar.org

অবিভক্ত বাংলার প্রথম প্রধান মন্ত্রী, লাহোর সম্মেলনে পাকিস্তান প্রস্তাবের
উত্থাপক শেরে বাংলা আবুল কাশেম ফজলুল হক

www.nagorikpathagar.org

সংখ্যাগুরু ভোটে যা খুশি তাই করতে পারবে। এ কারণেই মওলানা আযাদের ঐক্যের ডাকে সাড়া দিযে প্রথমে তারা কেবিনেট মিশন প্রস্তাব মেনে নেয়।

কিন্তু পরেই তারা বুঝতে পারে যে, এর মধ্যে একটা ঝুঁকিও রয়ে গেছে। কেন্দ্রীয় সরকার ব্রুট মেজরিটির চাপ সৃষ্টি করতে গেলে দু'টি গ্রুপই একযোগে আযাদীর নিশান উড়িয়েদিতেপারে।

তাছাড়া মিঃ এম, কে, গান্ধী আজীবন স্বপ্ন দেখেছেন অখণ্ড ভারতব্যাপী 'রামরাজ্য' প্রতিষ্ঠার। 'ডিসকভারী অব ইন্ডিয়া' গ্রন্থে পন্ডিত নেহেরু দক্ষিণ এশিয়াব্যাপী হিন্দু সভ্যতার প্রভাববলয় পুনঃপ্রতিষ্ঠার আবেগে আচ্ছন্ন মনোভাব প্রকাশ করেন–সেটাও ছিল তাঁর আজীবন লালিত স্বপ্ন। গ্রুপ সরকার ব্যবস্থায় ভারত অবিভক্ত থাকলে তাদের কি লাভ। রামরাজ্যও হবে না, হিন্দু সভ্যতার প্রভাববলয়ও সৃষ্টি হবে না। তাহলে মওলানা আযাদকে সরিয়ে দিয়ে এ ব্যবস্থা বাঞ্চাল করাই বিধেয়। ১৯৩০ সালে গোলটেবিল বৈঠকের প্রাক্কালেও এভাবেই নিখিল ভারত কংগ্রেস সভাপতির পদ থেকে ডক্টর মোখতার আহমদ আনসারীকে সরিয়ে দিয়ে মিঃ গান্ধীকে তারা বিলেতে পাঠান মুসলমানদের মোকাবেলা করতে। [আবদুর রহীম, বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস, উদ্ধৃতি–রামগোপাল, ১৮৯; রব, ৭৭–৮৪; ব্রোমফিল্ড ২৮৯; হামিদ ২১৩; বিনয়েন্দ্র নাথ চৌধুরী, ভরতের মুসলিম রাজনীতি; পট্টভি মিতারামাইয়া, কংগ্রেসেরইতিহাস]।

বাংলাকে হিন্দু বাংলা ও মুসলিম বাংলায় বিভক্ত করে দুটি প্রদেশ গঠনের প্রস্তাব প্রথম উথাপন করে জাতীয় কংগ্রেস নেতা লালা লাজপত রায় ১৯২৫ সালে। মন্টেগু চেমসফোর্ড শাসন সংস্কারের ফলে মুসলিম সংখ্যাগুরু বাংলা ও পাঞ্জাবে মুসলিম মন্ত্রিসভা কায়েমের সম্ভবনা দেখা দিলে ভারতের কেন্দ্রীয় আইন সভায় তিনি এ দুটি প্রদেশকে ভাগ করার দাবী করেন। কেন্দ্রীয় আইন সভায় তৎকালীন ইন্ডিপেন্ডেন্ট পার্টির নেতা মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ উহার তীব্র বিরোধীতা করেন। দীর্ঘ ২ মাস তাদের মধ্যে এ নিয়ে বাকবিতন্ডা চলে। লালা লাজপত রায় ১৯২৪ সালের ২৫ নভেম্বর থেকে ১৭ ডিসেম্বরের মধ্যে Daily Tribune পত্রিকায় এই দাবীতে ১৩টি প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। [David page, Prelude to Partition, P 121] বাংলাদেশ দ্বিখন্ডিত করার কথা কোনদিন কোন মুসলমানের মুখ দিয়ে উচ্চারিত হয় নাই। স্বেচ্ছায় মুসলমানেরা বাংলা বিভাগ মেনে নেয়নি। এমনকি বাবু বুদ্ধিজীবীগণ কর্তৃক চরম প্রতিক্রিয়াশীল বলে নিন্দিত এককালের কংগ্রেস নেতা, ১৯২৪ সালে প্রাদেশিক কংগ্রেসের সিরাজগঞ্জ অধিবেশনের সভাপতি ও পরবর্তীকালের প্রাদেশিক মুসলিম

www.nagorikpathagar.org

লীগের সভাপতি মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ পত্রিকায় প্রদত্ত বিবৃতিতে বলেন যে, "বাংলা বিভক্ত করতে হলে তা করতে হবে বাংলার ছয় কোটি মুসলমানের লাশের উপর দিয়ে" [আবুল হাশিম, ইন রিট্রোসপেকশন, পৃঃ ১৪৭]। কিন্তু বাংলার প্রধানমন্ত্রী শহীদ সোহরাওয়ার্দী, বাংলা প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সাধারণ সম্পাদক জনাব আবুল হাশিম এবং বাংলার প্রাদেশিক কংগ্রেসের সভাপতি মিঃ শরৎ চন্দ্র বসু ও সাধারণ সম্পাদক বাংগালী কংগ্রেস নেতা মিঃ কিরণ শংকর রায় সার্বভৌম রাষ্ট্র স্বাধীন বাংলাদেশ গঠনের জন্য সাংবিধানিক চুক্তি স্বাক্ষর করতে সক্ষম হলেও গুজরাটী মিঃ এম, কে গান্ধী, কাশ্মীরী পন্ডিত জওয়াহেরলাল নেহেরু ও বোম্বাইয়া মিঃ বল্লভ ভাই প্যাটেলের নির্দেশে বাংলার কংগ্রেস নেতা ও কর্মীরা মত পরিবর্তন করেন। উপরোক্ত মহলের ইংগিতেই তারা হিন্দু মহাসভার সভাপতি শ্যামাপ্রাসাদ মুখার্জীর দাবীতে [আবুল হাশিম, প্রাগুক্ত, গান্ধীর চিঠি তাং-৮/৬/৪৭ পৃঃ ১৫৮] এবং ভাইসরয় মাউন্টব্যাটেন ও গভর্ণর ফ্রেডারিক বারোজের সক্রিয় সহযোগিতায় সে চেষ্টা ব্যর্থ করে দেন।

উনিশ শতকের শেষ দশকে জন্ম নেয়া কোন মুসলমান সন্তানই বিশ্বাস করতে পারতো না তার মনিব ও পড়শী বাবুদেরকে। সেটা সম্ভবও ছিল না। দেড়শত বছর ধরে বাংলার মুসলমানদের উপর ইংগ-হিন্দু অত্যাচারের সব ইতিহাসই বাবু বুদ্ধিজীবীরা গায়েব করে দিয়েছিলেন। কিন্তু ইতিহাসের জীবন্ত নায়কদের সবাইকে তো আর নিশ্চিহ্ন করতে পারেন নাই-তারাতো বাবুদের সেবাদাস, ক্ষেতমজুর হয়েই ঘোরাফেরা করছিল। মুখে মুখে তারাই ট্রান্সমিট করে গেছেন ইতিহাসের বিভীষিকাময় চিত্র। একটা ছোট্ট দৃষ্টান্ত দেই।-আমার দাদার জন্ম হয় ১৮৩৪ সালে, ইন্তেকাল করেন ১৯৩৩ সালে। আমার নানার জন্ম ১৮৪০ সালে, ইন্তেকাল করেন ১৯৫৪ সালে। নানার কাছে আমি শুনেছি তার যৌবনে ১৮৬০ দশকে বাবুদের হাতে নিগৃহীত মুসলমানদের নিদারুণ জীবন-কাহিনী। আমার দাদার বাবা ১৮৩১ সালে তিতুমীরের সৈনিক হিসাবে নারিকেলবাড়িয়ায় বাঁশের কেল্লার যুদ্ধে পরাজয়ের পর আহত সংগী-সাথীদের নিয়ে সুন্দরবন অঞ্চলে কিভাবে দিনাতিপাত করেছেন-বাপের কাছ থেকে শোনা সে-সব কাহিনী আমার দাদা শুনিয়েছেন নাতিপোতাদের-শুনেছেন আমার পঁচিশ বছরের বয়োজ্যেষ্ঠ এক চাচাতো ভাই। এভাবে ১৮৩৭ সালে রাষ্ট্রভাষা ফার্সীর বদলে যখন ইংরেজী চালু করা হয় [আব্দুল মওদুদ, মধ্যবিত্ত সমাজের বিকাশঃ সংস্কৃতির রূপান্তর, পৃঃ ৯৮], তখন সারা বাংলার এক লাখ মক্তব মাদ্রাসার সাথে [আব্দুর রহীম, বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস, উদ্ধৃতি জে, লং, এডামস রিপোর্ট, পৃঃ ১৮, ২৯, ৪০-৪২] আমাদের বাড়ীর সামনের বিরাটকায় মাদ্রাসাটিও কিরূপে অর্থাভাবে ধ্বংস হয়ে যায় তার ইতিহাস এক পুরুষের ব্যবধানে প্রত্যক্ষদর্শীর বর্ণনা হিসাবে ১৯৮৭ সালেও

www.nagorikpathagar.org

আমাদের কারো কারো মনে রেখাপাত করে আছে। ১৮৩৫ সালে তিতুমীরের প্রধান দুশমন গোবরডাংগার জমিদার কালী প্রসন্ন মুখোপাধ্যায় হাতিসহ বরকন্দাজ বাহিনী পাঠিয়ে আমাদের মুসলমান গাঁয়ের বাড়ীঘর ভাংতে গেলে তাদের বিরুদ্ধে আল্লাহ বখশ, খোদা বখশ ভাইদের মরণপণ লড়াইয়ের কাহিনী উপাখ্যান হয়ে এখনো ছড়িয়ে আছে সারা এলাকায়। ঠিক এমনি ভাবেই উনিশ শতকের ক্রান্তিকালের বাংগালী মুসলমান শিশুরা শুনেছে, মুটে-মাঝি, মিনতি-কিষাণ, ক্ষেত মজুরের কাজে নিয়োজিত তাদের বৃদ্ধ দাদা-নানাদের মুখে, তাঁদের বাপ-চাচাদের যৌবনের, পলাশী যুদ্ধের পূর্বকালীন অঢেল প্রাচুর্যের রূপকথা, শুনেছে দারিদ্র্য ও অশিক্ষা দু'টি শব্দ সেদিন বাংলার মুসলমানদের কাছে ছিল একেবারেই অজ্ঞাত [উইলিয়াম হান্টার, দি ইন্ডিয়ান মুসলমান]।

উনিশ শতকের ক্রান্তিলগ্নে বাংলার মুসলিম সন্তানেরা যখন স্কুল-কলেজে ঢোকার প্রথম সুযোগ পায়, বাবু বুদ্ধিজীবীদের লেখা পাঠ্যপুস্তকে তাদেরকে ইতিহাসের বানোয়াট ব্যাখ্যা শোনানো হলেও, তাতে তাদের বুকের ক্ষত উপশম হতো না। বাবুরা বোঝাতেন, মুসলমান মীর জাফরের বিশ্বাসঘাতকতায় দেশ পরাধীন হয়েছিল, আর মোল্লাদের অসহযোগিতায় মুসলমানেরা ইংরেজী শিক্ষার সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয়েছে। বাবুরা তখন, বিশ শতকের দ্বিতীয় দশকে, তাদেরকে ডাক দিয়েছেন ইংরেজবিরোধী জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে। দুর্জয় অনার্য-দ্রাবিড়-অষ্ট্রেলয়েড-সেমিটিক রক্তের সাথে দুর্ধর্ষ তুর্ক আফগান আরব রক্তের মিলিত ধারা প্রতিটি বাংগালী মুসলমানের ধমনীতে বহমান। স্বাধীনতার স্পৃহা তাদের মজ্জাগত উত্তরাধিকার। বুকে বেদনার ক্ষত নিয়েও তাই তারা সাড়া দিয়েছে বাবুদের ডাকে, বৃটিশ-বিরোধী অসহযোগ আন্দোলনে, সত্যাগ্রহে, সংগ্রামে।

কিন্তু বুকের গভীরে তাদের দুরু দুরু ভয় ছিল। বাবুদের কাছ থেকে তারা হয়ত সুবিচার পাবে না। আন্দোলনের মাঝে থেকেও তারা চাকরি-বাকরি, জমি-জিরাত, ব্যবসা-বাণিজ্যে কিছু সুযোগ-সুবিধা মাত্র দাবী করেছিল। বাবুরা তাও দিতে চাইলেন না। এ সময়ে ভারতের সর্বত্র পৌরসভা, লোকাল বোর্ড, জেলাবোর্ড গঠিত হতে থাকে জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের নিয়ে [আব্দুর রহীম, বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস]। অভিজ্ঞতার আলোকে তারা দেখলেন বৃটিশ ভারতে অধিবাসীদের ২৫% মাত্র মুসলমান,তাতে আবার তারা দরিদ্র নিঃসম্বল। বাবুদের সাথে প্রতিযোগিতা করে এসব সংস্থায় নির্বাচিত হওয়া তাদের পক্ষে একেবারেই অসম্ভব। তাই তারা কিছু নিরাপত্তার আশ্বাস চাইলেন-দাবী করলেন হিন্দু, মুসলমান ও নমশূদ্রেরা এসব প্রতিষ্ঠানে নিজেদের সংখ্যানুপাতে আসন পাবে, প্রাপ্ত আসনগুলোতে পৃথক পৃথকভাবে নিজেদের

www.nagorikpathagar.org

অবিভক্ত বাংলার শেষ প্রধান মন্ত্রী, পাকিস্তানের পঞ্চম প্রধান মন্ত্রী হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী

সৌজন্যেঃ রোকনুজ্জামান খান (দাদা ভাই)

www.nagorikpathagar.org

ভোটে নিজেদের প্রতিনিধি নির্বাচন করবে। কিন্তু ভারতকে বা বাংলাদেশকে বিভক্ত করার কথা কোনদিনই তারা কল্পনাও করেনি। কংগ্রেসের পতাকার নীচে দাঁড়িয়েই তারা জাতীয়তাবাদী আন্দোলন করেছেন।

মওলবী এ, কে, ফজলুল হক, মওলানা মোহাম্মদ আলী, ডক্টর মোখতার আহমদ আনসারী, মওলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী, স্যার আবদুর রহীম, সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজী, মওলানা আবদুর রশীদ তর্কবাগীশ, মওলানা হাস্‌রত মোহানী, মওলানা মাযহারুল হক বাংগালী, মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ, মওলবী তমিজুদ্দিন খান, ব্যরিস্টার আব্দুর রসূল, মওলবী মুজিবর রহামন, মিঃ মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ-এদের সবাইতো ছিলেন জাতীয়তাবাদী নেতা জাতীয় কংগ্রেসের কেউবা কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি বা সম্পাদক, কেউবা প্রাদেশিক কংগ্রেসের সভাপতি বা সম্পাদক। মওলবী ফজলুল হক তো একই সাথে নিখিল ভারত জাতীয় কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক ও নিখিল ভারত মুসিলম লীগের সভাপতি (১৯১৮) ছিলেন [আজিজুল হক শাহজাহান, শতাব্দীর কন্ঠস্বর আবুল কাসেম ফজলুল হক, পৃঃ ৬১]। মওলবী মুজিবর রহমান ছিলেন একই সাথে বংগীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সভাপতি এবং প্রাদেশিক কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক(১৯২৪) মিঃ জিন্নাহ সারা ভারতে নন্দিত ছিলেন "হিন্দু মুসলিম মিলনের দূত" বলে।

এই যে মুসলিম মহাপুরুষগুলো, কোন্ অপরাধে, কেন তারা সাম্প্রদায়িক খেতাব পেলেন? নিখিল ভারত জাতীয় কংগ্রেসের সাত বছরব্যাপী পুতুল প্রেসিডেন্ট মওলানা আবুল কালাম আযাদ কেন ইন্ডিয়া উইনস ফ্রিডম গ্রন্থে কান্নাজড়ানো কণ্ঠে আফসোস করতে করতে মারা গেলেন?

'ইন্ডিয়া উইনস ফ্রিডম P-203]।

গোলটেবিল বৈঠকের আগে সাইমন কমিশন পর্যন্ত ১৯২৯ সাল অবধি এসব নেতারা মুসলিম লীগের সদস্য থাকলেও কংগেসকে মনে করেছেন হিন্দু মুসলমানের মিলিত জাতীয় প্লাটফর্ম, মুসলিম লীগকে মনে করেছেন মুসলমান সমাজের বিশেষ অভাব অসুবিধাগুলোর সমাধান খুঁজে বের করার জন্য গঠিত সংগঠন। এ সংগঠনের মাধ্যমে মুসলমানেরা কেবল পূর্ব-পুরুষদের কাছ থেকে শোনা বিভীষিকাময় অতীতকে স্মরণ করে, ভবিষ্যতের সম্ভাব্য বিপদ এড়াবার আশায় সংখ্যাগুরু হিন্দু সম্প্রদায়ের সাথে আলাপ-আলোচনা চালাতেন। তাদের ভয় ছিল, বর্ণহিন্দুদের নেতৃত্বে উপ-মহাদেশের ৭৫% হিন্দু একজোট হয়ে সাম্প্রদায়িক মনোভাব নিয়ে চললে তাদের কৃত জুলুম-পীড়নের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান ও প্রাদেশিক আইন সভাগুলোতে কোনদিন একজন মুসলমানও নির্বাচিত হতে পারবেন

www.nagorikpathagar.org

না। এ জন্য তারা যুক্তি সহকারে অত্যন্ত বিনয়ের সাথে কেবলমাত্র এটুকু দাবী করেছিলেন যে, বৃটিশ ভারতের প্রদেশগুলোতে মুসলমানদেরকে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে তাদের জনসংখ্যার অনুপাতে আসন প্রদান করে, তাদের নিজেদের ভোটে নিজেদের প্রতিনিধি নির্বাচন করতে দেয়া হোক। এ ব্যবস্থায় ২৫% মুসলমান ৭৫% অমুসলমানের উপর টেক্কা দিয়ে সংখ্যাগুরু আসন অধিকার করতে পারতো না। কেবল নিজেদের নিম্নতম অধিকারটুকু রক্ষার ব্যাপারে সংখ্যাগুরুর সুদৃষ্টি ও সমর্থন আদায় করতে পারতো।

১৯১৬ সালের লাখনৌ চুক্তিতেও মুসলমানেরা এটুকু আশা করেছিলেন [জামিলুদ্দীন, ফাউন্ডেশন অব মুসলিম লীগ]। নিখিল ভারত মুসলিম লীগের ১৯২৪ সালের লাহোর প্রস্তাবে, ১৯২৫-এর আলীগড় প্রস্তাবেও এটুকুই দাবী করা হয়েছিল। [রামগোপাল, প্রাগুক্ত, ২৭৪, ২৫৮; হামিদ, ২২৪; কোরেশী, ১০০]। ১৯২৩ সালে মিঃ চিত্তরঞ্জন দাস মিঃ সুভাষ বসু মিঃ জে, এন, সেনগুপ্ত এবং স্যার আব্দুর রহীম, মওলবী ফজলুল হক ও মিঃ শহীদ সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বে সম্পাদিত "বেগল প্যাক্ট"ও মুসলমানেরা এতটুকুই চেয়েছিলেন এবং বাংলা প্রদেশে মুসলমানেরা সংখ্যাগুরু হয়েও সংখ্যাসাম্য মেনে নিয়েছিলেন [ব্রোমফিল্ড, ২৪৫-২৭৫; রাম গোপাল, ইন্ডিয়ান মুসলমান; আব্দুর রহীম, প্রাগুক্ত, বেংগল প্যাক্টের প্রস্তাব পৃঃ ২২৬]। ১৯২৭ সালের ২০শে মার্চ তারিখের দিল্লী প্রস্তাবেও মুসলমানেরা এটুকুই দাবী করেছিলেন [খালেকুজ্জামান, পাথওয়ে টু পাকিস্তান, ১৭১]। ১৯২৮ সালের ২২শে ডিসেম্বর কলিকাতায় অনুষ্ঠিত সর্বদলীয় বৈঠকেও মুসলিম লীগ নেতৃবৃন্দ এ দাবীই পেশ করেন [মুসলিম লীগ রিজোলুশন্স, পৃঃ ১১, ৪০-৪১]।

১৯২৯ সালের জানুয়ারীতে মুসলিম লীগের দিল্লী অধিবেশনে গৃহীত বিখ্যাত ১৪ দফা দাবীর মুল বক্তব্যও ছিল এটাই [মুসলিম লীগ রিজোলুশন্স, পৃঃ ১১, ৪০-৪২]। মুসলমানদের প্রতিবারের আবেদনই বর্ণহিন্দু কংগ্রেসী নেতারা সুকৌশলে প্রত্যাখ্যান করেছেন। শুধু তাই নয়, ১৯১৯ সালের মন্টেগু-চেমসফোর্ড ঘোষণার পর বাংলা-পাঞ্জাবসহ কতিপয় প্রদেশের আইন পরিষদ ও মন্ত্রিসভায় মুসলমানেরা আসন লাভ করায় বালগংগাধর তিলক ও মদনমোহন মালব্যের অনুসারীরা খেজুর তলার (আরব ইরান থেকে আগত এই মিথ্যা অভিযোগে) মুসলমানদেরকে খেজুর তলায় পাঠানোর জন্য সশস্ত্র কর্মসূচী ঘোষণা করে [ডাক্তার আবদুল ওয়াহিদ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৬০, রবার্ট বাইরনের 'স্টেটস্‌ম্যান অব ইন্ডিয়া' থেকে উদ্ধৃতি]। ১৯২৩ থেকে ১৯২৯ সাল পর্যন্ত সারা উপ-মহাদেশে মুসলিম নিধন দাংগায় বর্ণহিন্দুরা লক্ষ লক্ষ মুসলমানকে হত্যা করে। এত কিছুর পরেও ১৯৩০-৩১ সালে লন্ডনে অনুষ্ঠিত গোলটেবিল বৈঠকেও

www.nagorikpathagar.org

মুসলমানেরা আগের মতই কেবলমাত্র আত্মরক্ষার রক্ষাকবচ দাবী করেছিলেন। ভারত বা বাংলাদেশ বিভাগের কোন প্রশ্ন কেউ কোথাও উথাপন করেননি। কিন্তু তখনও বর্ণহিন্দু বাবুদের একটিই জওয়াবঃ "হিন্দু, মুসলিম, বৌদ্ধ, খৃষ্টান সবাই মিলে আমরা একই ভারতীয় জাতি, এখানে ভেদাভেদের প্রশ্ন তোলা যাবে না। যে যেখানে যেমন অবস্থায় আছো তেমনই থাকতে হবে। ভবিষ্যতে ধর্মনিরপেক্ষ নির্ভেজাল গণতন্ত্রের নীতিতে সংখ্যাগুরুর সিদ্ধান্তে সবকিছুর ফয়সালা হবে—সাম্প্রদায় বিশেষের হয়ে কেউ কথা বলতে পারবে না।" সহজ ভাষায় এর অর্থ দাঁড়ায়, উপ-মহাদেশের যেসব এলাকায় (যেমন বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা) মুসলমানেরা বাবুদের পায়ের তলায় রয়েছে, সেখানে তারা পায়ের তলায়ই থাকবে–উঠে দাঁড়ানোর সাম্প্রদায়িক দাবী তুলতে পারবে না। যেসব এলাকায় মুসলমানেরা নিদারুণভাবে সংখ্যালঘু, যেমনঃ মধ্যপ্রদেশে ৪%, মাদ্রাজে ৭%, বিহারে ১৩%, যুক্তপ্রদেশে ১৪%, বোম্বাই (সিন্ধুসহ) ২০% [রাম গোপাল, প্রাগুক্ত, ১৮৯; রব, ৭৭–৮৪; ব্রোমফিলড, ২৮৯; হামিদ, ২১৩; আবুল রহীম, প্রাগুক্ত, উদ্ধৃতি] সেখানে ব্রুট মেজরিটির জোরে তাদেরকে শূদ্র হরিজনদের স্তরে নামিয়ে দেয়া যাবে–সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিকোণ থেকে প্রশ্ন তোলা যাবে না। আমরা হিন্দু, তোমরা মুসলমান, ভাই ভাই, আমরা সবাই একতাবদ্ধ। তোমাদের যা কিছু আছে সবই আমাদের, আর আমাদের যা কিছু তাও হেঁ হেঁ হেঁ –অর্থাৎ আমাদেরই, তোমাদের কিছুই নেই, কিছুই থাকবে না। কেবল থাকবে অবাধ (১) গণতন্ত্র (২) আর অসাম্প্রদায়িক ধর্মনিরপেক্ষতা এবং (৩) এক জাতয়িতাবাদ (হালে তারই সাথে তারা জুড়ে দিয়েছেন পুঁজিহীন দেশে) (৪) সমাজতন্ত্র। মওলবী ফজলুল হক ও মিঃ জিন্নাহর ক্ষুরধার যুক্তিতে মারাঠী 'মহাত্মার' মতলব ভেস্তে গেল, গোল টেবিল বৈঠকও ভেঙ্গে গেল [রামপোগাল, প্রাগুক্ত ১৮৯, ৭৭–৮৪; ব্রোমফিল্ড ২৮৯; হামিদ ২১৩; আব্দুর রহীম, প্রাগুক্ত উদধৃতি]। বৃটিশ সরকার একতরফাভাবে ১৯৩২ সালে ২রা আগষ্ট পৃথক নির্বাচন, আসন সংরক্ষণ ও প্রাদেশিক স্বায়ত্বশাসনের ব্যবস্থা সম্বলিত সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদ ঘোষণা করলেন। ১৯৩৫ সালে এলো ভারত শাসন আইনের নতুন প্রশাসন–বিধি। ১৯৩৭ সালের নির্বাচনে বাংলা, আসাম, পাঞ্জাব, সিন্ধু, বেলুচিস্তান ও সীমান্ত প্রদেশে মুসলমানেরা সরকার গঠন করলেন–কিন্তু একমাত্র বাংলা প্রদেশেই মুসলিম লীগ সরকার গঠিত হলো মওলবী ফজলুল হকের নেতৃত্বে–অবশিষ্ট মুসলিম প্রধান প্রদেশগুলোতে কংগ্রেসী অথবা কংগ্রেসের সাথে অন্যান্য মুসলমান দলের মিলনে জাতীয়তাবাদী মুসলমানদের মন্ত্রিসভা কায়েম হলো। ভারত বিভাগ বা বাংলা–পাঞ্জাব বিভাগের কথা কখনও কোন মুসলমান রাজনৈতিক নেতা কল্পনাও করেননি।

নির্বাচনে হিন্দু প্রধান ৬টি প্রদেশে কংগ্রেস মন্ত্রিসভা গঠিত হলো–সেসব প্রদেশে দু'বছর ধরে মুসলমানদের উপর চললো অমানুষিক ধর্মনিরপেক্ষ নির্যাতন। নির্যাতনের

www.nagorikpathagar.org

স্বরূপ সম্পর্কে তদন্তের জন্য মুসলিম লীগ কর্তৃক "পীরপুর কমিটি" ও "শরীফ কমিটি" নিয়োগ করা হয়। রিপোর্টে বর্ণহিন্দুর অত্যাচারের যে বিভৎসতা ফুটে ওঠে তাতে বিচলিত হয়ে ১৯৩৯ সালে বাংলার প্রধানমন্ত্রী মওলবী ফজলুল হক "কংগ্রেস শাসনে মুসলমানদের দুরবস্থা" বর্ণনা করে এক দীর্ঘ বিবৃতি পুদান করেন এবং এই মর্মে হুমকি দেন যে, কংগ্রেস শাসিত প্রদেশগুলোতে 'এভাবে মুসলমানদের প্রতি জুলুমের ধারা বন্ধ করা না হলে বাংলাদেশে তিনি এর প্রতিশোধ গ্রহণ করতে বাধ্য হবেন। [আব্দুর রহীম, প্রাগুক্ত, ২৫০; ব্রোমফিল ড ২৬০-৬৩; কমরুদ্দিন ১৯, ১৮১, ১৯৫-২০০]। হক সাহেবের বিবৃতিটি পুস্তিকা আকারে সারা উপ-মহাদেশে ছড়ানো হয়। অন্যান্য মুসলমান প্রধান প্রদেশগুলোতেও এ আবেগ সঞ্চারিত হয়। তারই স্বাভাবিক পরিণতি মুসলিম লীগের ১৯৪০ সালের লাহোর অধিবেশনে মওলবী ফজলুল হক কর্তৃক উত্থাপিত পাকিস্তান প্রস্তাব [আব্দুর রহীম, প্রাগুক্ত ২৫০; ব্রোমফিল্ড, ২৬০-৬৩; কামরুদ্দিন ; ১৯, ১৮১ ১৯৫-২০০]।

কিন্তু পাকিস্তান প্রস্তাবের ভিত্তিতে আন্দোলন চলাকালেও বৃটিশ সরকারের কাছে কংগ্রেসের প্রতিপক্ষে মুসলিম লীগ দরকষাকষির প্রশ্নে দাবী করে আসছিল প্রদেশসমূহের স্বায়ত্তশাসন সম্বলিত সর্বভারতীয় কেন্দ্রীয় ফেডারেল সরকার -আর কংগ্রেসের লক্ষ্য ছিল কেন্দ্রে যুক্তরাজ্য (Unitary) সরকার। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে বৃটেনের যে লোক ক্ষয় হয় তাতে অবশিষ্ট বৃটিশ যুবশক্তির দ্বারা বিশ্বব্যাপী বৃটিশ সাম্রাজ্য পরিচালনা সম্ভব নয় বিধায় এ সময়ে বৃটেনে নবনির্বাচিত প্রধানমন্ত্রী ক্লিমেন্ট এটলী ১৯৪৬ সালের ১৯শে ফেব্রুয়ারী ঘোষণা করেন যে (আয়ান স্টীফেন্স, পাকিস্তান, ১১৯-২৮) বৃটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত দেশগুলোকে তারা অবিলম্বে স্বাধীনতা দিয়ে দেবেন। ভারতে এ ঘোষণা বাস্তবায়নের জন্য ভাইসরয় লর্ড ওয়াভেলের প্রতি জোর তাগিদ দেন মিঃ এটলী। ভাইসরয় লর্ড ওয়াভেলকে সাহায্য করার জন্য বৃটিশ সরকার ভারত সচিব লর্ড প্যাথিক লরেন্স, বাণিজ্য বোর্ডের সবাপতি স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রীপ্‌স ও নৌ-বহরের সচিব এ, ভি, আলেকজান্ডারের সমবায়ে একটি কেবিনেট মিশন প্রেরণ করেন। কেবিনেট মিশন ১৯৪৬ সালের ২৪শে মার্চ তারিখে দিল্লী পৌঁছেন। তাদের প্রদত্ত "গ্রুপ সরকার" পরিকল্পনায় মুসলমানেরা প্রার্থিত নিরাপত্তার আশ্বাস দেখতে পাওয়ায় পাকিস্তান প্রস্তাবের দাবী স্থগিত রেখেই 'কেবিনেট মিশন প্রস্তাব' মেনে নেন। কিন্তু জাতীয় কংগ্রেসের কেন্দ্রীয় কমিটি ৭ই জুলাই মওলানা আযাদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় উহা মেনে নিলেও মিঃ এম, কে, গান্ধী এ ব্যাপারে নীরব ভূমিকা পালন করেন। এর তিন দিন পরই গান্ধীর "ইয়েসম্যান" নবনির্বাচিত কংগ্রেস সভাপতি মিঃ নেহেরু উহার বিরোধিতা করে প্রদত্ত বিবৃতিতে জানান, "গ্রুপ ব্যবস্থা" থাকবে না। ১০ই জুলাই বোম্বাইয়ের সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি স্পষ্ট উক্তি করেন, 'কংগ্রেস গ্রুপ সরকার

www.nagorikpathagar.org

ব্যবস্থা আপাততঃ মেনে নিলেও ভবিষ্যত ভারত সরকারের শাসনতন্ত্র ও কর্মবিধি সম্পর্কে চাপিয়ে দেয়া কোন বিধান ভাবীকালের ভারতীয় গণপরিষদ বা কেন্দ্রীয় পার্লামেন্ট মানতে বাধ্য থাকবে না। তারা গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে সংখ্যাগুরু ভোটেই সব স্থির করবে।' এ সময়ে আসামের মুখ্যমন্ত্রী গোপীনাথ বড়দলুই মিঃ গান্ধীর সাথে এক একান্ত বৈঠকে মিলিত হন এবং তারপরই আসাম বাংলার সাথে গ্রুপভুক্ত থাকবে না বলে বিবৃতি দিয়ে তিনি মিঃ গান্ধীর ইংগিতে আন্দোলন শুরু করেন। কংগ্রেস কেন্দ্রীয় কমিটির প্রস্তাবের বিরুদ্ধে তাঁকে সে আন্দোলনে সক্রিয় সমর্থন জানান মিঃ এম, কে, গান্ধী [মওলানা আযাদের ইন্ডিয়া উইনস ফ্রীডমের টীকা গ্রন্থ –রইছ আহমদ জাফরীর ভারত যখন স্বাধীন হচ্ছিল, অনুবাদ আবদুল্লাহ বিন সাঈদ, পৃঃ ১২৫] । মিঃ গান্ধী ও মিঃ নেহেরুর একগুঁয়েমির চাপে কেবিনেট মিশন ব্যর্থ হয়ে বিলাত ফিরে যান [আয়ান স্টীফেন্‌স, পাকিস্তান, ১১৯–২৮; কোরেশী, ২৭২–৭৮]।

ইতিপূর্বে বছরের গোড়ার দিকে উপ–মহাদেশব্যাপী সাধারণ নির্বাচনে মুসলমান আসনগুলোতে মুসলিম লীগ দল বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে এবং সর্বভারতীয় মুসলমানদের আইনতঃ প্রতিনিধি হয়ে দাঁড়ায়। কগ্রেস গ্রুপ–সরকার–প্রস্তাব প্রত্যাখান করায় মুসলিম লীগও পাকিস্তান প্রস্তাবের দাবীতে ফিরে যায়। এ অবস্থাতেও মুসলিম লীগের ভূমিকা অস্বীকার করে এবং কংগ্রেসের দাবী মেনে নিয়ে ১২ই আগস্ট তারিখে ভাইসরয় লর্ড ওয়াভেল জাতীয় কংগ্রেসকে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা গঠনের আমন্ত্রণ জানান। এর জওয়াবে মুসলিম লীগ ১৬ই আগস্ট ভারতব্যাপী 'প্রত্যক্ষ কর্মপন্থা দিবস' পালনের আহবান জানায়। এতে কর্মীদেরকে মিছিল ও জনসভার মাধ্যমে মুসলমান জনসাধারণের কাছে কেবিনেট মিশন প্রস্তাব প্রত্যাখাত হবার কারণ ও পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করার নির্দেশ দেয়া হয় [আবুল হাশিম, ইন রিট্রোসপেকশন পৃঃ ১১৫–১৬] ।

এ দিনে মুসলমানেরা দাংগার জন্য মোটেই প্রস্তুত ছিলেন না। তার প্রমাণ এটাই যে, কোলকাতায় গড়ের মাঠে জনসভা দেখা বার জন্য বংগীয় মুসলিম লীগের সাধারণ সম্পাদক জনাব আবুল হাশিম তাঁর ১৫ বছর বয়সের কিশোর পুত্র বদরুদ্দিন উমর (বর্তমানে মার্কসবাদী বুদ্ধিজীবী) ও ৮ বছরের শিশুপুত্র শাহাবুদ্দিন মোহাম্মদ আলিকে বর্ধমান থেকে সাথে করে নিয়ে গড়ের মাঠে হাজির হন। অন্য একজন মুসলিম লীগ নেতা ফরিদপুরের আবদুল্লাহ জহীরুদ্দিন লাল মিয়ার কোলে ছিল তাঁর পাঁচ বছর বয়স্ক নাতী [আবুল হাশিম, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১১৬] । অপ্রস্তুত মুসলমান জনতা সেদিন সভাশেষে ফেরার পথে কোলকাতার সড়কে গলিতে বর্ণহিন্দু গুন্ডাদের হাতে হাজারে হাজারে প্রাণ হারালো। কোলকাতায় মুসলমান নাগরিক ছিল ২৫%, হিন্দু ৭৫% । মুলমানরা ছিল গরীব–দাংগার প্রস্তুতি নেবার সাধ্যও তাদের ছিল না। দাংগার জন্য হিন্দুরাই সপ্তাহকাল

www.nagorikpathagar.org

ধরে প্রস্তুতি গ্রহণ করে, আগ্নেয়াস্ত্র সংগ্রহ করে। প্রথম হাসপাতালে আনীত আহত-নিহতদের প্রায় সবই ছিল মুসলমান [মুসলিম লীগ ও মিঃ জিন্নাহর ঘোর শত্রু, মওলানা আযাদের দক্ষিণ হস্ত ও কংগ্রেস সমর্থক আবদুর রাজ্জাক মালিহাবাদী সম্পাদিত ও কোলকাতা থেকে প্রকাশিত দৈনিক হিন্দ্ পত্রিকার সংশ্লিষ্ট সময়ের সংখ্যাগুলোদ্রষ্টব্য]।

বাংলা প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সাধারণ সম্পাদক আবুল হাশিমের অহবানে নমশূদ্র তপশিলী সম্প্রদায়, খৃষ্টান, আদিবাসী ও উপজাতীয় সম্প্রদায়ের লোকেরাও সেদিন গড়ের মাঠের জনসভায় যোগ দিয়েছিলেন। তাদেরও অনেকে ফেরার পথে প্রাণ হারিয়েছিলেন। কোলকাতার দাংগায় খিদিরপুর ডকইয়ার্ডে কর্মরত নোয়াখালি ও কুমিল্লার কয়েক হাজার মুসলমান শ্রমিককে হত্যা করা হয়। [আবুল হাশিম, প্রাগুক্ত, ১১৮]-এবং এর প্রতিক্রিয়ায় মওলানা গোলাম সরওয়ারের নেতৃত্বে নোয়াখালির কয়েকটি গ্রামে দাংগার পরিবেশ সৃষ্টি হয়ে উঠে। একই সময়ে বিহার প্রদেশে ব্যাপক মুসলিম নিধন শুরু হয়। ১৯২৩-২৬ সালেও ভারতের নানা স্থানে বর্ণহিন্দু দাংগাবাজদের হাতে মুসলমানেরা প্রাণ হারান। কিন্তু সবকিছু দেখেও না দেখার ভানকারী মিঃ এম, কে, গান্ধী তখন কোহাটে মুলিম সংখ্যাগুরু এলাকায় সংঘটিত একটি তাৎক্ষণিক দাংগার প্রতি সারা ভারতের হিন্দুদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে মুসলিম নিধনের নতুন ইন্ধন যোগাবার মতলবে অনশন ধর্মঘট করেন। এবারেও তিনি সমগ্র বিহার প্রদেশব্যাপী মুসলিম নিধন অভিযান উপেক্ষা করে নোয়াখালির উপদ্রুত গ্রাম কয়েকটিতেএসে তাঁবু ফেলেন, মুসলমান 'দাংগাবাজ চরিত্রে'র উপর হিন্দু দৈনিক পত্রিকাগুলোতে হেড লাইন সৃষ্টি করে বিশ্ববাসীর ও ভারত সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণের মতলবে। সে মতলব সফল হলো, উপ-মহাদেশের অন্যান্য হিন্দুপ্রধান প্রদেশগুলোতেও দাংগা ছড়িয়ে পড়লো। মজার ব্যাপার, মিঃ গান্ধীর নোয়াখালি উপস্থিতিকালেই প্রত্রিকায় প্রকাশিত হিসাব অনুযায়ী সেখানে নিহতের মোট সংখ্যা ছিল নোয়াখালীতে ২২০ ও ত্রিপুরা জেলায় ৬৫ জন এবং বিহারে নিহত মুসলমানের সংখ্যা ছিল ৩০ হাজার [কোলকাতার দৈনিক ষ্টেট্স্ম্যান পত্রিকার তৎকালীন সম্পাদক আয়ান ষ্টীফেন্স, পাকিস্তান, ১২৭-১৩০; ইস্পাহানী, কায়েদে আযম, ২৩০-৩৩]।

এ সময়েই ১৯৪৬ সালের ডিসেম্বরের শেষ ভাগে ভাইসরয়ের শাসনতান্ত্রিক উপদেষ্টা ভি,পি, মেনন সর্দার বল্লভ ভাই প্যাটেলের সাথে কয়েক দফা বৈঠকে মিলিত হয়ে ভারত বিভাগের নতুন পরিকল্পনা খাড়া করেন। [ভিপি মেনন; 'ট্রান্সফার অব পাওয়ার ইন ইন্ডিয়া', পৃঃ ২৫৮-৫৯; খালিদ বিন সাঈদ, 'পাকিস্তান ইন ফর্মেটিভ ফেজ' পৃঃ ১১৯]। উল্লেখ্য, দাংগা শুরুর পূর্ব হতে কংগ্রেস মন্ত্রীদের সমবায়ে গঠিত

www.nagorikpathagar.org

ভাইসরয়ের অন্তবর্তীকারীন কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা ভারতের শাসনকার্য পরিচালনা করতে থাকেন। অক্টোবর মাসে মুসলিম লীগও সে মন্ত্রিসভায় যোগদান করে। মুসলিম লীগের পক্ষ থেকে যোগেন্দ্রনাথ মন্ডল (বাংলা), আই,আই, চুন্দ্রীগড় (বোম্বাই), সরদার আবদুর রব নিশতার (সীমান্ত), গজনফর আলি (পাঞ্জাব) ও লিয়াকত আলী খান (যুক্তপ্রদেশ) অন্তবর্তীকালীন মন্ত্রিসভায় যোগ দেন। দেশরক্ষা ও স্বরাষ্ট্রসহ গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রণালয়গুলো কংগ্রেসী মন্ত্রীরা গ্রহণ করে অর্থ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব লিয়াকত আলীকে প্রদানকরেন।

তাদের বিশ্বাস ছিল, মুসলমানেরা বাজেট প্রণয়নের মতো কঠিন কাজ সমাধা করতে পারবে না; সব কিছু লেজে–গোবরে করে ফেলবে। কিন্তু চৌধুরী মোহাম্মদ আলী ও গোলাম মোহাম্মদের সহযোগিতায় লিয়াকত আলী খান 'পুওরম্যানস্ বাজেট' বলে অভিনন্দিত এমনই নিখুঁত বাজেট প্রণয়ন করেন যে, বাজেটের অনুমোদননীতি'র প্যাঁচে পড়ে নেহেরু প্যাটেল সকলেই নাজেহাল হন। বিরাট কিছু করা দূরে থাক, একটি পিওনের নিয়োগপত্র দানেও তাঁরা অপারগ হন। এতে সর্দার প্যাটেল ক্ষিপ্ত হয়ে খোলাখুলি বলতে শুরু করেন যে, মুসলমানদের সাথে একত্রে সরকার চালানো সম্ভব হবে না [ভিপি মেনন, প্রাগুক্ত; খালিদ বিন সাঈদ, প্রাগুক্ত]। এ সময়েই তারা মনে মনে স্থির করে নেন যে, পাকিস্তান মেনে নেয়ার মধ্য দিয়েই মুসলমানদেরকে শায়েস্তা করতে হবে। তদনুযায়ীই ভারতের মুসলমান প্রদেশগুলোর মানচিত্র ও আদমশুমারী রিপোর্টসহ প্যাটেল–মেনন গোপন বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। তাতে তারা মুসলমান প্রধান প্রদেশ পাঞ্জাব ও বাংলার জেলা, মহকুমা, থানা, ইউনিয়ন, গ্রাম পর্যায় পর্যন্ত বিভাগের প্রস্তাব সম্বলিত এরূপ একটি পরিকল্পনা প্রণযন করে ইংল্যান্ডে ভারত সচিবের কাছে প্রেরণ করেন এবং তার এমনই খসড়া সীমানা সংযোজন করে দেন যে, তারা নিশ্চিত ছিলেন, এরূপ "ছেঁড়া কাটা পোকায় খাওয়া" পাকিস্তান কায়েম হলেও অল্প দিনের মধ্যেই তার পুরা কাঠামোই ধসে পড়বে। ভারত সচিবকে প্রেরিত এ পরিকল্পনা সম্বলিত চিঠিতে ডি,পি, মেনন জানান যে, "ভারত যদি ভাগ করতেই হয়, এরূপভাবে বিভক্ত হলে কংগ্রেসের কাছে তা গ্রহণীয় হতে পারে [ভি পি, মেনন, প্রাগুক্ত; খালিদ বিন সাঈদ, প্রাগুক্ত]। জাতীয় কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট নেহেরুর ঘনিষ্ঠ বন্ধু কৃষ্ণ মেননের নেতৃত্বে এসময়েই, ১৯৪৬ সালের ডিসেম্বর মাসে কংগ্রেসের পক্ষ থেকে একটি গোপন প্রতিনিধি দল বিলেতে হাজির হয়ে স্যার ষ্টাফোর্ড ক্রীপ্সের মাধ্যমে এটলী সরকারকে রাজী করেন লর্ড ওয়াভেলের স্থলে লর্ড মাউন্টব্যাটেনকে ভাইসরয় নিয়োগ করতে [ফ্রিডম এ্যাট মিডনাইট, ল্যাপিয়ার এন্ড কলিন্স, পৃঃ ৮]। যত দ্রুত সম্ভব ভারত ছেড়ে যেতে ব্যস্ত এটলী সরকার এই গোপন পরিকল্পনা মেনে নিয়েই লর্ড ওয়াভেলের স্থলে লর্ড মাউন্টব্যাটেনকে ভাইসরয় করে পাঠান। মাউন্টব্যাটেন ছিলেন

www.nagorikpathagar.org

ছিলেন মিঃ নেহেরুর বিলেতী জীবনের বন্ধু। ভাইসরয়ের স্ত্রী ছিলেন নেহেরুর ততোধিক প্রিয়। পক্ষান্তরে বৃটিশ পলিসির লক্ষ্য ছিল ভরতকে এমনভাবে রেখে যাওয়া, যাতে নিজেদের বিবাদ-বিসম্বাদের কারণে ভারতীয় হিন্দু-মুসলমান উভয় পক্ষই বৃটিশ প্রভাব-বলয়ের আওতায় থাকে। তদুপরি ভারতে বৃটিশ সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠায় এবং দু'শ' বছরব্যাপী শাসনে হিন্দুরাই ছিল বৃটিশের অকৃত্রিম বন্ধু। প্রশাসনে উত্তরোত্তর অধিকতর অংশীদারিত্বের দাবীতে আন্দোলন করলেও গান্ধী-নেহেরু নেতৃত্ব কোনদিন মুসলমানদের মতো সুস্পষ্ট ভাষায় স্বাধীনতা দাবী করেনি-এমনকি ১৯৪২ সালের ৮ই আগস্ট গৃহীত বহুল প্রচারিত "কুইট ইন্ডিয়া" প্রস্তাবেও স্বাধীনতার ঘোষণা নেই, আছে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে সাহায্যের বিনিময়ে স্বাধীনতা মঞ্জুরির প্রতিশ্রুতির দরখাস্ত। সর্বোপরি বিশ্ব মুসলিম সম্প্রদায় হাজার বছর ধরে খৃষ্টান জগতের দুশমন। উভয় পক্ষের মধ্যে ১০২৮ খৃষ্টাব্দ থেকে ১৪৪৮ খৃষ্টাব্দের মধ্যবর্তীকালে ১০টি ক্রুশেড যুদ্ধ সংঘটিত হওয়া [ফারুক মাহমুদ, 'জাগ্রত মুসলিম আফ্রিকা' ভূমিকা অংশ] ছাড়াও সব সময়েই কোথাও না কোথাও যুদ্ধ চলেছেই। মুসলিম বিশ্বের যে-কোন অংশকে দুর্বল করতে পারলেই তাদের লাভ। এ সবের বাইরেও এ সময়ে নবোত্থিত লগ্নি পুঁজিবাদী আমেরিকা মুক্ত ভারতে বাণিজ্য সম্প্রসারণের প্রয়োজনে ভারতের স্বাধীনতার জন্য চাপ দিতে থাকায় বৃটেনও ভাবতে থাকে যে, ভবিষ্যতের বাণিজ্যিক স্বার্থে মুক্ত ভারতের সংখ্যাগুরু অংশকেই খুশী রাখা প্রয়োজন।

১৯৪৭ সালের ২২শে মার্চ দিল্লী অবতরণ করে ২৪শ মার্চ মাউন্টব্যাটেন ভাইসরয় হিসাবে শপথ গ্রহণ করেন এবং একসপ্তাহের মধ্যেই ভারত বিভাগের প্রস্তুতিপর্ব সমাধা করেন। ভাইসরয় প্রথমেই সর্দার প্যাটেলের সাথে গোপন বৈঠকে মিলিত হন। পরবর্তী দিন মিঃ নেহেরুর সাথে বৈঠক হয মাউন্ট ব্যাটেনের [মওলানা আযাদ, "ইন্ডিয়া উইনস ফ্রীডম", পৃঃ ১৯৮; ডাঃ আবদুল ওয়াহিদ, উপমহাদেশের রাজনীতিতে সাম্প্রদায়িকতা ও মুসলমান, পৃঃ ৩৫৯-৬২]। ভি,পি, মেনন এবং কৃষ্ণ মেননও বিষয়টি আগেই অবহিত ছিলেন। তারা তিন জন প্রকাশ্যে ভারত বিভাগের পক্ষে প্রচারণা চালানো শুরু করেন। [মওলানা আযাদ, "ইন্ডিয়া উইনস ফ্রীডম", পৃঃ ১৯৮-২০৩; ডাঃ আবদুল ওয়াহিদ, উপমহাদেশের রাজনীতিতে সাম্প্রদায়িকতা ও মুসলমান, পৃঃ ৩৫৯-৬২]। নেহেরু ভারত বিভাগের বিরেধিতা করতে মওলানা আযাদকে সরাসরি নিষেধ করেন এবং তাঁকে জানান, "এরূপ বিষয় সম্পর্কে লর্ড মাউন্টব্যাটেনের বিরোধিতা করা আমার পক্ষে ভালো নয়" [মওলানা আযাদ, 'ইন্ডিয়া উইনস ফ্রীডম' পৃঃ ঐ ; ডাঃ আবদুল ওয়াহিদ, উপমহাদেশের রাজনীতিতে সাম্প্রদায়িকতা ও মুসলমান পৃঃ ৩৫৯-৬২]। ২৯শে মার্চ তারিখে মওলানা আযাদ মিঃ গান্ধীর সাথে সাক্ষাৎ করে তাঁকে বলেন, এখন ভারত বিভক্তি ভয়ের কারণ হয়েছে, মনে হয়

www.nagorikpathagar.org

প্যাটেল, এমন কি জওয়াহেরে লালও আত্মসমর্পণ করেছে। আপনি কি আমার পার্শে থাকবেন? না আপনিও পরিবর্তিত হয়েছেন?"

মিঃ গান্ধী তাঁকে জানালেন, "এতে জিজ্ঞাসার কি আছে! কংগ্রেস যদি বিভক্তি মেনে লয় তবে তা হবে আমার মৃতদেহের উপর। যতদিন আমি বেঁচে আছি, ততদিন ভারত বিভক্তি প্রস্তাবে রাজী হবো না, তাতে সাহায্য করবো না এবং কংগ্রেসকে এ প্রস্তাব গ্রহণ করতেও দেবো না। [মওলানা আযাদ, 'ইন্ডিয়া উইনস ফ্রীডম' পৃঃ ২০৩; ডাঃ আবদুল ওয়াহিদ, 'উপমহাদেশের রাজনীতিতে সাম্প্রদায়িকতা ও মুসলমান' পৃঃ ৩৫৯–৬২]।

"পরবর্তী দিন মিঃ গান্ধী মাউন্টব্যাটেনের সাথে সাক্ষাৎ করেন এবং পরের দুইদিন প্যাটেলের সাথে আলোচনা করেন" [মওলানা আযাদ, "ইন্ডিয়া উইনস ফ্রীডম" থেকে উদ্ধৃতি ডাঃ আবদুল ওয়াহিদ, 'উপমহাদেশের রাজনীতিতে সাম্প্রদায়িকতা ও মুসলমান' পৃঃ ২৩৬–২৬৫]। এতে তিনি নিশ্চিত হন যে, তাঁর আশীর্বাদে প্রণীত মেনন প্রস্তাব বাস্তবায়নের মাধ্যমে 'ছেঁড়া কাটা পোকায় খাওয়া' পাকিস্তান বরাদ্দ করে মুসলমানদেরকে শায়েস্তা করার সব ব্যবস্থাই পাকাপোক্ত হয়েছে। চতুর্থ দিন মওলানা আযাদ মিঃ গান্ধীর সাথে পুনরায় দেখা করেন এবং চূড়ান্তভাবে উপলব্ধি করেন যে, মিঃ এম, কে, গান্ধী শিবাজীরই বংশধর,কিন্তু ততক্ষণে 'মহাত্মাজীর' চাদরের নীচে লুকানো বাঘনখ অস্ত্র আফজল বেগের মতো তাঁরও পাঁজর-দেশকে এ-ফোঁড় ও-ফোঁড় করে ফেলেছে। মওলানা আযাদের ভাষায়ঃ "আমি আমার জীবনের সর্বাপেক্ষা কঠিন আঘাত পাই। আমি লক্ষ্য করি, তিনি পরিবর্তিত হয়ে গেছেন। এর চেয়েও আমি অন্তরে আরও আঘাত পাই ও আশ্চর্য হয়ে যাই যখন তিনি সর্দার প্যাটেলের যুক্তিগুলোরই পুনরুক্তি করেন। আমি তাঁর কাছে দুই ঘন্টা ওকালতি করি। কিন্তু তাঁর মনে কোন প্রকার ছাপ ফেলতে অক্ষম হই।" [মওলানা আযাদ, "ইন্ডিয়া উইনস ফ্রীডম" পৃঃ ২০৩; ডাঃ আবদুল ওয়াহিদ, "উপমহাদেশের রাজনীতিতে সাম্প্রদায়িকতা ও মুসলমান" পৃঃ ৩৫৯–৬২]।

১৪ জুন তারিখে নিখিল ভারত কংগ্রেস কেন্দ্রীয় কমিটির বৈঠকে ভারত বিভাগের প্রস্তাব উত্থাপন করেন পন্ডিত গোবিন্দ বল্লভ পন্থ এবং তার সমর্থনে প্যাটেল, নেহেরু ও গান্ধীর বক্তৃতার পর প্রস্তাবটি গৃহীত হয়। [মওলানা আযাদ, "ইন্ডিয়া উইনস ফ্রীডম" পৃঃ ২১৪; ডাঃ আবদুল ওয়াহিদ, "উপমহাদেশের রাজনীতিতে সাম্প্রদায়িকতা ও মুসলমান" পৃঃ ৩৫৯–৬২]। মিঃ নেহেরু এক বিবৃতিতে ঘোষণা করেনঃ "যদি মুসলিম লীগ ইচ্ছা করে তাদের পাকিস্তান পাইতে পারে কিন্তু তাদেরকে এই শর্ত

www.nagorikpathagar.org

মানতে হবে যে, ভারতের যে–সব অংশ পাকিস্তানে থাকতে ইচ্ছা প্রকাশ করবে না সব অংশ পাকিস্তানভুক্ত হবে না [আয়ান ষ্টিফেন্স, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৯৫, ১০০, মিঃ জিন্নাহর কাছে তখন আর এটা প্রকাশ পেতে বাকী রইল না যে, সারা জীবন যে কংগ্রেস ভারত বিভাগের বিরোধিতাকারী তারাই যখন এবারে বিভাগ চাইছে–তখন নিশ্চয়ই এটা একটা ষড়যন্ত্রের নাটক অভিনীত হচ্ছে।

কংগ্রেসী রাজনীতির মঞ্চে যখন এ নাটক মঞ্চস্থ হচ্ছে তখন তার পাশাপাশি বৃটিশ–কংগ্রেস যোগসাজশের ধারাও দ্রুতগতিতে এগিযে চলেছে। মেনন–প্যাটেল প্রস্তাবের মূল ভিত্তিতে "মাউন্টব্যাটেন তাঁহার উপদেষ্টাদের সহিত পরামর্শ করিয়া একটি শাসনতান্ত্রিক পরিকল্পনা রচনা করেন। এই পরিকল্পনায় প্রদেশগুলির হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রস্তাব করা হয় এবং বলা হয় যে, ইচ্ছা করিলে তাহারা উপ–যুক্তরাষ্ট্র (confederation) গঠন করিবে। পরিকল্পনায় বাংলা ও পাঞ্জাব বিভাগের মাধ্যমে হিন্দু বাংলা ও অমুসলিম পাঞ্জাব গঠনেরও প্রস্তাব করা হয়। এই পরিকল্পনা ১৫ ও ১৬ এপ্রিল গভর্ণরদের বৈঠক অনুমোদিত হয়। ২রা মে লর্ড ইসমে এই পরিকল্পনা নিয়ে লন্ডনে যান। শ্রমিক সরকার কিছুটা সংশোধন করিয়া ইহা অনুমোদন করেন। ১০ মে বড়লাট ইহা ফিরিয়া পান। এই সময়ে মাউন্টব্যাটনে ও নেহেরু সিমলায় ছিলেন। মাউন্টব্যাটেন পরিকল্পনাটি নেহেরুকে দেখিতে দেন। নেহেরু ইহার বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করেন। কারণ তিনি মনে করেন যে, ইহার ফলে কলকান অঞ্চলের মতো ভারতে বহু রাষ্ট্রের সৃষ্টি হইবে। নেহেরুর আপত্তির জন্য পরিকল্পনাটি বাতিল হইয়া যায় এবং নূতনভাবে পরিকল্পনা রচিত হয়। মাউন্টব্যাটেন পরিকল্পনা সংশোধনের ভার তাঁহার শাসনতান্ত্রিক উপদেষ্টা ভি,পি, মেননের উপর ন্যস্ত করেন। মেনন তাঁহার পূর্বের প্রস্তাব অনুযায়ী খসড়া পরিকল্পনা প্রস্তুত করেন। ইহা ১১ই মে নেহেরুকে দেখিতে দেওযা হয়। নেহেরু ইহা অনুমোদন করেন। এই পরিকল্পনা নিয়া মাউন্টব্যাটেন নিজে ১৮ই মে লন্ডন যান। এটলী সরকার ইহা অনুমোদন করেন। ৩১শে মে বড়লাট ভারতে প্রত্যাবর্তন করেন [আয়ান ষ্টিফেন্স, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৯৫, ১০০, ১৫]। মাউন্ড ব্যাটেন ২রা জুন নেহেরু, প্যাটেল, জে বি কৃপালনী, জিন্নাহ, লিয়াকত, আবদুর রব নিশতার ও বলদেও সিং এই সাত জন নেতাকে এক বৈঠকে আমন্ত্রণ করেন। তিনি তাঁহার শাসনতান্ত্রিক পরিকল্পনা নিয়া তাদের সহিত আলোচনা করেন। এই প্রধান দুইটি রাজনৈতিক দলের শীর্ষস্থানীয় প্রতিনিধিদের এ বৈঠকে ভইসরয় (ক) বাংলা বিভাগ, (খ) পাঞ্জাব বিভাগ, (গ) ভারতে অথবা পাকিস্তানে যোগদানের প্রত্যক্ষ ইস্যুতে উত্তর–পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে গণভোট এবং (ঘ) আসামের এক জেলা সিলেটে অনুরূপ গণভোট অনুষ্ঠান বিষয়ক বৃটিশ সরকারের প্রস্তাব বিস্তারিত আলোচনা করেন। তিনি জানান যে, বাংলা ও পাঞ্জাব বিভাগের জন্য একটি

www.nagorikpathagar.org

বাউন্ডারী কমিশন গঠন করা হবে–কমিশনের সিদ্ধান্তই হবে চূড়ান্ত, অপরিবর্তনীয় এবং সংশ্লিষ্ট সকলের উপর বাধ্যতামূলক [ফ্যাক্টস্ আর ফ্যাক্টস, ওয়ালী খান, পৃঃ ১২৫]। ভাইসরয় মাউন্টব্যাটেন জানিয়ে দেন যে, দুই দলের নেতাদের কাছ থেকে তিনি তাৎক্ষণিক কোন প্রতিক্রিয়া আশা করেন না; তারা যেন নিজেদের ওয়ার্কিং কমিটির সভায় আলোচনা করে অভিমত ব্যক্ত করেন। মিঃ জিন্নাহ জানান যে, এতোবড় একটি বিষয়ে তাঁকে মুসলিম লীগ পার্টির কাউন্সিল অধিবেশন আহবান করে কাউন্সিলের মতামত গ্রহণ করতে হবে–ওয়ার্কিং কমিটির মতামতই যথেষ্ট হবে না। কংগ্রেস নেতারা জানালেন যে, 'চতুর' জিন্নাহকে যেন পরিস্থিতি পরিবর্তনের মতো সময় মঞ্জুর করা না হয়, তাকে একটি নির্ধারিত সময়সীমা দিয়ে দেয়া হোক। মিঃ জিন্নাহ সেদিন বিকালেই এ ব্যাপারে তাঁর অভিমত জানাবেন বলে তাঁর ওয়াদা আদায় করা হয়। কিন্তু তিনি স্থির সিদ্ধান্তে আসতে না পারায় অভিমত জানাতে বিলম্ব হয়। ভাইসরয় সেদিনই মধ্যরাতে তাঁকে লাট ভবনে হাজির হতে বাধ্য করেন। মিঃ জিন্নাহ হাজির হয়ে জানান যে, তিনি সংগঠনের নিয়মতান্ত্রিক প্রধান মাত্র। "এ ব্যাপারে মুসলিম লীগের কাউন্সিল অধিবেশনের অভিমত নেয়া প্রয়োজন।" মাউন্টব্যাটেন তাঁকে বলেন, "মিঃ জিন্নাহ এ প্রশ্নে ফয়সালার যেসব ব্যবস্থা সম্পাদিত হয়েছে তা বানচালের কোন সুযোগই আমি আপনাকে দেবো না। আপনি যেহেতু মুসলিম লীগের পক্ষে এটা মেনে নেবেন না, আমি নিজেই তাদের তরফে কথা বলবো।" ভাইসরয় এখানেই ক্ষান্ত না দিয়ে আরো বললেন যে, আগামী প্রভাতেই তিনি সকল নেতৃবৃন্দকে জানিয়ে দেবেন যে, জিন্নাহ তাকে সন্তোষজনক আশ্বাস দিয়েছেন এবং কোন অবস্থাতেই জিন্নাহকে সে–ঘোষণার প্রতিবাদ করতেও দেয়া হবে না। মাউনটব্যাটেন বলেন, "এ ঘোষণার পর আমি যখন আপনার দিকে তাকাবো, আপনি শুধু এমনভাবে মাথা কাৎ করবেন, যাতে বোঝা যায় যে, আমি যা বলছি তা সঠিক।" মাউন্টব্যাটেন আরো জানান, "পরবর্তী সকালে অনুষ্ঠিত বৈঠকে জিন্নাহ কর্তব্যপরায়ণভাবেই মাথা নেড়েছিলেন।" মিঃ জিন্নাহ যে সম্মাতির মাথা নেড়েছিলেন, না অসম্মতি প্রকাশ করে নেড়েছিলেন তার সাক্ষ্য কিন্তু অন্য কোথাও মেলেনি। যে মাউন্টব্যাটেন কংগ্রেসের সাথে মিলে এতদূর পারলেন, তিনি অসম্মতিসূচক মাথা নাড়াকে সম্মতিসূচক বলে ধরে নিতে এবং তা নিজের পক্ষে সাফাই হিসেবে প্রকাশ করতে পারবেন না, তাঁকে এমন দুর্বলচেতা ভাববার কোন সংগত কারণ নেই। ----- এর পর ভারত, বাংলা, পাঞ্জাব বিভাগের প্রশ্নে মিঃ জিন্নাহ বা মুসলিম লীগের কাউকে কিছু বলতে দেয়া হয়নি–যা বলার মাউন্টব্যাটেন একাই বলেছেন। এভাবেই মাউন্ট ব্যাটেন "সকলের সম্মতি" লাভ করতে সমর্থ হন। ৩ জুন পরিকল্পনাটি প্রকাশিত হয় এবং নেহেরু, জিন্নাহ ও বলদেও সিং বেতার ভাষণে আপোষমূলকভাবে ইহা গ্রহণ করার কথা ঘোষণা করেন। ৪ জুন এক সাংবাদিক সম্মেলনে মাউন্টব্যাটেন জানান যে, '১৫ আগস্ট বৃটিশ সরকার ক্ষমতা

www.nagorikpathagar.org

হস্তান্তর করিবে' [ডঃ মুহম্মদ আবদুর রহিম, "বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস", পৃঃ ৩০০-৩০১]।

একটি বিষয় অত্যন্ত স্পষ্ট যে, কোলকাতা থেকে ভারতের রাজধানী দিল্লীতে স্থানান্তরিত হবার পর মারাঠী কাশ্মীরী রাজপুতদের বর্ণহিন্দু নেতৃত্ব অথবা মোগলাই মেজাজের শেরোয়ানীসর্বস্ব পশ্চিমা নবাবজাদা-পীরজাদা খান্দানীদের মুসলিম নেতৃত্ব কোন মহলই বাংলার হিন্দু বা মুসলমানদের তেমন গুরুত্ব দেননি। ১৯৩৭ সালের নির্বাচনের পর থেকে '৪৭ পর্যন্ত বৃটিশ ভারতের একমাত্র বাংলা প্রদেশেই মুসলিম লীগ সরকার কায়েম ছিল এবং '৪৬-এর নির্বাচনে বাংলার মুসলমানেরা ১১৯ জন মুসলিম লীগ প্রার্থীর ১১৬ জনকে জয়যুক্ত করে পাকিস্তান কায়েম সম্ভব করে। সে সময়ে পাঞ্জাব, সিন্ধু, বেলুচিস্তান, সীমান্ত প্রদেশের কোথাও মুসলিম লীগ দল সরকার গঠন করতে পারেনি। [কোরেশী, হিস্টোরী অব দি ফ্রীডম মুভমেন্ট' পৃঃ ২৪১-৪৪; রব, 'সোহরাওয়ার্দী পৃঃ ৩৭; ইস্পাহানী, 'কায়েদে আজম' , পৃঃ ১৪৩; জামিলুদ্দীন , ফাউন্ডেশন অব মুসলিম লীগ পৃঃ ২৭২]। তদুপরি সারা উপমহাদেশের ১১টি প্রদেশের মোট মুসলিম জন-সংখ্যার প্রায় অর্ধেকই ছিল বাংগালী তা সত্ত্বেও ভাইসরয়ের অন্তর্বর্তীকারীন কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় বাংগালী মুসলমানদের কোন প্রতিনিধিই লওয়া হয়নি এবং মুসলিম লীগ মন্ত্রীদেরকে জায়গা করে দিতে গিয়ে বাংগালী হিন্দুদের একমাত্র প্রতিনিধি শরৎচন্দ্র বসুকেই মন্ত্রিসভা থেকে বিদায় দেয়া হয়। এর দুই যুগ আগে মহাপ্রাণ দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস, নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসু প্রমুখের সাথে স্যার আবদুর রহীম, শেরে বাংলা ফজলুল হক, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী প্রমুখেরা ১৯২৩ সালে বাংলার হিন্দু মুসলমান মিলেমিশে দেশ শাসনের ওয়াদায় যখন "বেঙ্গল প্যাক্ট" স্বাক্ষর করেন, তখনও পশ্চিমা ব্রাহ্মণ মাড়োয়ারীরা তা বানচাল করে দেয় [ব্রোমফিল্ড, ১৭৫-৭৬; কমরুদ্দিন সোস্যাল হিস্ট্রী অব ইস্ট পাকিস্তান, ২৫০-৫৯; রফিকুল ইসরাম, কাজী নজরুল ইসলাম জীবন ও কবিতা; পৃঃ ১৩৮-৩৯] এবং তার আগে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ 'পূর্ববঙ্গ ও আসাম' প্রদেশের প্রতি পশ্চিমা নবাবজাদা খানজাদারা সমর্থন প্রদানে অনীহা প্রকাশ করায় বাংলাদেশে মুসলিম লীগ নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় এবং বেঙ্গল প্যাক্টের পরে কৃষক প্রজা পার্টির প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৩৮ সালে বাংগালী সুভাষ চন্দ্র বসু নিখিল ভারত জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হলে মিঃ এম, কে, গান্ধীর 'নীরব ভেটো'-র ধাক্কায় তিনি আসন ত্যাগ করতে বাধ্য হন। [রইস আহমদ জাফরী, "ভারত যখন স্বাধীন হচ্ছিল" -মওলানা আযাদের, "ইন্ডিয়া উইনস ফ্রীডম"-এর টীকা গ্রন্থ]। পাশাপাশি দেখা যায়, ১৯৪১ সালে প্রাদেশিক প্রধানমন্ত্রী হিসাবে বাংলার মওলবী ফজলুল হক এবং পাঞ্জাবের সিকান্দার হায়াত খান ভাইসরয়ের যুদ্ধকালীন উপদেষ্টা পরিষদে যোগদান করেন; সেই 'অপরাধে' ফজলুল

www.nagorikpathagar.org

হক মুসলিম লীগ থেকে 'বহিস্কৃত' হন, কিন্তু সিকান্দার হায়াত খান পরিষদে না থেকেও ভাইসরয়কে সাহায্য–সহযোগিতার অনুমতি পেয়ে বেকসুর বিবেচিত হন[মোহাম্মদ ওয়ালি উল্লাহ, আমাদের মুক্তি সংগ্রাম, পৃঃ ৩৬৩]। তবে ফজলুল হককে নাজেহাল করে মুসলিম লীগ ত্যাগে বাধ্য করার পেছনে কোলকাতা কেন্দ্রিক অবাংলাভাষী অথচ "নামে বাংগালী" গ্রুপের সাথে ঢাকার নবাব পরিবার ও অন্যান্য খাজা–গজা–খানবাহাদুর, খানসাহেবদের নিয়ে গঠিত প্রতিক্রিয়াশীল মুসলিম লীগদের চক্রান্তই ছিলপ্রধানতঃ দায়ী।

গান্ধী পন্থী পশ্চিমাদের হাতে বাস্তব শিক্ষা পেয়ে মিঃ শরত বসু কোলকাতা ফেরার পরদিনই বংগীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সাধারণ সম্পাদক আবুল হাশিম তাঁর বাড়ীতে গিয়ে সাক্ষাৎ করলেন এবং প্রস্তাব করলেন যে, সাবেক বেঙ্গল প্যাক্টের অনুরূপ চুক্তির ভিত্তিতে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ গঠন করা হবে—পশ্চিমা নেতাদের নেতৃত্বের পরিধি বাড়াবার প্রয়োজনে বাংলাকে বিভক্ত করতে দেয়া হবে না। দৈনিক স্বাধীনতা পত্রিকায় এ খবর প্রকাশের পর সারা বাংলায় আলোচনার ঝড় উঠলেও তদানীন্তন বাংলার প্রধানমন্ত্রী হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীও আবুল হাশিমের প্রস্তাবে জোর সমর্থন দান করেন। মুসলিম লীগ নেতাদের প্রগতিশীল অংশের সবাই স্বাধীন বাংলার প্রস্তাব সমর্থন করেন। জনাব আবুল হাশিম কোলকাতার সুভাষ ইনস্টিটিউটে অনুষ্ঠিত আজাদ হিন্দ্ ফৌজের বার্ষিক ভোজসভায় দীর্ঘ ভাষণ দিয়ে স্বাধীন বাংলার পক্ষে তাদেরও সর্বসম্মত ও সর্বাত্মক সমর্থন লাভ করেন। বংগীয় প্রাদেশিক কংগ্রেসের প্রেসিডেন্ট শরৎ চন্দ্র বসুর সাথে প্রভাবশালী কংগ্রেস নেতা মিঃ কিরণ শংকর রায়, নলিনী রঞ্জন সরকার, সত্যরঞ্জন বখশীসহ অনেক প্রাদেশিক পরিষদ সদস্য এবং কংগ্রেস কাউন্সিলরও যোগদান করেন। স্বাধীন বাংলার স্বপক্ষে জনাব সোহরাওয়ার্দী ও আবুল হাশিম মিঃ জিন্নাহর সাথে কয়েক দফা আলোচনা ও [Abul Hashim, In Retrospection; Dr. Enayetur Rahim, Provincial Autonomy in Bengal (1937-43)] যোগাযোগ করেন এবং শরৎ বসু ও কিরণ শংকর প্রমুখেরা মিঃ গান্ধীর সাথে কয়েক দফা সাক্ষাৎ ও অনেকগুলো পত্র বিনিময় করেন। [আবুল হাশিম, ইন রিট্রোসপেকশন পৃঃ ১৪৭, ১৫১–৬৩]।

এদিকে স্বাধীন বাংলা পরিকল্পনার আলোচনা চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌছানোর পর বাংলার মুসলীম লীগ ও কংগ্রেসের নেতাদের সমবায়ে একটি শাসনতন্ত্র প্রণয়ন কমিটি গঠিত হয় এবং ভাবী রাষ্ট্রের একটি সাংবিধানিক চুক্তিনামা স্বাক্ষরিত হয়। উভয় দলের মিলিত সমাবেশে কংগ্রেসের পক্ষে শরৎ চন্দ্র বসু এবং লীগের পক্ষে আবুল হাশিম

www.nagorikpathagar.org

১৯৪৭ সালের ২০ মে তারিখে উহাতে স্বাক্ষর করেন [আবুল হাশিম, ইন রিট্রোসপেকশন, পৃঃ ১৪৭, ১৫১–৬৩]। স্বাধীন বাংলার এ সাংবিধানিক চুক্তিতে অন্যান্য বিধানের মধ্যে উল্লেখ্য ধারায় বলা হয়ঃ "বাংলার ভবিষ্যত শাসনতন্ত্র রচিত হবে হিন্দু–মুসলমানের মধ্যে সংখ্যানুপাতিক হারে প্রদত্ত আসনে যুক্ত নির্বাচনের মাধ্যমে নির্বাচিত গণপ্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত গণপরিষদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী।------গণপরিষদ নির্বাচিত না হওয়া পর্যন্ত, বর্তমান মন্ত্রিসভা ভেঙ্গে দিয়ে সমানসংখ্যক মুসলমান ও হিন্দু (তপশিলীসহ) সদস্যদের সমবায়ে নয়া মন্ত্রিসভা গঠিত হবে। উহাতে প্রধানমন্ত্রী থাকবেন মুসলমান এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হবেন হিন্দু। চূড়ান্তভাবে নির্বাচিত আইন পরিষদ ও মন্ত্রিসভা গঠিত না হওয়া পর্যন্ত সামরিক ও পুলিশ বাহিনীসহ সরকারের যাবতীয় চাকরিতে মুসলমানেরা (৫৫% জনসংখ্যা হওয়া সত্ত্বেও) ৫০% অংশ নেবেন এবং হিন্দুরা (তপশিলীসহ) ৫০% পাবেন [আবুল হাশিম, ইন রিট্রোসপেক্শন, পৃঃ ১৪৭, ১৫১–৬৩]

বাংলার হিন্দু–মুসলমান বুদ্ধিজীবী ও রাজনীতিকদের বৃহৎ অংশ যখন মতৈক্যে পৌঁছে গেছে এবং আবুল হাহিম–শরৎ বসুর স্বাধীন বাংলা গঠন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়ে গেছে তখনই, ১৯২৪ সালের হিন্দু–মুসলিম বেঙ্গল প্যাক্ট বাতিলের মতো এটাকেও বাতিল করার জন্য ব্যাপকভাবে সক্রিয় হয়ে উঠলেন মারাঠী মহাত্মা–কাশ্মীরী ব্রাহ্মণ চক্র। মিঃ এম, কে, গান্ধীর সাথে দুই দফা সাক্ষাৎ আলোচনা ছাড়াও অনেকগুলো পত্র বিনিময় হলো বাংলা প্রাদেশিক কংগ্রেসের প্রেসিডেন্ট মিঃ শরৎ বসুর। মিঃ গান্ধী তাঁকে অনেক ঘোরালো যুক্তি দিয়ে বুঝাবার চেষ্টা করলেন যে, বাংগালী সংখ্যাগুরু মুসলমানদের সাথে থাকলে হিন্দুদের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হবে। কিছুতেই যখন শরৎ বসু মিঃ গান্ধীর মত মেনে নিতে রাজী হচ্ছিলেন না, তখন মারাঠী 'মহাত্মা' শেষ খড়গাঘাত হানলেন তাঁর উপর। ৮ জুন তারিখের চিঠিতে তাঁকে জানিয়ে দিলেন, 'ঢের হয়েছে, আর নয়। অবিভক্ত বাংলা রাখতে জওয়াহের লাল নেহেরু ও বল্লভ ভাই প্যাটেল কোনক্রমেই রাজী নন। সুতরাং বাংলা ভাগ হবেই। এ ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করো না।' [আবুল হাশিম, ইন রিট্রোসপেক্শন, গান্ধীর পত্র পৃঃ ১৫৪, ১৫৬]। হুমকি দিয়েই শেষ নয়। মারাঠী 'মহাত্মা' প্রচার চালালেন 'বাংগালা কংগ্রেসী ও তপশিলী হিন্দুরা মুসলিম লীগ সরকারের কাছ থেকে ঘুষ নিয়ে অবিভক্ত বাংলা দাবী করছে।' ৯ জুন তারিখে মিঃ শরৎ বসু মিঃ গান্ধীর কাছে প্রেরিত তারবার্তায় অনুরোধ করলেন এই মিথ্যা অভিযোগের সূত্র এবং যারা ঘুষ খেয়েছে তাদের নামের তালিকা প্রকাশ করতে। ১০ জুন তারিখে তারযোগে মিঃ গান্ধী উহা প্রকাশ করতে অসামর্থ্য জ্ঞাপন করেন–কারণ অভিযোগটি ছিল মিঃ গান্ধীর উদ্ভাবিত, বানোয়াট। মিঃ গান্ধীর মাধ্যমে নিখিল ভারত কংগ্রেসের প্রেসিডেন্ট ও সেক্রেটারীর রেফারেন্স থাকলেও আসলে এটা ছিল

www.nagorikpathagar.org

গান্ধীরই অভিপ্রায়। মিঃ গান্ধীর ধমকে শরৎ বসু মত পাল্টালেন না, কিন্তু বুঝে নিলেন ১৯৩৮ সালে বাংগালী সুভাষ বসু (শরৎ বসুর কনিষ্ঠ ভ্রাতা) নিখিল ভারত কংগ্রেসের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়েও এই গান্ধীর নম্রকুটিল বিরোধিতায় সে–আসন থেকে নেমে আসতে বাধ্য হয়েছিলেন। শরৎ বসু কপালে করাঘাত করে বসে পড়লেন।

কেন্দ্রীয় কংগ্রেস হাই কম্যান্ডের নির্দেশে বাংলা কংগ্রেসের ডাক্তার বিধান রায় ও প্রফুল্ল ঘোষের দলভুক্ত গান্ধীবাদী নেতা–কর্মীরাও বাংলা বিভক্তির দাবীতে সোচ্চার হলেন। তবু দিল্লী ছুটলেন প্রাদেশিক কংগ্রেসের আরেক বাংগালী নেতা মিঃ কিরণ শংকর রায়। শেষ চেষ্টা হিসাবে তিনি কৃপালনী–নেহেরু–প্যাটেলের কাছে অনুনয়–বিনয় করে জানালেন, 'দয়া করে বাংলাকে বিভক্ত করবেন না। সেখানে আমরা একসাথে থাকতে চাই' 'তাঁর সে কাতরোক্তির প্রতি কেউ কর্ণপাত করলেন না। ১৪ জুন কেন্দ্রীয় কংগ্রেস অধিবেশনের প্রেসিডেন্ট আচার্য কৃপালনীর সামনে করজোড়ে দাঁড়িয়ে যখন বাংলাকে বিভক্ত না করার কাতর প্রার্থনা জানাচ্ছিলেন বাংগালী কিরণ শংকর রায়, তাঁর বিগলিত অশ্রু কপোল বেয়ে গড়িয়ে পড়ছিল [ডাক্তার আবদুল ওয়াহিদ, উপমহাদেশের রাজনীতিতে সাম্প্রদায়িকতা ও মুসলমান, পৃঃ ৩৬৭; মওলানা আযাদ, ইন্ডিয়া ইউনস্ ফ্রিডম, পৃঃ ২১৬–১৭] কিন্তু ডি, এল, রায়ের কল্পিত চরিত্র কৌপীনধারী কৌটিল্যের আধুনিক উত্তরসূরী গুজরাটী 'মহাত্মা'। তাঁর অংগ–প্রত্যংগ অনাবৃত থাকলেও অসাম্প্রদায়িকতার চাদরে আবৃত বক্ষদেশ ছিল লৌহকঠিন বর্মে বেষ্টিত। কিরণ শংকর রায় কুলীন হলেও আর্য ব্রাহ্মণদের দৃষ্টিতে তিনি 'বংগজ' 'ক্ষেত্রজ' কুলীন–তাঁর অশ্রুর ছিটা লেগে তাদের বুক আর্দ্র হবার নয়। কল্পিত ব্রাহ্মণ কৌটিল্য অনার্য চন্দ্রগুপ্তের কল্যাণে চন্দ্রগুপ্তের কাতর প্রার্থনা উপেক্ষা করে তারই ভ্রাতার শিরোচ্ছেদ করেন, কঠিন খড়গাঘাতে। কৌপিনধারী আর্য মিঃ গান্ধীও বাংগালী হিন্দুদের কল্যাণেই বংগজ রায় বসু বাবুদের প্রার্থনায় পদাঘাত করে কুঠারাঘাতে "বাংলা মা"–কে লাকড়িচেলা করার নির্দেশ দেন। [আবুল হাশিম, প্রাগুক্ত]

প্রাদেশিক কংগ্রেসকে ধমক দিয়ে বশ করার আগেই ব্রাহ্মণ্যবাদের স্বনামী বাহিনী হিন্দু মহাসভাকেও তারা মাঠে নামিয়ে দেন। হিন্দু মহাসভা ও মহাসভাপন্থী কংগ্রেসী নেতাদের উদ্যোগে ভাইসরয়কে প্রেরিত বিশ হাজার টেলিগ্রামে বাংলা বিভক্তির দাবী করা হয়। [মোহাম্মদ ওয়ালিউল্লাহ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৯৮] ১৯৪৭ সালের ২২ ফেব্রুয়ারী তারিখে বাংলার গভর্ণর স্যার ফ্রেডারিক বারোজ–এর সাথে শ্যামা প্রাসাদ মুখার্জীর একান্ত বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। [আবুল হাশিম, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৩৭]। পরদিনই তিনি পত্রিকায় বিবৃতি দিয়ে দাবী করেন, মুসলমানদের জন্য যদি ভারত বিভক্ত হয়ে পাকিস্তান হতে পারে, হিন্দুদের জন্যও বাংলা বিভক্ত হযে হিন্দু বাংলা গঠিত হতে

www.nagorikpathagar.org

হবে। বাংলার হিন্দুরা 'হিন্দু বাংলা' চায়। ভাইসরয় গ্রীন সিগনাল দেন প্রাদেশিক গভর্ণর ফ্রেডারিক বারোজকে , আর গান্ধী-নেহেরু-প্যাটেল চক্র ইঙ্গিত পাঠান হিন্দু মহাসভার প্রেসিডেন্ট শ্যামা প্রসাদ মুখার্জীকে। ভারতীয় কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট কৃপালনী উহার সমর্থনে পত্রিকায় বিবৃতি দেন। ১৫ এপ্রিল তারিখে হিন্দু মহাসভার উদ্যোগে তারকেশ্বরে অনুষ্ঠিত হলো সম্মেলন। তাতে হিন্দু বাংলা গঠনের দাবী পাস হলো। ভারত বিভাগের মতো বাংলা বিভাগের ব্যবস্থা এতদিনে পাকাপোক্ত হয়ে গেল [আবুল হাশিম, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৩৭]।

বাংলাকে অবিভক্ত রাখার ব্যাপারে মিঃ জিন্নাহর সাথে সংযোগ রক্ষা করছিলেন বাংলার প্রধানমন্ত্রী হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী। মিঃ জিন্নাহ অবিভক্ত বাংলা বহাল রাখার পক্ষে সমর্থন জানিয়ে যাচ্ছিলেন। [আবুল হাশিম, প্রাগুক্ত; ওয়ালী খান, ফ্যাক্টস আর ফ্রাক্টস, পৃঃ ১২৮]। "বাংলার প্রধানমন্ত্রী জনাব হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী ভাইসরয় মাউন্টব্যাটেনকে ২৬ এপ্রিল তারিখে জানান যে, তাঁকে পরিমিত সময় দেয়া হলে তিনি বাংলাকে অবিভক্ত রাখার ব্যাপারে সবাইকে সম্মত করতে পারবেন। জিন্নাহকেও তিনি এ ব্যাপারে রাজি করাতে পারবেন এবং সেক্ষেত্রে বাংলার পাকিস্তানভুক্ত হবার প্রয়োজন পড়বে না" [ওয়ালী খান, ফ্যাক্টস আর ফাক্টস, পৃঃ ১১৬]। জনাব সোহরাওয়ার্দীকে মিঃ জিন্নাহর সাথে সাক্ষাতের কোন সুযোগ না দিয়েই, সেদিন মাউন্টব্যাটেন মিঃ জিন্নাহর সাথে এ ব্যাপারে আলাপ করেন এবং অবিভক্ত বাংলা সম্পর্কে তাঁর মতামত জানতে চান। মাউন্টব্যাটেন লিখেছেন, "কোনরূপ ইতস্ততঃ না করেই মিঃ জিন্নাহ উত্তর দেন, আমি তাতে অত্যন্ত খুশি হবো। কোলকাতা বাদ দিয়ে বাংলার কি দাম আছে" [ওয়ালী খান, ফ্যাক্টস আর ফ্যাক্টস, পৃঃ ১১৬; এইচ, ভি, হডসন, দি গ্রেট ডিভাইড, পৃঃ ২৪৬]

এ সময়ে মাউন্টব্যাটেনের পরিকল্পনা বিবেচনা ও গ্রহণের জন্য দিল্লীতে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ উভয় সংগঠনের প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীয় পরিষদে নির্বাচিত সদস্যদের পৃথক পৃথক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। অভিভক্ত বাংলার দাবীদার লীগ সদস্যদেরকে নিয়ে জনাব আবুল হাশিম এবং কংগ্রেস সদস্যদেরকে নিয়ে মিঃ শরত বসু দিল্লী পৌছেন। দিল্লী রেল ষ্টেশনেই মি শরত বসুকে দিল্লীর মহিলারা ঝাঁটা হাতে মিছিল করে বিরূপ সম্বর্ধনা জানায়। [মরহুম আবুল হাশিমের মুখে শ্রুত]। জনাব আবুল হাশিম দিল্লীর পালাম বিমান বন্দরে উপস্থিত হলেই নোয়াখালীর লীগ নেতা জনাব আবদুল জব্বার খদ্দর ছুটে এস তাঁকে জানান, হাশিম ভাই, আমাদের পরাজয় হয়ে গেছে। কায়েদে আযম বাংলা বিভাগ মেনে নিয়েছেন-জনাব সোহরাওয়ার্দী তাঁকে সমর্থন জানিয়েছেন। [আবুল হাশিম, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৫৯]। মাউন্টব্যাটেনের আর্কাইভস, ডায়রী ও

www.nagorikpathagar.org

বাংলায় পাকিস্তান আন্দোলনের পুরোধা ও স্বাধীন বাংলা রাষ্ট্রের উদ্যোক্তা
জনাব আবুল হাশিম

www.nagorikpathagar.org

৩রা জুন ভারত বিভাগ ঘোষণার প্রাক্কালেঃ ভাইসরয় মাউন্টব্যাটেন (মধ্যে), তাঁর বামে কায়েদে আযম মোহম্মদ আলী জিন্নাহ, লিয়াকত আলী খান ও সরদার আব্দুর রব নিশতার এবং ডাইনে পন্ডিত নেহেরু, ভিভি প্যাটেল, বলদেব সিং ও কৃপালনী

ভারত বিভাগের তিন নায়কঃ ভাইসরয় লর্ড মাউন্টব্যাটেন, পন্ডিত জওয়াহের লাল নেহেরু ও বল্লভ ভাই প্যাটেল

www.nagorikpathagar.org

চিঠি–পত্র ভিত্তিক গ্রন্থাবলী অনেক পরে (১৯৭৬) লিখিত ও প্রকাশিত হওয়ায় তখনকারমতো ঘটনাগুলো সবার কাছেই ছিল রহস্যাবৃত। অনেকেই ভেবেছিলেন কায়েদে আজম ও জনাব সোহরাওয়ার্দী মত পাল্টিয়েছেন। আসলে মাউন্ট ব্যাটেন তখন যদি সুসংগঠিত মহাশক্তিশালী জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিনিধি অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধানমন্ত্রী মিঃ নেহেরুর কাছে ভারতীয় সেনাবাহিনী, নৌ–বাহিনী ও বিমানবাহিনীর অধিনায়কদের আনুগত্যের শপথ করিয়ে সারা ভারতের শাসনক্ষমতা এককভাবে কংগ্রেসের হাতেই দিয়ে দিতেন তাহলেই বা কায়েদে আজম কি করতে পারতেন। ২রা জুন রাত্রে মাউন্টব্যাটেন মিঃ জিন্নাহকে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় সে কথা জানিয়েও দেন। [ল্যাপিয়ার ও কলিন্স, মাউন্টব্যাটেন এন্ড দি পার্টিশন অব ইন্ডিয়া] কার্যতঃ এভাবেই ভাইসরয়ের ফরমান জারির মাধ্যমে ভারত বিভাগের ফর্মূলা বাস্তবায়িত করা হয়। বিধান দেয়া হয় যে, প্রত্যেক প্রদেশের আইন পরিষদের সদস্যরা প্রথমে মিলিত বৈঠকে প্রস্তাব পাস করবেন, সংশ্লিষ্ট প্রদেশ পাকিস্তানে না হিন্দুস্থানে যোগ দিবে এবং প্রদেশকে বিভক্ত করতে তারা রাজি আছেন কিনা। হিন্দু মহাসভা পন্থীরাতো "হিন্দু বাংলা" দাবীই করছিল, কংগ্রেস সদস্যদের প্রতিও কেন্দ্রীয় কংগ্রেসের নির্দেশ ছিল বাংলা বিভাগে সমর্থন দানের। সোহরাওয়ার্দী–আবুল হাশিমপন্থীদের প্রভাব খর্ব করে পূর্ব পাকিস্তানের শাসন ক্ষমতা দখল করতে ব্যাগ্র নাজিমুদ্দীন শাহাবুদ্দীনপন্থী মুসলিম লীগ গ্রুপের পক্ষ থেকে তখন প্রচার চালানো হয় যে, কায়েদে আজম স্বাধীন বাংলার বিপক্ষে এবং অবিভক্ত বাংলাকে পাকিস্তানভুক্ত করার পক্ষে ভোটদানের জন্য নির্দেশ দিয়েছেন। তদনুযায়ী বংগীয় প্রাদেশিক আইন পরিষদের ২০ জুন তারিখের অধিবেশনে মুসলিম সদস্যরা বাংলাকে অবিভক্ত রাখার ও পকিস্তানভুক্ত করার পক্ষে ভোটদান করেন। স্যার নাজিমুদ্দিন, পার্লামেন্টারী যাদুকর খাজা শাহাবুদ্দিন, রাজস্ব মন্ত্রী ফজলুর রহমান প্রমুখ মহল এ কাজে অগ্রণী ভূমিকা নেন। মুসলিম লীগের প্রস্তাবে অবিভক্ত বাংলা পাকিস্তানভুক্তির দাবীতে এবারে সকল হিন্দু সদস্যই শংকিত হলেন। ফলে এ অধিবেশনে ১২৬–৯০ ভোটে অবিভক্ত বাংলাকে পাকিস্তানভুক্ত রাখার প্রস্তাব গৃহীত হয়। বিভক্তিকরণ ফর্মূলার অংশ হিসেবেই ১৫ মিনিট পরে অনুষ্ঠিত হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ জেলাগুলোর সদস্যদের বৈঠকে ৫৬–২১ ভোটে পাস হয়ে গেল বাংলাকে বিভক্ত করার প্রস্তাব। একই পদ্ধতিতে দ্বিখণ্ডিত হলো পাঞ্জাব প্রদেশও।

তার পরই সবকিছু এগিযে চললো ১৯৪৬–এর ডিসেম্বরে প্যাটেল ভি,পি, মেনন পরিকল্পিত দেশকে শিরায়–উপশিরায় বিভক্ত করার কর্মসূচী। র‌্যাটক্লিফ রোয়েদাদ ঘোষিত হলো। ঘোষিত হলো বাউন্ডারী কমিশন। কিন্তু র‌্যাটক্লিফ রোয়েদাদের ঘোষিত নীতি সীমানা নির্ধারণে অনুসৃত হলো না [ডাক্তার আবদুল ওয়াহিদ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৭২] কথা ছিল সীমানা নির্ধারণের বেলায় যতোদূর সম্ভব প্রাকৃতিক সীমানা অনুসরণ করা

www.nagorikpathagar.org

হবে এবং মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ এলাকা পূর্ব পাকিস্তানে আসবে। কিন্তু ভাগিরথী নদী হাজার হাজার বছর ধরে রাঢ় বাংলা ও মূল বাংলার সীমানা নির্ধারণ করে বয়ে চললেও এবারে তা উপেক্ষিত হলো। হিন্দু প্রধান থানা, ইউনিয়ন, গ্রাম পর্যন্ত ভারতভুক্ত করার জন্য এমন সীমারেখা টনা হলো যে, কোথাও কোথাও বাড়ীর বাসগৃহ পাকিস্তানে এবং পাকঘর ও গোয়ালঘর পড়লো হিন্দুস্থানে। অথচ মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ সমগ্র মুর্শিদাবাদ জেলা, যার অনেকাংশ ভাগিরথীর পূর্ব পারে অবস্থিত, বীরভূমের রামপুর হাট মহকুমা, আসামের করিমগঞ্জ মহকুমা সম্পুর্ণ অযৌক্তিকভাবে ভারতভুক্ত করে দেয়া হলো। সিলেটকে পাকিস্তানে দেয়া হলো ন্যায় বিচারের জন্যে নয়— আসামে মুসলমানদেরকে নিশ্চিত সংখ্যালঘু করার লক্ষ্যে।

সমগ্র পূর্ব পাকিস্তানে ঢাকেশ্বরী, লক্ষ্মীনারায়ণ, চিত্তরঞ্জন ও মোহিনী মিল বস্ত্রকল এবং ছাতক সিমেন্ট কারখানা ছাড়া আর কোন কল-কারখানা এলো না। সেগুলোও ছিল সম্পূর্ণ পুঁজিহীন। পূর্ব সীমানার সম্পদশালী পাহাড়গুলোকে হিন্দুস্থানে রেখে পাকিস্তানকে সামরিক স্ট্রাটেজিতে দুর্বল করে দেয়া হলো। বিভক্তিকরণ সমাপ্ত হলেই স্পষ্ট হলো প্যাটেল, মেনন, নেহেরু, গান্ধী, মাউন্টব্যাটেনের গোপন বৈঠকও সলাপরামর্শের স্বাভাবিক পরিণতি।

সুতরাং এপার বাংলা ওপার বাংলা বিভক্ত করেছেন মারাঠী কাশ্মীরী আর্য ব্রাহ্মণ্য নেতৃত্ব এবং অবিভক্ত বাংলার দাবী সমর্থন করেও, স্বাধীন বাংলার প্রস্তাব বরদাশত করতে পারেননি বংগীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগেরই মোগলাই মেজাজের বাংলাবাসী কিন্তু উর্দুভাষী উন্নাসিক নবাব নাইট খাজাগজা, খান বাহাদুর, খানহাসেবেরা-নিছক ক্ষমতা দখলের চিরস্থায়ী ব্যবস্থা কায়েমের মতলবে। আর তাতে সমর্থন যুগিয়েছেন বাংগালী নামধারী এ অঞ্চলের তথাকথিত খান্দানী বৃটিশপোষ্য প্রতিক্রিয়াশীল মহল। বাংলার সাধারণ মুসলমানদের সাথে সম্পর্ক-বর্জিত হলেও তারাই পরে হয়ে ওঠেন পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম লীগের কর্ণধার। ১৯৪০ সালের লাহোর প্রস্তাবের সাথে বিশ্বাস রক্ষা না করার পরিণতিতেই এক পাকিস্তান ভেঙ্গে গেছে। তবু এপার বাংলা আজ স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ। ওপার বাংলায় বাবুরা আজ বড় বিলম্বে বড় বেচইন।

কোলকাতা মহানগরীর প্রাসাদরাজি বিত্ত-সম্পত্তিতে বাংগালী বাবুদের কোন অংশ নেই। সারা পশ্চিমবঙ্গের কল-কারখানার মালিক তারা নন-সবকিছুই পশ্চিমা মাড়োয়ারীদের। কোলকাতার পথে চলার সময়ে দোকান দফতরের নামফলকগুলোও বাংগালী সন্তানেরা পড়তে পারে না। সবই হয় হিন্দীতে না হয় ইংরেজীতে লেখা। বাংগালী বাবুরা এখন স্বদেশে প্রবাসী। সম্প্রতি পশ্চিমবংগের রাজধানী কোলকাতা

www.nagorikpathagar.org

থেকে ফরাক্কাতে সরিয়ে নেবার উদ্যোগ হয়েছে মাড়োয়ারীদের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণ জোরদার করারমতলবে।

এতদিনে যদি বাংগালী বাবুদের বোধোদয় হয়ে থাকে, আর তারই আন্তরিক শ্লোগান হয়, 'এপার বাংলা-ওপার বাংলা এক হও' ; আমরাও সে শ্লোগানে সাড়া দেবার বিষয় বিবেচনা করতে রাজী হবো। তবে তার আগে বিখ্যাত কৌতুকাভিনেতা ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাষায় তাদেরকে বলবো, "তাইলে দুইহান কতা আছে।"

আমাদের দেশ যতই ক্ষুদ্র হোক, আমরা যতই গরীব হই-এপার বাংলা একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র। কোলাকুলি গলাগলি হয় সমান অবস্থানে দাঁড়িয়ে, উপরে -নীচে দাঁড়িয়ে নয়। গোলামে-স্বাধীনে মৈত্রী হয় না। আমরা পিন্ডি ছেড়েছি, আপনারাও দিল্লী ছাড়ুন।

আপনারা মাড়োয়ারীদের গৃহভৃত্য থাকবেন আর এপার বাংলা আপনাদের সেবাদাস হবে-গৃহভৃত্যের সেবাদাস। ভাবতে মজা লাগে, কিন্তু সে-কি সম্ভব? আপনারা দিল্লীর খোঁয়াড়ে জাবর কাটতে কাটতে হাম্বা হাম্বা ডাক ছাড়বেন, আর সেই আহবানে আকৃষ্ট হয়ে বাংগাল বলদেরা হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে আপনাদের সাথে একই খোঁয়াড়ে ঢুকে পড়বে, বন্দিত্ব বরণ করবে-এমনটি ভাবাও, আপনারাই বলুন, নেহায়েত বেকুবি নয় কি?

www.nagorikpathagar.org

ভারত–বিভাগ রঙ্গমঞ্চের গ্রীণরুমে

১৯৪৭ সালের ১৪ই আগষ্ট 'অখন্ড' ভারতকে খন্ডিত করে ভারত ও পাকিস্তান দু'টি রাষ্ট্র সৃষ্টি হয় এবং ১৯৭১ সালের ২৬শে মার্চ পাকিস্তান দ্বি–খন্ডিত হয়ে বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটে। এক কালের 'অখন্ড' ভারত আজ ত্রি–খন্ডিত। 'সাম্প্রদায়িকতাবাদী' মুসলিম লীগের একগুয়েমীর দরুনই এক দেশ, এক জাতি, এক জাতীয়তাবাদ এভাবে "বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের স্বার্থে" 'ডিভাইড এন্ড রুল' সূত্রে ত্রিখন্ডিত হয়ে বিরাজ করছে–সৃষ্টি হযে আছে তিনটি রাষ্ট্রের কৃত্রিম সীমারেখা। আর তার ফলেই সারা উপমহাদেশে বিরাজ করছে সাম্প্রদায়িক অশান্তি, দ্বন্দ্ব, সংঘাত আর সংঘর্ষ। "ভ্রান্ত" দ্বি–জাতি তত্বের ফসল 'অখন্ড' ভারতের এই ত্রিভংগ রূপ। এর অবসান ঘটানোর মধ্যেই নিহিত রয়েছে উপমহাদেশের স্থায়ী শান্তি।

বিগত কয়েক দশক ধরে উপমহাদেশের বুদ্ধিজীবীদের একটি বিশেষ অংশ এ ভাবধারাই প্রকাশ করে আসছেন এবং তার দ্বারা প্রভাবিত আমাদের তরুণ সমাজের একটি অংশও ভাবতে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছেন যে, তাইতো! প্রতিক্রিয়াশীল সাম্প্রদায়িকতাই সব অনর্থের মূল। এক দেশ, এক রাষ্ট্র, এক জাতীয়তাবাদের পরিপন্থী এ প্রতিক্রিয়াশীলতাই আমাদের সব অকল্যাণের উৎস। আপাতঃভাবে কথাগুলো যেমন শ্রুতিমধুর তেমনই যুক্তিযুক্ত মনে হয়। কিন্তু আসলে কি তাই?

উপরোক্ত বক্তব্যকে সঠিক বলে মেনে নিতে হ'লে তিনটি প্রস্তাবকে প্রথমেই স্বতঃসিদধভাবে স্বীকার করে নিতে হয়।

১। ভারত 'অখন্ড' একটি দেশ–আদিতেও ছিল, বিভাগকালেও ছিল, ভাবীকালেও থাকাউচিত।

২। নিখিল ভারত মুসলিম লীগের সাম্প্রদায়িক মনোভাব ও ভূমিকার দরুনই 'অখন্ড' ভারত খন্ডিত হয়েছে।

৩। যাদের, যে বৃটিশ সরকারের, হাত দিয়ে এ খন্ডায়ন ঘটেছে, তারা নিজেদের সাম্প্রাজ্যবাদী স্বার্থ হাসিলের উদ্দেশ্যে মুসলিম লীগ দলীয় বৃটিশ "দালালদেরকে", বিশেষ করে মিঃ জিন্নাহকে প্রধান দালাল খাড়া করে এ কাজটা সমাধা করেছে।

এ কথাগুলোকে একটু ঘুরিয়ে বললে এই দাঁড়ায় যে, ভারত সব সময়ই একটি 'অখন্ড' দেশ ছিল। বৃটিশ সরকার স্বীয় স্বার্থে প্রধান দালাল মিঃ জিন্নাহর নেতৃত্বে পরিচালিত মুসলিম লীগপন্থী দালালদের মাধ্যমে এ খন্ডায়ন পর্ব সম্পন্ন করেছেন। 'স্বাধীনতার জন্য নিবেদিতপ্রাণ' পন্ডিত জওয়াহের লাল নেহেরুর নেতৃত্বাধীন নিখিল

www.nagorikpathagar.org

ভারত জাতীয় কংগ্রেসের সাথে বৃটিশ শাসক গোষ্ঠীর সম্পর্ক ছিল বিরোধিতার সম্পর্ক।

প্রথমে লীগ দালালদের বিষয়টি ভেবে দেখা যাক। প্রধান দালাল মিঃ জিন্নাহ্ যদি বৃটিশের পক্ষে বশংবদ দালালের ভূমিকা পালন করে থাকেন তাহলে বৃটিশ ভারতের শেষ ভাইসরয় লর্ড লুইস মাউন্টব্যাটেন–যিনি স্বহস্তে ভারত বিভাগের কাজ সম্পন্ন করেছেন–নিশ্চয়ই প্রধান দালালের প্রতি প্রসন্ন থাকতেন। কিন্তু ভারত বিভাগের দীর্ঘ ২৯ বছর পর ১৯৭৬ সালে বিশ্ববিখ্যাত ফরাসী সাংবাদিক ল্যারী কলিন্স ও ডোমিনিকে ল্যাপিয়ারের নিকট এ সম্পর্কিত সাক্ষাৎকারে তিনি যে মন্তব্য করেছেন তাতে প্রমাণ হয় যে, মিঃ জিন্নাহর ভূমিকা বৃটিশ ভাইসরের দালালী তো নয়ই সরাসরি বিরোধীই ছিল। প্রশ্নোত্তরকালে মিঃ জিন্নাহর প্রসংগে তিনি বলেন, "ওহ্! জিন্নাহর ব্যাপারে আমার কোন সহানুভূতিই নেই, তিনি ছিলেন একটা আস্ত হারামজাদা। আসলেই একটা হারামী।" [মাউন্টব্যাটেন এন্ড দি পার্টিশন অব ইন্ডিয়া, কলিন্স ও ল্যাপিয়ার, পৃঃ ৪৭] এ একটি বাক্যই তাঁদের পারস্পরিক "হৃদ্যতার সম্পর্ক" তুলে ধরার জন্য যথেষ্ট। অন্যত্র তিনি বলেছেন, "ভারতের গোয়েন্দা বিভাগ ছিল পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী গোয়েন্দা বিভাগ। সারা ভারতের কোন স্থানে যদি একটি আলপিনও পতিত হতো এবং ভারত সরকার তার কারণ জানতে চাইতেন, গোয়েন্দা বিভাগ তা এনে দিতো। – জিন্নাহ ছিলেন পাথরের মতো হিমশীতল কঠিন ব্যক্তিত্ব। তাঁর কোন ভূমিকাতেই আমি বিস্মিত হতাম না; তিনি ছিলেন এক আজব চিড়িয়া। তার যক্ষ্মা ছিল এবং ডাক্তারেরা জানিয়ে দিয়েছিলেন যে, কোন অবস্থাতেই তিনি ২/৩ বছরের বেশী বাঁচবেন না। তাঁর সেই যক্ষ্মা রোগের খবর গোপন রাখা হয়েছিল। ভারত সরকারের এত শক্তিশালী গোয়েন্দা বিভাগও সে– খবর জানতো না– কেউ যদি আমাকে তখন জানাতো যে, তিনি কয়েক মাসের মধ্যেই মারা যাচ্ছেন, এতদিন পর আজও আমার মনে প্রশ্ন জাগছে, আমি কি তখন এ কথাই বলতাম যে, ভারতকে অবিভক্ত রাখা হোক, বিভাগের দরকার নেই। আমি কি ঘড়ির কাঁটা পেছন দিকেই ঘুরিয়ে দিতাম এবং স্থিতাবস্থা বজায় রাখতাম? খুব সম্ভব সেটাই করতাম।" [পূর্বোক্ত পৃঃ ৩৯] "তিনি ছিলেন এক দারুণ দুষ্ট প্রতিভা। অন্যদেরকে বাগে আনা যেতো। কিন্তু তাকে নয়। জিন্নাহ বেঁচে থাকতে কিছু করা সম্ভব ছিল না" (ফ্রীডমএট মিডনাইট পৃঃ ১০৫)।

এর পাশাপাশি কংগ্রেস নেতাদের প্রতি ভাইসরয় লর্ড মাউন্টব্যাটনের মনোভাব তুলনীয়। ১৯৪৫ সালে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শেষ হবার পর বৃটেন, রাশিয়া, আমেরিকা, চীন এই চতুঃশক্তির প্রশান্ত মহাসাগরীয় "সুপ্রীম কমান্ডার অব দি এলায়েড ফোর্সেস"–পদের দায়িত্ব পালনে রত ছিলেন লর্ড লুইস মাউন্টব্যাটেন; সিংগাপুর হেডকোয়ার্টারে

www.nagorikpathagar.org

অবস্থান করছিলেন তিনি। ভারতের 'স্বাধীনতার জন্য উৎসর্গিতপ্রাণ' নেতা পন্ডিত নেহেরু নিরবচ্ছিন্ন কর্মব্যস্ততা ফেলে পক্ষকালের জন্য অতিথি হয়েছিলেন মাউন্টব্যাটেন পরিবারের।' নেহেরুর মোহনীয় রূপ, তাঁর রুচি ও সংস্কৃতি এবং তাৎক্ষণিক হাস্যরসিকতায় মুগ্ধ ও উৎফুল্ল হয়েছিলেন লর্ড মাউন্টব্যাটেন ও লেডি মাউন্টব্যাটেন। তাঁকে সংগে নিয়ে তারা খোলা গাড়িতে চড়ে সিংগাপুরের রাজপথে ঘোরাফিরা করতেন। ----তাঁর উপদেষ্টারা তাঁকে এরূপ না করার অনুরোধ জানিয়ে বলেন যে, এতে করে একজন বৃটিশ-বিরোধীকে বর্ধিত মর্যাদা প্রদান করা হবে। মাউন্টব্যাটেন বিদ্রুপাত্মকভাবে মন্তব্য করেন, "বর্ধিত মর্যাদা? তিনিই আমার মর্যাদা বাড়িয়ে দেবেন। এই লোকটিই একদিন ভারতের প্রধানমন্ত্রী হবেন।" [ফ্রীডমএ্যাট মিডনাইট, কলিন্স এন্ড ল্যাপিয়ার পৃঃ ৮৪]।

১৯৪৪ সালের ২২শে জানুয়ারী লর্ড মাউন্টব্যাটেন তাঁর ৩৩তম আর্মি কোরের কর্মদক্ষতা তদারকের জন্য আহমদনগর সফর করেন এবং জানতে পারেন যে, নেহেরু সে নগরীতেই রয়েছেন। দশ লক্ষ ভারতীয় সৈন্য তখন তাঁর অধীনে কর্মরত-তবু তিনি নেহেরুর সাথে সাক্ষাতের অনুমতি প্রার্থনা করেন। কিন্তু তৎকালীন ভাইসরয় সে অনুমতি প্রদানে অসম্মত হন। [পূর্বোক্ত পৃঃ ৮৪] মিঃ নেহেরুর সাথে লর্ড মাউন্টব্যাটেনের হৃদ্যতা যে অনেক আগে থেকেই বহাল ছিল।, তাঁর এ অনুমতি পার্থনা থেকেই তা প্রকাশ পায়। কিন্তু তাঁর এবং বিশেষ করে লেডি মাউন্টব্যাটেনের এই হৃদয়ের সম্পর্ক যে কত গভীর ছিল তা স্পষ্ট হয়ে ওঠে তিনি ভাইসরয়রূপে দিল্লী আসার পরই। ১৯৪৭-এর ২২শে মার্চ দিল্লী উপস্থিতির পরবর্তী দিনেই মাউন্টব্যাটেন নেহেরুর সাথে বৈঠকে মিলিত হন। অভিষেক অনুষ্ঠানে উচ্ছ্বাসের সাথে নেহেরুর নেতৃত্বাধীন কংগ্রেস নেতাদের অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করেন।

পক্ষকাল পরে মাউন্টব্যাটেন তাঁর দফতর সিমলাতে স্থানান্তরিত করেন। যেখানে তিনি সংগে নেন লেডি এডুইনা মাউন্টব্যাটেন, কন্যা পামেলা মাউন্টব্যাটেন, পন্ডিত জওয়াহের লাল নেহেরু, মিঃ বল্লভ ভাই প্যাটেল ও মিঃ কৃষ্ণ মেননকে। সেখানে ভারত বিভাগের চূড়ান্ত পরিকল্পনা প্রণয়নের সাথে সাথে তারা একে অন্যের সংগ উপভোগ করছিলেন। ইতিমধ্যেই ভাইসরয় আরো দুইজন কংগ্রেসপন্থীকে তাঁর ঘনিষ্ট সহকারী করে সঙ্গে নেন। একজন রাও বাহাদুর ভি, পি, মেনন-ভাইসরয়ের শাসনতান্ত্রিক উপদেষ্টা, অন্যজন ভাইসরয়ের হিন্দু এ-ডি-সি। ইতিপূর্বে কোনদিন কোন ভাইসরয় এ দু'টি পদে কোন ভারতীয়কে গ্রহণ করেননি।

শৈল শিখরের সেই মনোরম পরিবেশে "নেহেরুর সাথে এডুইনা মাউন্টব্যাটেনের বন্ধুত্বও রমরমা রূপ লাভ করে। এডুইনার মতো নারী, ১৯৪৭-এর ভারতে তো বটেই,

www.nagorikpathagar.org

সারা পৃথিবীতে খুব কমই ছিল। এই রূপসী নারীর সুঠাম দেহ বল্লরী ও অভিজাত আনন থেকে বিচ্ছুরিত তীক্ষ্ণ-ধী আবেগ উষ্ণতার উন্মাদনাময়ী আকর্ষণ সন্দেহ ও বিষন্নতায় আচ্ছন্ন নেহেরুকে যতখানি সজীব সতেজ করে তুলতে সক্ষম হতো, তেমনটি আর কেউ পারতো না। চায়ের টেবিলে চটুল বাক্যাবলীতে, মোগলাই উদ্যানে পদচারণার ঘন সান্নিধ্যে, এমনকি, ভাইসরয়ের সুইমিং পুলে সুইমিং কস্টিউম পরে জল-কেলির ডুব-সাঁতারে সংগ দান করে সুন্দরী এডুইনা নেহেরুকে বশীভূত করে, তাঁর মনক্ষুন্নতা দূর করে এবং পরিবেশ হাল্কা করে দিয়ে তাঁর স্বামীর প্রয়াসকে সহজসাধ্য করে দিতে সক্ষম হয়েছিলেন।" [ফ্রীডম এ্যাট মিডনাইট, পৃঃ ১২৭] মাউন্টব্যাটেন পরিবারের সাথে দীর্ঘ এক দশক ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত,অখন্ড ভারতের উৎসাহী সমর্থক ও ভারতের কংগ্রেস কেতৃত্বের প্রশংসায় মুখর মঁসিয়ে কলিন্স ও মঁসিয়ে ল্যাপিয়ারের এ বর্ণনার পর বৃটিশ ভাইসরয় মাউন্টব্যাটেনের পরিবারের সাথে কংগ্রেস নেতৃত্বের সম্পর্ক ব্যাখ্যার আর কোন অবকাশ থাকে না। লুইস মাউন্টব্যাটেন নিজেই উল্লেখ করেছেন যে,ভারতের সাথে তাঁর সম্পর্ক ছিল হৃদয়াবেগের। দিল্লী নগরীতেই ১৯২২ সালের ১৪ই ফেব্রুয়ারী প্রিন্স অব ওয়েলসের সম্মানে ভাইসরয় লর্ড রীডিং প্রদত্ত বলডান্সে ৫ম দফা নৃত্যের প্রাক্কালে এডুইনার প্রতি তিনি আকৃষ্ট হন। পরে এডুইনাকে তিনি বিয়ে করেন এবং পরমাসুন্দরী এডুইনাকে কেন্দ্র করেই তাঁর মনের ভোমরা আজীবন গুঞ্জরণ করে ফেরে। অন্যদিকে এডুইনার হৃদয়-পদ্মও মৌ-ডগমগ মোহনীয়তা নিয়ে ঝিরঝির বায়ে দোল খেয়েছে কাশ্মিরী আপেল-প্রতিম 'সংস্কৃতিবান অভিজাত রুচির প্রতীক' জওয়াহের লাল নেহেরুর চারপাশে।

প্রেমাস্পদের প্রেমাস্পদও প্রেমাস্পদ-এই থিওরীতে রচিত হয়েছিল এ্যাহস্পর্শ। দক্ষিণ এশীয় উপমহাদেশ বিভাগে এ এ্যাহস্পর্শের প্রভাব কম ক্রিয়াশীল হয়নি।

এর কয়েকদিন পূর্বেই নেহেরুর নয়াদিল্লীস্থ বাসবভনের এক গার্ডেন পার্টিতে হাজির হন মাউন্টব্যাটেন দম্পতি। সবাইকে তাক লাগিয়ে দিয়ে ভাইসরয় মিঃ নেহেরুকে বাহু বেষ্টনীতে জড়িয়ে ধরে এক টেবিল থেকে আরেক টেবিলে ঘোরাফেরা করেন। উপমহাদেশের ইতিহাসে, মুষ্টিমেয় দেশীয় রাজা মহারাজার বাইরে, কোন ভারতীয়ের বাড়িতে কোন ভাইসরয়ের পদার্পণ এটাই ছিল প্রথম [ফ্রীডম এ্যাট মিডনাইট, পৃঃ ৭৯] তাই, নেহেরু একাই মাউন্টব্যাটেনের উদ্যানে পায়চারী করে ফুলের গন্ধে আমোদিত হন নাই, তাঁকে নিজের উদ্যানে পায়চারীর আমন্ত্রণ জানিয়ে অধিকার দিয়ে উপহার দিয়েছিলেন পরম যত্নে লালিত ভুবন-মোহনী ডালিয়ার ডালি। [ইন্দিরা একাদশী, বরুণ সেনগুপ্ত] নাস্তিকতায় বিশ্বাসী হয়েও বর্ণবাদী ব্রাহ্মণ, সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী হয়েও পুঁজিপতি টাটা বিড়ালা ডালমিয়াদের পৃষ্ঠপোষক,

www.nagorikpathagar.org

ধর্মনিরপেক্ষতায় বিশ্বাসী হয়েও মুসলিম বিদ্বেষী বর্ণহিন্দু নেতা এটা ভালভাবেই জানতেন যে, exchange is not robbery. এই পথেই অতীতে বর্ণহিন্দু কুলীনকুল "শক হুন দল পাঠান মোগল" সবাইকে "এক দেহে লীন" করে নিয়েছিলেন।

মাউন্টব্যাটেন নিজেই স্বীকার করেন যে, "কেউই, আমি নিজেও ভারত বিভাগ চাই নাই।" [মাউন্টব্যাটেন এন্ড দি পার্টিশন অব ইন্ডিয়া, পৃঃ ৪১] ভাইসরয় নিযুক্তির প্রাক্কালে সম্রাট ষষ্ঠ জর্জ এক একান্ত বৈঠকে তাঁর চাচাতো ভাই মাউন্টব্যাটেনকে গভীর বেদনা-ভারাক্রান্ত কণ্ঠে বলেন, "বৃটিশ সাম্রাজ্য আর থাকছে না, আমিও ভারত সম্রাট থাকছি না। এটা আমার জন্য দুঃখজনক। কিন্তু এ দুঃখ কিছুটা হ্রাস পাবে যদি স্বাধীন ভারত-সম্ভব হলে অখন্ড এবং না হলে খন্ডিত ভারতকেও, তুমি বৃটিশ কমনওয়েলথের অন্তর্ভুক্ত রাখতে পারো। ভাবীকালে কমনওয়েলথই বৃটিশ সাম্রাজ্যের উত্তরসূরী হয়ে বৃটেনকে বিশ্বব্যাপী মর্যাদা দেবে।-------- ভারত কমনওয়েলথে না থাকলে সাম্রাজ্যভুক্ত আফ্রো-এশিয়ার হবু স্বাধীন রাষ্ট্রগুলোও তার অনুসরণ করবে। তখন কমনওয়েলথ হয়ে দাঁড়াবে একটি শ্বেতকায়দের সমিতি। [ফ্রীডম এ্যাট মিডনাইট] মাউন্ট ব্যাটেনের নিয়োগপত্রে বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী স্যার ক্লিমেন্ট এটলী টার্মস আব রেফারেন্স রূপে যে নির্দেশ দেন, ভাইসরয়ের ভাষায় তা ছিল এই যে, তাঁর কাজ হবে ১৯৪৮ সালের ৩০শে জুনের মধ্যে ভারতের সার্বভৌমত্ব বৃটিশ সরকারের নিকট থেকে একটি অখন্ড ভারতীয় জাতির কাছে হস্তান্তরিত করা। [ফ্রীডম এ্যাট মিডনাইট, পৃঃ ৬৭] দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ জয়ী প্রাক্তন বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী এবং তৎকালে পার্লামেন্টে বিরোধী দলীয় নেতা স্যার উইনস্টন চার্চিল যদিও লর্ড মাউন্টব্যাটেনকে বিদায়পূর্ব সাক্ষাৎকারে পরামর্শ দেন ভারতকে স্বাধীনতা প্রদানের বেলায় মুসলমানদের অসুবিধার কথা সহানুভূতির সাথে বিবেচনা করতে, পরে তিনিও মিঃ জিন্নাহর প্রতি প্রদত্ত সমর্থন প্রত্যাহার করে নেন এবং প্যাটেল-মেনন পরিকল্পনার মার্জিত সংস্করণ নেহেরু-মাউন্টব্যাটেন প্লানের (যা ৩রা জুন প্রচার করা হয়) প্রতি সমর্থন দান করেন। [মাউন্টব্যাটেন এন্ড দি পার্টিশন অব ইন্ডিয়া, পৃঃ ৬৪]

ভাইসরয় মাউন্টব্যাটেন ১৯৪৭ সালের ২২শে মার্চ দিল্লী উপস্থিত হয়ে পরবর্তী দিন দায়িত্ব গ্রহণ করেই বন্ধু পন্ডিত নেহেরুর সাথে আলোচনায় বসেন। আরো একদিন পর আলোচনা করেন ভারতীয় কংগ্রেসের লৌহমানব বল্লভ ভাই প্যাটেলের সাথে। এই মিঃ প্যাটেলই এর ৫ মাস পূর্বে ১৯৪৬-এর ডিসেম্বরে তৎকালীন ভাইসরয়ের উচ্চ পদস্থ কর্মচারী ভিপি মেননের সাথে মিলে ভারতকে রগে রগে শিরায়-উপশিরায় থানা ইউনিয়ন গ্রাম পর্যায় অবধি বিভক্ত করে "ছেড়া-কাটা পোকায়-খাওয়া" পাকিস্তান

www.nagorikpathagar.org

দিয়ে মুসলমানদের স্বাধীনভূমির সখ মিটিয়ে দেবার পরিকল্পনা প্রণয়ন করেন। এর তিনদিন পর ভাইসরয় মিঃ গান্ধীর সাথে আলোচনা করে তার সমর্থনও লাভ করেন।

নেহেরু প্যাটেল গান্ধীর সাথে সলাপরামর্শ এক সপ্তাহের মধ্যেই শেষ করে লর্ড মাউন্টব্যাটেন মিঃ জিন্নাহর সাথে বোঝাপড়া করার কাজে হাত দেন। পরপর কয়েকদিন ধরে অনুষ্ঠিত বৈঠকে তিনি মিঃ জিন্নাহকে বোঝাবার প্রয়াস পান যে, মুসলমানেরা অখন্ড ভারতীয় জাতিরই অংশ। অখন্ড ভারত কায়েম হলে ভারত একটি বৃহৎ শক্তিতে পরিণত হবে, বিশ্ব রাজনীতিতে নেতৃত্ব দিতে পারবে; বিভক্ত ভারতে রাষ্ট্রগুলো ছোট ছোট হলে সে সম্ভবনা থাকবে না। বিরাট ভারতীয় জাতির অংশ হয়ে থাকলেই মুসলমানদের সর্বমুখী কল্যাণ হবে।----- শেষপর্যন্ত মিঃ জিন্নাহকে বোঝাতে অপারগ হয়ে ভাইসরয় মাউন্টব্যাটেন হুমকি দেন যে, অখন্ড ভারত মেনে না নিলে বাংলা ও পাঞ্জাবকে বিভক্ত করা হবে, কলকাতা মহানগরীকে ভারতভুক্ত করা হবে এবং অমুসলিম সংখ্যাগুরু প্রতিটি এলাকা বের করে নিয়ে এমন পাকিস্তান দেয়া হবে-যা কোনক্রমেই টিকে থাকতে পারবে না। [মাউন্টব্যাটেন এন্ড দি পার্টিশন অব ইন্ডিয়া, পৃঃ ৪২, ৪৩, ৪৪] ভাইসরয় জানান যে, শুধু হুমকি নয়, "কঠোর মর্মঘাতী ব্যবহার দ্বারা জিন্নাহকে নিরস্ত করা হবে" [ভাইসরয়ের স্টাফ মিটিং-এর কার্যবিবরণী, তাং৩১-৫-৪৭]।

মিঃ গান্ধীর লক্ষ্য ছিল নিখিল ভারতব্যাপী এক রামরাজ্য প্রতিষ্ঠা। মিঃ নেহেরুর স্বপ্ন ছিল ভারতীয় সংস্কৃতিরূপে পুনঃপ্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সমগ্র দক্ষিণ এশিয়াব্যাপী ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতি-সভ্যতার প্রভাব-বলয় সৃষ্টি, গান্ধীর মানসপুত্র অন্তর্বর্তীকালীন ভারত সরকারের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মিঃ প্যাটেল অর্থমন্ত্রী জনাব লিয়াকত আলীর "গরীবের বাজেট-এর ধাক্কায় নাজেহাল হয়ে মুসলমানদেরকে শায়েস্তা করার উদ্দেশ্যে এমন আকৃতিকে 'পাকিস্তান' দিতে চেয়েছিলেন যা' ছয় মাসের মধ্যেই ধ্বসে পড়লে মুসলিম নেতারা জোড় হস্তে কংগ্রেসের কৃপাপ্রার্থী হয় ঃ তারা অখন্ড ভারত চাইবেন এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু কবলমুক্ত সাম্রাজ্যের প্রজাদের ভাবীকালীন মহাকল্যাণ কামনায় সাম্রাজ্যবাদী শাসকেরা এতো ব্যাকুল হলেন কেন? ভারতের অখন্ডত্বকে তারা এতো গুরুত্বপূর্ণ ভাবলেন কোন গরজে? ভরত টুকরো টুকরো হবে এই জুজুর ভয় দেখিয়ে ভাইসরয় বাংলা ও পাঞ্জাবকে স্বাধীন রাষ্ট্র করার গণদাবী প্রত্যাখ্যান করলেন কেন? [ভারত সচিবকে লেখা ভাইসরয়ের ৮ই জুনের রিপোর্ট]

ভারত কি ইতিহাসের কোন অধ্যায়ে অখন্ড অর্থাৎ এক দেশ এক জাতি এক রাষ্ট্র ছিল? ইতিহাস এর বিপরীত সাক্ষ্যই বহন করে। বর্ণহিন্দু বুদ্ধিজীবীদের দ্বারা ভারতবর্ষ

www.nagorikpathagar.org

নামকরণ হবার সূত্রে "বৃটিশ ইন্ডিয়া" নামে অভিহিত এই বিশাল ভূভাগটি ইতিহাসের আদি স্তর থেকে কোন দিনই এক দেশ এক জাতি এক রাষ্ট্র ছিল না। এটা ছিল শতাধিক ভাষা-উপভাষাভাষী, ততোধিক সংখ্যক গোত্র-কুল ও বিভিন্ন ধর্মানুসারীদের ধারণ করে গড়ে ওঠা ছোট বড় বিপুল সংখ্যক জনপদ ও দেশের সমাহার -একটি মহাদেশ। এশিয়া মহাদেশের বিশালতম আয়তনের প্রেক্ষিতে একে বড়জোর একটি উপমহাদেশ বলা চলে। কিন্তু এ ভূ-ভাগকে একটি দেশ বলা যায় না কোন যুক্তিতেই। অখন্ড দেশতো নয়ই। তবু সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশ নেতারা আগ্রাসী সাম্প্রদায়িক কংগ্রেসের সাথে মিলে অখন্ড ভারত কায়েমের চেষ্টা করলেন কেন? এর পেছনে তাদের কোন্ স্বার্থ নিহিত ছিল? এ রহস্য ভেদ করতে হলে দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধোত্তর পৃথিবীর পরিস্থিতি পর্যালোচনা করা প্রয়োজন।

॥ ২ ॥

১৯৪৭ সালে ১৪ আগস্ট তৎকালীন পৃথিবীর এক পঞ্চমাংশ অধিবাসী অধ্যুষিত এই দক্ষিণ-এশীয় উপমহাদেশকে বিভক্ত করে পাকিস্তান ও হিন্দুস্থান দু'টি স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা হয় এবং বৃটিশ প্রভুদের অনুকম্পায় হিন্দুস্থান ভারত নামটি ব্যবহারের সুযোগ লাভ করে। সেদিনের উপমহাদেশব্যাপী ব্রাহ্মণ্যবাদীদের রক্তের হোলি খেলার ভয়াবহতম পরিস্থিতির মধ্যে যেসব মুসলিম মনীষী, নেতা ও কর্মীবৃন্দ উপমহাদেশে একাধিক স্বাধীন সার্বভৌম আবাসভূমি— যা ছিল বাংলার প্রধানমন্ত্রী শেরে বাংলা ফজলুল হক কর্তৃক প্রণীত ও উত্থাপিত লাহোর প্রস্তাবের মূল দাবী-কায়েমের জন্য সংগ্রাম করেছিলেন, তারা সে পরিস্থিতির তীব্রতা সমগ্র অভিজ্ঞতা দিয়ে উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছিলেন ঠিকই, কিন্তু তার পেছনের সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশ ও বর্ণহিন্দু কংগ্রেস নেতাদের যে অব্যাহত সলাপরামর্শ, ষড়যন্ত্র ও পরিকল্পনা কাজ করে যাচ্ছিল সে-বিষয়ে আন্দাজ করতে পারলেও কোনরূপ স্বচ্ছ ধারণা তাঁদের ছিল না। থাকা সম্ভবও ছিল না। ভাইসরয়ের সিনিয়র স্টাফ ভি· পি মেনন ও ভি· ভি প্যাটেল কর্তৃক মুসলমানদের শায়েস্তা করার উদ্দেশ্যে প্রণীত বিভাগ-পরিকল্পনা বিলেত পাঠানোর খবর, ভাইসরয় লর্ড ওয়াভেলকে সরিয়ে তাঁর স্থলে নেহরুর ঘনিষ্ঠ বন্ধু লর্ড মাউন্টব্যাটেনকে নিযুক্তিদানের জন্য কংগ্রেস প্রতিনিধি দলের নেতা কৃষ্ণ মেনন ও বৃটিশ অর্থমন্ত্রী স্যার স্টাফোর্ড ক্রীপস্-এর গোপন বেঠক, দিল্লী ও সিমলায় ভাইসরয় মাউন্ট্যাটেন এবং পন্ডিত নেহেরু, মিঃ কৃষ্ণ মেনন, মিঃ প্যাটেল ও মিঃ ভিপি মেননের দিনের পর দিন, রাতের পর রাত ধরে গোপন বৈঠক এবং তার প্রেক্ষিতে ভাইসরয়ের স্টাফ মিটিং-এর গোপন সিদ্ধান্ত ইত্যাদির কোন খবরই তখন উপমহাদেশীয় মুসলিম নেতাদের অবহিত হবার কোন সুযোগ ছিল না। ফলে, বৃটিশ-

www.nagorikpathagar.org

কংগ্রেসী প্রচার মাধ্যমগুলোর অবদানে এ বিষয়ে অনেক ভ্রান্ত ধারণা বদ্ধমূল হয়ে আছে। কিন্তু বিগত চার দশকে রাও বাহাদুর ভি.পি. মেননের স্মৃতিচারণ, ভাইসরয় লর্ড ওয়াভেলের রোজনামচা, মিঃ কৃষ্ণমেননের স্বীকারোক্তি, লর্ড মাউন্টব্যাটেনের সাক্ষাৎকার, ভারত-সচিবের কাছে প্রেরিত ভাইসরয় মাউন্টব্যাটেনের রিপোর্টসমূহ, এবং ভাইসরয়ের নিয়মিত স্টাফ-মিটিংগুলোর কার্যবিবরণীর রেকর্ড এবং অন্যান্য সূত্রে প্রাপ্ত তথ্যে যতদূর প্রকাশ পেয়েছে তাতে ষড়যন্ত্রের ভয়াবহতা অনেকখানি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। ষড়যন্ত্র বাস্তবায়নের অবিচ্ছিন্ন ধারায় প্রচারিত একটি ধারণা আজো আমাদের তরুণ সমাজের কোন কোন অংশের মনে বিভ্রান্তির উদ্রেক করছে। বৃটিশ সম্রাট ষষ্ঠ জর্জ, প্রধানমন্ত্রী মিঃ ক্লিমেন্ট এটলী ও স্যার উইনষ্টন চার্চিল উপমহাদেশকে 'অখন্ড ভারত' রাখার উপদেশ-নির্দেশ দিয়েছেন এবং ভাইসরয় মাউন্টব্যাটেন তা করার সাধ্যমত চেষ্টার পাশাপাশি এই ধারণাটি মুসলিম নেতাদেরকে দিয়ে মানিয়ে নেবার চেষ্টা করেছেন যে, ভারত এক দেশ, এক জাতি হিসেবে এক রাষ্ট্র হওয়া উচিত। তারা বোঝাতে চেয়েছেন যে, উপমহাদেশে যদি মূল ক্যাবিনেট মিশন অনুযায়ী বাংলা ও আসাম নিয়ে একটি, পাঞ্জাব-সিন্ধু-বেলুচিস্তান-সীমান্ত প্রদেশ নিয়ে একটি এবং বিহার, যুক্তপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, বোম্বাই, মাদ্রাজ ও উড়িষ্যা নিয়ে একটি স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চল গঠন করা হতো, কিংবা বাংলা ও পাঞ্জাবে সার্বভৌম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা হতো, তাহলে ভারতের অখন্ডতা নষ্ট হতো এবং টুকরো টুকরো ভারতের ক্ষুদ্রাকৃতি রাষ্ট্রগুলো গুরুত্বহীন হয়ে পড়তো। ধারণাটি কতখানি যুক্তিযুক্ত তা পর্যালোচনা করে দেখা যাক।

এই উপমহাদেশ কি ইতিহাসের কোন অধ্যায়ে অখন্ড ভারত এবং এক দেশ, এক জাতি ছিল? সাড়ে তিন হাজার বছর পূর্বে সিন্ধু অববাহিকার হরপ্পা ও মহেঞ্জোদারো সভ্যতাকে ধ্বংস করে আর্যরা-বর্তমান বর্ণহিন্দুদের পূর্বপুরুষ-সংশ্লিষ্ট এলাকার অনার্যদের উপর আধিপত্য কায়েমে সক্ষম হলেও খৃষ্টপূর্ব ৫০০ সালের আগে তাদের গতিবিধি উত্তরাপথ বা দিল্লী এলাহাবাদ অবধি এলাকাতেই সীমিত ছিল। সেই সীমিত অঞ্চলে উপমহাদেশের এক-চতুর্থাংশেরও কম এলাকাতেই তখন অন্ততঃ দেড় ডজন রাষ্ট্রের অস্তিত্বের খবর আমরা তাদেরই পুরাণাদি গ্রন্থাবলীতে পাই। দক্ষিণ ভারতে তখন অবধি তারা প্রবেশাধিকার পায়নি।

আর্যাবর্ত্য, দাক্ষিনাত্য ও প্রাচ্যদেশীয় জনপদবাসীদের মধ্যে গোত্র-কুল-বর্ণ-ধর্ম-ভাষা কোন দিক দিয়েই কোন মিল ছিল না। আর্যেরা ছিল গৌর বর্ণ, প্রাকৃতিক শক্তিসমূহের পূজারী, অনার্যেরা ছিল কৃষ্ণবর্ণ, প্রথমে ষাঁড় শিব বিষ্ণু ইত্যাদি বিভিন্ন অবতারের পূজারী এবং পরবর্তীতে জৈন ও বৌদ্ধ ধর্মের অনুসারী।

www.nagorikpathagar.org

নন্দ মৌর্য ও শিশুনাগ বংশীয়দের রাষ্ট্র আর তাদের সমর্থক পূজাপুজ্ঞও ছিল জাতিতে অনার্য এবং ধর্মে অনার্য বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী। উত্তরাপথের পূর্বপ্রান্তে পৌছাবার আগেই পশ্চিম প্রান্ত-সিন্ধু নদী তীরের শাসনাধিকার-আর্যদের হাতছাড়া হয়ে ৫০০ খৃষ্টপূর্বাব্দে পারস্য সাম্রাজ্যভূক্ত হয়ে যায়। আলেকজান্ডারের বিজয়-পরবর্তী দুইশত বছর উত্তর ও পশ্চিম ভারত ছিল গ্রীকদের অধীন বিভিন্ন শাসিত বা আশ্রিত করদ রাজ্য। খৃষ্টীয় ১ম শতকে সম্রাট কনিষ্কের সাম্রাজ্য মধ্য এশিয়া অবধি বিস্তৃত থাকলেও তা উপমহাদেশের মধ্যাঞ্চলও অতিক্রম করতে পারেনি। তার আগে পরে দেড় শতাব্দী পেশোয়ার থেকে মালব পর্যন্ত পশ্চিম-উত্তর উপমহাদেশে ছিল শক হুন বংশীয়দের রাজত্ব। এক জাতিত্বের মৌল উপাদান গোত্রকুল-ভাষা-ধর্ম-কৃষ্টি-সংস্কৃতি কোন দিক দিয়েই বর্ণবাদী আর্যদের সাথে তারা এক ছিল না। উপমহাদেশে বর্ণহিন্দু শাসনের স্বর্ণযুগ ৩য় ও ৪র্থ শতকেও উত্তর-পশ্চিম প্রান্ত ও মহীশূরের দক্ষিণাঞ্চল গুপ্ত সাম্রাজ্যের বাইরে ছিল; বৌদ্ধ নিধনযজ্ঞের খড়গ কৃপাণ চালিয়ে রাঢ় (ভাগিরথীর পশ্চিম তীর) অবধি গুপ্ত শাসকেরা বৌদ্ধদেরকে নির্মূল করতে পারলেও বরেন্দ্র, বংগ, সমতট, হারিকেল, রত্নদ্বীপ জনপদে তারা সুবিধা করে উঠতে পারেননি। অনার্য বাংগাল পাল সম্রাট ধর্মপালের সাম্রাজ্য সিকি শতাব্দীর জন্য দিল্লী-কনৌজ অবধি বিস্তৃত হলেও সে অঞ্চলের বাসিন্দাদের সাথে গোত্র-কুল-বর্ণ-ভাষা-ধর্ম-সংস্কৃতি কোন দিকদিয়েই বাংগালীদের মিল ছিল না। তখনো রাষ্ট্রকূট, প্রতিহার, সিন্ধাব, কাকতীয়, তেলিংগানা, হোয়সাল, তামিলাকাম, কামরূপ প্রভৃতি রাষ্ট্রের নিশান উড়িয়ে ছোট বড় অন্ততঃ দুই কুড়ি জাতি এ উপমহাদেশে বসবাস করছিল। মুসলিম তুর্ক-আফগান যুগ পর্যন্ত এ ধারাই অব্যাহত ছিল। অতীতে অশোক ও সমুদ্র গুপ্তের মতো সে-যুগে আলাউদ্দিন খিলজী, গিয়াস উদ্দিন বলবন, আকবর ও আওরঙ্গজেবের আমলে স্বল্পকালের জন্য মাঝে মাঝে উপমহাদেশের বারো আনা আন্দাজ এলাকা এক রাষ্ট্রীয় কাঠামোর অধীনে এসেছে ঠিকই-কিন্তু সেটা ছিল শক্তিশালী সম্রাটদের বিশাল বিপুল সেনাবাহিনীর হাতে মার খেয়ে নতি স্বীকার — স্বেচ্ছাপ্রণোদিত জাতীয় ঐক্য নয়। সংশ্লিষ্ট সাম্রাজ্যবাদী শক্তি দুর্বল হলেই বিজিত জাতিগুলো আবার আজাদীর পতাকা উড়িয়েছে। এমনকি এক অঞ্চল জয় করে সম্রাট পাশ ফিরে অন্য অঞ্চলের দিকে অগ্রসর হতেই বিজিত অঞ্চল আবার স্বাধীন হয়ে গেছে। বাংলায় সুলতানেরা তো একটানা সাড়ে তিন শত বছর স্বাধীন রাষ্ট্র চালিয়েছেন। আর উপমহাদেশের পূর্বাঞ্চল, রংপুর, কোচবিহার ও সিলেটের পূর্ব দিকের বিশাল ভূ-ভাগতো কোনকালেই- গত শতাবাদীতে বৃটিশ সাম্রাজ্যভূক্ত হবার আগে পর্যন্ত-উপমহাদেশীয় অন্য কোন

www.nagorikpathagar.org

রাষ্ট্রকাঠামোর মধ্যে আসেনি। তাদের গোত্রকুলীয়, ধর্মীয়, কৃষ্টি সংস্কৃতিতে স্বাতন্ত্র্য আজও অভ্যস্ত প্রকট। বৃটিশ শাসনামলে উপরি কাঠামেতে সাম্রাজ্যবাদী শক্তির চাপ বহাল থাকা সত্বেও, সরাসরি শাসিত অঞ্চলের বাইরে ৫৬৫টি দেশীয় রাজ্য বিদ্যমান ছিল। গোত্র কুল ভাষা ধর্ম সংস্কৃতিতে তাদের মধ্যে ব্যাপক বৈচিত্র্য ও বৈপরীত্য বিদ্যমান ছিল। মধ্য ভারতের অত্যন্ত সীমিত এলাকায় প্রতিষ্ঠিত বলে কথিত ভরত রাজার রাজ্যকে কেন্দ্র করে গঞ্জিকাসেবী পৌরণিক কাহিনীকারেরা স্ফীত জাত্যভিমানে সমগ্র উপমহাদেশের নাম ভারতবর্ষ রাখলেও বৌদ্ধ পন্ডিতেরা এ উপমহাদেশকে ভারতবর্ষ বলেননি– তারা এ ভূভাগকে শতাধিক ভাষা ও ততোধিক গোত্রকুল ধর্ম বৈচিত্র্য সম্বলিত বহুসংখ্যক জাতি এবং জনপদ বা দেশ নিয়ে গঠিত জম্বুদ্বীপ [বিশ্বেশ্বর চৌধুরী, টেকনাফ থেকে খাইবার] বলেই জানতেন। বহুসংখ্যক দেশ ও জাতির সমাহার এই উপমহাদেশ অতীতেও যেমনটি ছিল, এখনো তেমনটিই আছে এবং বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী চাপ অপসৃত হবার মুহূর্তে ১৯৪৭ সালেও ঠিক এমনটিই ছিল। উপমহাদেশের এ পরিস্থিতির খবর বৃটিশ বুদ্ধিজীবী ও শাসকমহল একটুও কম জানতেন না। এর পাশাপাশি ইউরোপের পরিস্থিতিও তারা আরো ভালভাবে জানতেন।

সোভিয়েত রাশিয়ার অন্তর্ভূক্ত অংশ বাদ দিলে ইউরোপ মহাদেশের মোট আয়তন দাঁড়ায় ১৬ লক্ষ ২৭ হাজর ১শ' ২১ বর্গমাইল, লোকসংখ্যা ১৯৮৫ সালের হিসাবে ৪২ কোটি ৭২ লক্ষ ৩৫ হাজার। [ওয়ার্ল্ড অ্যালম্যানাক, ১৯৮৭]। দক্ষিণ এশীয় এই উপমহাদেশের আয়তন ১৬ লক্ষ ৩২ হাজার ৫শ' ৯৬ বর্গমাইল, লোকসংখ্যা ৯৬ কোটি ৮২ লক্ষ ৮৮ হাজার [ঐ]। কম আয়তনের ইউরোপ মহাদেশে ২৮টি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র রয়েছে। সংগে প্রদত্ত তালিকা প্রমান করে যে, তাদের মধ্যে ১৮টি রাষ্ট্র আয়তনের দিক দিয়ে এবং সবগুলো রাষ্ট্রই লোকসংখ্যার দিক দিয়ে বৃটিশ শাসিত বাংলা, পাঞ্জাব বা মাদ্রাজ প্রদেশের চেয়ে অনেক ছোট ছিল। আর আয়তন ও লোকসংখ্যার প্রশ্নে যদি জাতিসংঘের সদস্য রাষ্ট্রগুলোর প্রতি তাকাই তবে তো আরো মজার চিত্র ফুটে ওঠে। বিশ্বের ৪৩টি রাষ্ট্রের আয়তনই মাত্র ১শ' ৮ একর (!) ও ০ দশমিক ৬ বর্গমাইল (!!) থেকে শুরু করে ১৫ হাজার ৯শ' ৪০ বর্গমাইলেরও কম। জনসংখ্যার নিরিখে এই রাষ্ট্রগুলোর ক্ষুদ্রতমটির লোকসংখা মাত্র ১ হাজার এবং বৃহত্তমটি ১ কোটি ৪৪ লক্ষ ৮১ হাজার। এমনকি গ্রেট বৃটেনের অবিচ্ছেদ্য অংশ ছোট্ট দেশ মাত্র ২৭ হাজার ১শ' ৩১ বর্গমাইল আয়তন এবং ৩৫ লক্ষ ৮৮ হাজার লোক সংখ্যা নিয়ে যুক্তরাজ্যের কোলের কাছেই স্বাধীন পতাকা উড়িয়ে বিরাজ করছে

www.nagorikpathagar.org

সার্বভৌম রাষ্ট্র আয়ার্ল্যান্ড। এ সব ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলোর কোনটিকেই ব্রাহ্মণ্যবাদী ভারতের মতো কোন প্রতিবেশী রাষ্ট্রের হুমকি ও উৎপাত সহ্য করতে হচ্ছে না।

ইউরোপীয় রাষ্ট্রসমূহের আয়তন ও লোকসংখ্যা—১৯৮৬

ক্রঃ নং	দেশের নাম	আয়তন (বর্গমাইল)	লোকসংখ্যা
১	ভ্যাটিকান সিটি	১০৮৭ একর	১,০০০
২	মুনাকো	০৬ বর্গমাইল	২৮,০০০
৩	লীচেন ষ্টেইন	৬২ "	২৭,০০০
৪	এ্যানডোরা	১৮৮ "	৪৩,০০০
৫	লুক্সেমবার্গ	৯৯৮ "	৩,৬৬,০০০
৬	আলবেনিয়া	১১,১০০ "	৩০,৪৬,০০০
৭	বেলজিয়াম	১১,৭৭৯ "	৯৮,৫৮,০০০
৮	নেদারল্যান্ড	১৫,৭৭০ "	১,৪৪,৮১,০০০
৯	সুইজারল্যান্ড	১৫,৯৪১ "	৬৪,৫৭,০০০
১০	ডেনমার্ক	১৬,৬৩৩ "	৫১,০৫,০০০
১১	আয়ারল্যান্ড	২৭,১৩৭ "	৩৫,৮৮,০০০
১২	অষ্ট্রিয়া	৩২,৩৭৪ "	৭৪,৫১,০০০
১৩	পর্তুগাল	৩৫,৫৫৩ "	১,০০,৪৬,০০০
১৪	হাংগেরী	৩৫,৯১৯ "	১,০৬,৪৪,০০০
১৫	আইসল্যান্ড	৩৯,৭৬৯ "	২,৪১,০০০
১৬	পূর্ব জার্মানী	৪১,৭৬৮ "	১,৬৬,৮৬,০০০
১৭	চেকোশ্লোভাকিয়া	৪৯,৩৬৫ "	১,৫৫,০২,০০০
১৮	গ্রীস	৫১,১৪৬ "	৯৯,২১,০০০
১৯	রুমানিয়া	৯১,৬৯৯ "	২,২৭,৩৪,০০০
২০	যুক্তরাজ্য	৯৪,২২৬ "	৫,৬৪,২৩,০০০
২১	পশ্চিম জার্মানী	৯৫,৯৭৫ "	৬,০৯,৫০,০০০
২২	যুগোশ্লাভিয়া	৯৮,৭৬৬ "	২,৩১,২৪,০০০
২৩	ইতালী	১,১৬,৩০৩ "	৫,৭১,১৬,০০০
২৪	পোল্যান্ড	১,২০,৭২৭ "	৩,৭১,৬০,০০০
২৫	নরওয়ে	১,২৫,১৮১ "	৪১,৫২,০০০
২৬	ফিনল্যান্ড	১,৩০,১১৯ "	৪৯,০৮,০০০
২৭	সুইডেন	১,৭৩,৭৩১ "	৮৩,৪৮,০০০
২৮	স্পেন	১,৯৪,৮৯৬ "	৩,৮৮,২৯,০০০
		মোট= ১৬,২৭,১২৫ বর্গমাইল	৪২,৭২,৩৫,০০০

www.nagorikpathagar.org

দক্ষিণ এশীয় উপমহাদেশের রাষ্ট্রসমূহের আয়তন ও লোকসংখ্যা (১৯৮৬)

ক্রমিক সংখ্যা	দেশের নাম	আয়তন (বর্গমাইল)	লোকসংখ্যা
১	বাংলাদেশ	৫৫,৫৯৮	১০,১৪,০৮,০০০
২	ভারত	১২,৬৬,৫৯৫	৭৬,৭৬,৮১,০০০
৩	পাকিস্তান	৩১০৪০৩	৯,৯১,৯৯,০০০
	মোট–	১৬,৩২,৫৯৬	৯৬,৮২,৮৮,০০০

বিশ্বের ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলোর আয়তন ও লোকসংখ্যা (১৯৮৬)

ক্রঃ নং	দেশের নাম	আয়তন (বর্গমাইল)		লোকসংখ্যা
১	ভ্যাটিকান সিটি	১০৮·৭	একর	১,০০০
২	মোনাকো	০·৬	বর্গমাইল	২৮,০০০
৩	নরু	৮	,,	৮,০০০
৪	সান মেরিনো	২৪	,,	২,২৩,০০০
৫	লিচেন স্টেইন	৬২	,,	২৭,০০০
৬	সেন্ট ক্রিস্টোফার এন্ড নেবিস	৯০১	,,	৪৭,০০০
৭	মালদ্বীপ	১১৫	,,	১,৮২,০০০
৮	মাল্টা	১২২	,,	৩,৫৫,০০০
৯	সেন্ট ভিনসেন্ট এন্ড গ্রিনা ডাইস	১৫০	,,	১,০২,০০০
১০	বারবাডোস	১৬৬	,,	২,৫২,০০০
১১	এন্টিগ এন্ড বারবুগা	১৭১	,,	৮০,০০০
১২	এ্যালডোরা	১৮৮	,,	৪৩,০০০
১৩	সিঙ্গাপুর	২২৪	,,	২৫,৫৬,০০০
১৪	সেন্ট লুসিয়া	২৩৮	,,	১,২২,০০০

ভারত–বিভাগ রংগমঞ্চের গ্রীনরুমে

www.nagorikpathagar.org

১৫	বাহরাইন	২৫৮	,,	৪,৩১,০০০
১৬	কিরবাতি	২৬৬	,,	৬১,০০০
১৭	সোডিটোনি এন্ড প্রিনসিপি	৩৭২	,,	১,০৫,০০০
১৮	মরিসাস	৭৯০	,,	১০,২৪,৯০০
১৯	কমরোস	৮৩৮	,,	৪,৬৯,০০০
২০	লুক্সেমবার্গ	৯৯৮	,,	৩,৬৬,০০০
২১	পশ্চিম স্যামোয়া	১,১৩৩	,,	১,৬০,০০০
২২	কেপ ভার্দি	১,৭৫০	,,	৩,১২,০০০
২৩	ব্রুনেই	২,২২৬	,,	২,৩২,০০০
২৪	লেবানন	৪,০১৫	,,	২৬,১৯,০০০
২৫	কাতার	৪,২৪৭	,,	৩,০১,০০০
২৬	গাম্বিয়া	৪,৩৬১	,,	৭,৫১,০০০
২৭	বাহাম	৫,৩৮০	,,	২·৩০,০০০
২৮	সোয়াজিল্যান্ড	৬,৭০৪	,,	৬,৬৬,০০০
২৯	কুয়েত	৬,৮৮০	,,	১৭,১০,০০০
৩০	ফিজি	৭,০৫৬	,,	৭,০০,০০০
৩১	ইসরাইল	২৬৬	,,	৪১,২৮,০০০
৩২	জিবুতি	৮,৪৯৪	,,	২,৯৭,০০০
৩৩	বেলীজ	৮,৮৬৭	,,	১,৬৬,৪০০
৩৪	রুয়ান্ডা	১০,১৬৯	,,	৬১,১৫,০০০
৩৫	সলোমন দ্বীপপুঞ্জ	১০,৬৪০	,,	২,৬৭,০০০
৩৬	হাইতি	১০,৭১৪	,,	৫৭,৬২,০০০
৩৭	রুনডি	১০,৭৫৯	,,	৪৬,৭৩,০০০
৩৮	ইকুয়েটোরিয়াল	১০,৮৩২	,,	৩,৫০,০০০
৩৯	আলবেনিয়া	১১,০০০	,,	৩০,৪৬,০০০
৪০	বেলজিয়াম	১১,৭৭৯	,,	৯৮,৫৮,০০০
৪১	গিনি বিসাউ	১৩,৯৪৮	,,	৮,৫৮,০০০
৪২	নেদারল্যান্ড	১৫,৭৭০	,,	১,৪৪,৮১,০০০
৪৩	সুইজারল্যান্ড	১৫,৯৪০	,,	৬৪,৫৭,০০০
		মোট= ১,৮৮,৫৮০৬ বর্গমাইল		৭,০৩,৬৪,০০
		১০৮৭ একর		

www.nagorikpathagar.org

ভাইসরয় লর্ড ওয়াভেল, (ডানে) ভাইসরয় লর্ড মাউন্টব্যাটেন(মধ্যে) লেডী ওয়াভেল (মধ্যে) ও লেডী মাউন্টব্যাটেন (বামে)

www.nagorikpathagar.org

বিভাগ রংগমঞ্চের গ্রীনরুমে

www.nagorikpathagar.org

এক বর্ণভুক্ত এক খৃষ্টধর্মের অনুসারী ইউরোপে গোত্র-কুল, ভাষা, সংস্কৃতি ও রাজনৈতিক মতাদর্শ-এই ৪টি উপাদানগত বিভিন্নতার দরুন ২৮টি স্বাধীন রাষ্ট্র কায়েম থাকতে পারলে গোত্র-কুল, বর্ণ, ভাষা, কৃষ্টি-সংস্কৃতি, ধর্ম ও রাজনৈতিক মতাদর্শ এই ৬টি উপাদানগত বিভিন্নতা সম্বলিত শতধা বিভক্ত বিচিত্র দক্ষিণ এশীয় উপমহাদেশে ৩৮টি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হলেও তা কোন বিচারে অসমীচীন হতো না। কিন্তু তা হলে বৌদ্ধ, শিখ, মুসলিম, উপজাতীয়, অন্যান্য তপশিলী প্রভৃতি জাতি ও সাম্প্রদায়গুলোকে বর্ণ হিন্দুদের পদতলে পেষণ করা সম্ভব হতো না। এ কারণেই স্বকল্পিত অখন্ড ভারতের আবেষ্টনীতে সমগ্র উপমহাদেশকে আবদ্ধ করে "এক দেশ, এক জাতি, এক রাষ্ট্র" কায়েমের মধ্য দিয়ে কংগ্রেস নেতারা চেয়েছিলেন ৬টি প্রদেশের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা দিয়ে অবাধ গণতান্ত্রিক পন্থায় উপমহাদেশের অ-বর্ণহিন্দু মানবকুলকে ধীরে ধীরে নির্যাতন-নিগ্রহের ধারায় নিশ্চিহ্ন করতে। আর বৃটিশ সরকার সব কিছু বুঝেও এ মানবতা-বিরোধী কর্মসূচীতে সর্বাত্মক সমর্থন দিয়েছিলেন।

।।৩।।

সব কিছু জেনেও বৃটিশ নেতৃবৃন্দ ও তাদের প্রতিনিধি ভাইসরয় মাউন্টব্যাটেন কেবিনেট মিশন প্রস্তাবের দুর্বল কেন্দ্র, শক্তিশালী প্রদেশ ও গ্রুপ সরকারের কেন্দ্র ত্যাগের অধিকার, গ্রুপগুলোর নিজ নিজ সংবিধান রচনার ক্ষমতা ইত্যাদি মূল ধারাগুলো বদল করে দুর্বল প্রদেশ ও শক্তিশালী কেন্দ্র সম্বলিত এককেন্দ্রিক অখন্ড ভারতের এক জাতীয় সরকার মুসলমানদের দ্বারা মানিয়ে নেবার জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করলেন; এবং তাতে সফল না হয়ে মিঃ জিন্নাকে 'মর্মঘাতী আঘাত' দিয়ে 'ছেঁড়া কাটা পোকায়-খাওয়া' পাকিস্তান চাপিয়ে দিলেন কেন? ভাইসরয় ভবনে অনুষ্ঠিত গভর্ণর সম্মেলনে মাউন্টব্যাটেন বললেন, "ভারতীয় জনমত, বরং বৃটিশ সিদ্ধান্ত অনুযায়ীই ভারত বিভক্ত হচ্ছে"; তিনি নিজে "অখন্ড ভারতে বিশ্বাসী", তাঁর ধারণায়, "ভবিষ্যতের পাকিস্তান, প্রকৃতিগতভাবেই হবে ক্ষণস্থায়ী"-"আপন আভ্যন্তরিক গলদের দরুন তাকে ধ্বংস হবার সুযোগ দিতে হবে-পরিণতিতে মুসলমানরা যাতে অখন্ড ভারতের পথে ফিরে আসে।" [ফ্রিডম এ্যাট মিডনাইট, পৃঃ ১১৪]। বাংলা প্রদেশের গভর্ণরের অভিমত উপেক্ষা করে [পূর্বোক্ত, পৃঃ ৩০], বাংলার প্রধানমন্ত্রী জনাব হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, বাংলা প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সভাপতি মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ, সাধারণ সম্পাদক জনাব আবুল হাশিম এবং বংগীয় প্রাদেশিক কংগ্রেসের সভাপতি শ্রী শরৎ চন্দ্র বসু ও সাধারণ সম্পাদক শ্রী কিরণ শংকর রায়ের পেছনে ঐক্যবদ্ধ বাংলার হিন্দু-মুসলমানের মিলিত দাবী প্রত্যাখ্যান করে নেহেরু, গান্ধী, প্যাটেল, ভি.পি. মেনন ও কৃষ্ণ মেননের সাথে শলা-পরামর্শ করে বাংলাকে তিনি বিভক্ত করলেন। এমনকি,বাংলাকে খন্ডিত না করে-পাকিস্তানের বাইরে রেখে

www.nagorikpathagar.org

সার্বভৌম বাংলা রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার দাবীর পক্ষে মিঃ জিন্নাহর দ্বিধাহীন সমর্থন দেখেও শুধুমাত্র কংগ্রেসের ভেটোর ভয়ে ভাইসরয় তা নাকচ করে দিলেন! [ভাইসরয়ের ৭ মে তারিখের স্টাফ মিটিং–এর কার্যবিবরণী এবং ফ্রিডম এ্যাট মিডনাইট, পৃঃ ৭১]।

সর্বোপরি বাংলা বিভাগের বেলায় কলিকাতা মহানগরী পাকিস্তান না হিন্দুস্থানের অন্তর্ভুক্ত হবে, সে প্রশ্নে গণভোট গ্রহণের জন্য বাংলার নেতৃবৃন্দ ও মিঃ জিন্নাহর দাবীকে এই যুক্তিতে বাতিল করে দেয়া হলো যে, কলিকাতা ও পার্শ্ববর্তী এলাকার অধিবাসীদের এক–চতুর্থাংশ মুসলমান হলেও বর্ণহিন্দু সম্প্রদায়ও এক–চতুর্থাংশ; অবশিষ্ট অর্ধেক তপশিলী সম্প্রদায়। তারা পাকিস্তানের পক্ষেই ভোট দেবে–তার ফলে নেহেরু ও কংগ্রেস পার্টি অসন্তুষ্ট হবেন (!) এবং অমৃতসরেও গণভোট গ্রহণের দাবী উঠবে; অনুরূপ পরিস্থিতি সৃষ্টি বাঞ্ছনীয় নয়। [ভাইসরয়ের ২৫ এপ্রিল তারিখের এবং ১ জুন তারিখের স্টাফ মিটিং–এর কার্যবিবরণী; ভাইসরয়ের ৫ জুন তারিখে ভারতসচিবকে লেখা রিপোর্ট]।

উপমহাদেশের মুসলিম সংখ্যাগুরু এলাকাগুলোকে নিয়ে একাধিক স্বাধীন আবাসভূমি (Homelands) গঠনের 'খায়েশ মিটিয়ে দেয়া'র প্রতিশোধমূলক পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করে তুষ্টতৃপ্ত ভাইসরয় মন্তব্য করলেন, "যেভাবে পাকিস্তান দেয়া হলো তাতে 'সিকি শতাব্দীর মধ্যে পূর্ব বঙ্গ আদালা হয়ে যাবে" [ফ্রীডম এ্যাট মিডনাইট, পৃঃ ১২৭], "পূর্ব পাকিস্তান পাকিস্তানের উপর বিব্রতকর বোঝা হয়ে দাঁড়াবে" আর উল্লসিত নেহেরু নিশ্চিত ভবিষ্যদ্বাণী করলেন, "কিছু আগেই হোক বা পরেই হোক, পূর্ব পাকিস্তানকে ভারতভুক্ত হতেই হবে।" [ভাইসরয়ের ৩১ মে তারিখের স্টাফ মিটিং–এর কার্যবিবরণী] কিন্তু প্রশ্ন হলো, এত দরদ কেন? ১৯৭৬ সালে প্রদত্ত সাক্ষাতকারেও মাউন্টব্যাটেন নিজেই বলেছেন, "ভারত যে একটি দেশ নয় এটা উপলব্ধির পূর্বে আপনারা ভারতের সমস্যা বুঝতে পারবেন না। এশিয়া মহাদেশের সাথে যুক্ত বলেই একে উপমহাদেশ বলা হয়, অথচ, আসলে এটা একটি মহাদেশ।" [মাউন্টব্যাটেন এন্ড দি পার্টিশন অব ইন্ডিয়া, পৃঃ ৪২]। ১৯৪৭ সালে সেই পূর্ণাঙ্গ মহাদেশকে একটি দেশ বানাবার জন্যে তিনি ব্যাগ্র ছিলেন কেন?

এর জবাব পেতে হলে সমসাময়িক বিশ্ব পরিস্থিতিতে বৃটিশ কূটনীতির লক্ষ্য ও চরিত্র পর্যালোচনা প্রয়োজন।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে পরাজিত জার্মানী, ইতালী ও জাপান যেমন ধ্বংস হয়েছিল, বিজয়ী বৃটেন ও ফ্রান্সসহ অন্যান্য ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলোও তেমনি শ্রান্ত–ক্লান্ত সর্বস্বান্ত হয়ে পড়েছিল। যুদ্ধবিধ্বস্ত ইউরোপের অবস্থা তখন দারুণ সঙ্গীন। বৃটেন ও ফ্রান্স ইউরোপীয় রণাঙ্গনে সর্বগ্রাসী জার্মান বাহিনীর হাতে মার খেয়ে আফ্রিকায় আশ্রয় নেয় এবং সাম্রাজ্যভুক্ত আফ্রো–এশীয় দেশগুলোর সৈন্যদের সাহায্যে যুদ্ধের গতি

www.nagorikpathagar.org

ফিরাতে সক্ষম হয়। লিবিয়ার এল–আমীন প্রান্তরে ইতিহাসের সর্ববৃহৎ ট্যাংকযুদ্ধে দক্ষিণ এশীয় উপমহাদেশের পাঠান এবং নাইজেরিয়ার নিগ্রো মুসলিম সৈনিকেরাই নাৎসী বাহিনীকে প্রথম পরাজিত করে। অধীন জাতিগুলোকে মিত্রশক্তি যুদ্ধ জয়ের পর আজাদী প্রদানের ওয়াদা করে। যুদ্ধ শেষে ১৯৪৬ সালেই আফ্রো–এশীয় জাতিগুলো স্বাধীনতার দাবীতে আন্দোলন ও বিদ্রোহ শুরু করে দেয়। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা তখন বৃটেন, ফ্রান্স, স্পেন, পর্তুগাল, নেদারল্যান্ড কারুরই ছিল না। বৃটেনের যুবশক্তি সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে গেছে। আর্থিক দুর্দশা এমনি স্তরে নেমেছে যে, মাউন্টব্যাটেনের স্ত্রী বৃটেনের প্রাক্তন মন্ত্রীর কন্যা লেডী মাউন্টব্যাটেন দিল্লী পৌঁছে প্রথম দিনে তার দু'টি কুকুরের জন্য আনা চিকেন রোস্ট খানসামাদের হাত থেকে প্রায় কেড়ে নিয়ে বাথরুমে দাঁড়িয়ে নিজেই খেয়ে ফেলেন এবং এরূপ একটি চিকেন রোস্টও গত ছয় মাসে তিনি দেখেননি বলে জানান। [ফ্রিডম এ্যাট মিডনাইট]। কিন্তু তাদের সামরিক অর্থনৈতিক মেরুদন্ড ভেঙ্গে গেলেও কয়েকটি মৌলিক মূলধন তখনো অবশিষ্ট ছিল। তা হলো, তাদের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিদ্যা এবং নিখাঁদ দেশপ্রেম ও জাতীয়তাবোধ। তাকেই পুঁজি করে, বিধ্বস্ত বর্তমান বাস্তবাতাকে মেনে নিয়ে তারা তখন নিজ নিজ ভবিষ্যত প্রণয়ন করে এবং দৈশিক সাম্রাজ্যকে অর্থনৈতিক প্রভাব বলয়ে রূপান্তরিত করার সিদ্ধান্ত নেয়। বৃটেনও এই নয়া কর্মসূচী মোতাবেক অধীন জাতিগুলোকে আজাদী দান করে বৃটিশ কমনওয়েলথের আবেষ্টনীতে বেঁধে রাখার সক্রিয় চিন্তাভাবনা শুরু করে।

কিন্তু একটি বিষয় সাম্রাজ্যবাদী খৃষ্টান জগতকে বিশেষভাবে ভাবিয়ে তোলে। তারা দেখতে পায় আটলান্টিক উপকূলের মরক্কো–মৌরিতানিয়া থেকে শুরু করে পূর্ব ইন্দোনেশিয়ার সেলিবিস–সোয়েরাবায়া হয়ে সুলু দ্বীপপুঞ্জ, ফিলিপাইনের মিন্দানাও অবধি উদীয়মান কয়েক কুড়ি রাষ্ট্রের মধ্যে মুষ্টিমেয় কয়েকটি বাদ দিলে সবগুলোই হবে মুসলিম রাষ্ট্র (ইতিমধ্যে এ অঞ্চলে ৪২টি স্বাধীন মুসলিম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে)। পৃথিবীর অনাহরিত প্রাকৃতিক সম্পদ– তেল, স্বর্ণ, হিরক, ইউরেনিয়াম, তাম্র, লৌহ, বক্সাইট, ফসফেট ইত্যাদিসহ যাবতীয় খনিজ এবং সকল প্রকার বনজ কৃষিজ সম্পদ সম্ভাবনায় পূর্ণ এই ভূ–ভাগের নিয়ন্ত্রণ চলে যাচ্ছে মুসলমানদের হাতে। দক্ষিণ এশীয় উপ–মহাদেশের স্বাধীনতাদানের প্রশ্নটিও এই প্রেক্ষিতে তাদেরকে নতুনভাবে ভাবতে উদ্বুদ্ধ করে। বৃটিশ সরকার দেখলেন, ভারতীয় হিন্দু সমাজ সারা বিশ্বে এক বিচ্ছিন্ন দ্বীপ। স্বাধীন হিন্দু ভারতের সাথে ইউরোপের কোন বিরোধ অবশিষ্ট রইবে না। কিন্তু নবজাগ্রত মুসলিম জাহান হবে ইউরোপের সীমান্তের শত্রু। ৬৩৪ খৃষ্টাব্দের ৩০ আগষ্ট ইয়ারমুক প্রান্তরে তাদের সাথে যে সংঘর্ষ শুরু হয়, ভূমধ্যসাগর তীরে ১০৯৮, ১১২৮, ১১৪৪, ১১৮৭, ১২৫০ সালে এবং পূর্ব ইউরোপে ১৩৬৯, ১৩৭১, ১৩৮৯, ১৩৯৬, ১৪৪৬ ও ১৪৪৮ সালে মোট ১১টি ক্রুশেড যুদ্ধে সম্মিলিত ইউরোপের পরাজয়ের

www.nagorikpathagar.org

ভেতর দিয়ে একবার তা সমাপ্ত হলেও আঠারো উনিশ শতকে নতুনভাবে বিস্তার লাভ করে। মুসলিম জাহানের স্বাধীন রাষ্ট্রগুলোর সাথে সে–বিরোধের ধারা অব্যাহত থাকবে। পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যবাদীরা মিলে যৌথ উদ্যোগে এ আসন্ন বিপদের মোকাবিলায় অদৃশ্য মোর্চা গঠন করলেন। আফ্রো–এশীয় দেশগুলোতে পূর্ণ দখল কায়েমের বেলায় ইউরোপীয় শক্তিগুলো ১৮৭৯, ১৮৮৪, ১৮৮৫, ১৮৮৯, ১৮৯০, ১৮৯৩, ১৮৯৮ ও ১৯০৪ সালে নিজেদের মধ্যে আপোষ–বন্টন–চুক্তি সম্পাদন করেছিলেন। এবারে উদীয়মান মুসলিম রাষ্ট্রগুলোর প্রশ্নেও 'কমন কূটনীতি'র এক অলিখিত চুক্তি সম্পাদন করলেন। এ কূটনীতির মূল কথা হলো, ভাবী মুসলিম দেশগুলোকে সাবোতাজ করা, যে দেশে যেভাবে সম্ভব মুসলমানদের উপর অমুসলিমদের প্রাধান্য চাপিয়ে দেয়া এবং অমুসলিম সম্প্রদায়গুলোর সাথে মুসলিমদের সংঘাত বাধিয়ে দেয়া। ত্বরিৎ অথচ দীর্ঘস্থায়ী বিহিত করলেন তারা মুসলিম জাহানের বুকের উপর এমন এক মারাত্মক বিষফোঁড়া সৃষ্টি করে দিয়ে যাতে সামান্য নড়াচড়া করলেই সারা দেহে অসহ্য যন্ত্রণা অনুভূত হয়। সমগ্র ইউরোপ আমেরিকা থেকে ভাসমান ইহুদীদেরকে কুড়িয়ে এনে কল্পিত দাবী খাড়া করে বৃটিশ প্রস্তাবে, মার্কিন সমর্থনে ও সোভিয়েত স্বীকৃতি ব্যাঞ্জক নেতৃত্বে তাঁরা প্রতিষ্ঠা করলেন ইসরায়েল রাষ্ট্র। মুসলিম ফিলিস্তিনীদেরকে জবরদস্তি ঘরছাড়া করে বানালেন স্থায়ী মোহাজের। ইসরায়েল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় সারা মুসলিম জাহানে তখন প্রতিবাদের ঝড় উঠলো। এর আগে ১৯১৯–২০ সালে পাশ্চাত্য শক্তিপুঞ্জের তুর্কী সাম্রাজ্য গ্রাসের প্রতিবাদে মুসলিম জাহানে ঐক্যের নমুনা তারা দেখেছিলেন বৃটিশ ভারতব্যাপী উত্তাল খিলাফত আন্দোলনের মধ্যে। এ পরিস্থিতিতে মুসলিম জাহানের ঐক্যে বৃটিশ নেতৃত্ব স্বাভাবিকভাবেই শংকিত হলো। শ্বেতসাম্রাজ্যবাদীদের নীতিরই অভিন্ন অংশ হিসাবে আফ্রো–এশিয়ার সর্বত্রই তারাও প্রতিটি দেশে মুসলিমদের উপর অমুসলিমদের প্রাধান্য দিতে শুরু করলেন। এরই পরিণতিতে পরে মুসলিম দেশ তাঞ্জানিয়া, মালাবি ও সিয়েরালিওনে রাষ্ট্রপ্রধান হলেন খৃষ্টান, নাইজেরিয়া ও মালাবিতে প্রশাসনিক প্রাধান্য পেলো উপজাতীয় খৃষ্টান ধর্মানুসারীরা; শেষোক্ত দু'টি দেশ ও সাদ প্রজাতন্ত্রে দুই দশক ধরে চললো গৃহযুদ্ধ। বার্মায় দীর্ঘ ঐতিহ্যবাহী আরাকান রোহিংগা মুসলিমদেরকে নামিয়ে দেয়া হলো বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের পদতলে এবং ফিলিপাইনে অস্বীকৃত হলো মরো মুসলিমদের স্বাধিকারের প্রশ্ন।

এই নীতি বাস্তবায়নের তাগিদেই মুসলিম জাহানের বিশাল ভূভাগের মধ্যে ইসরায়েলের সহযোগী ও মুসলিম স্বার্থের স্থায়ী বিরোধী একটি শক্তিশালী রাষ্ট্রের প্রয়োজনীয়তাও উপলব্ধি করলেন তারা। আর সে উপলব্ধি থেকেই তারা দক্ষিণ এশীয় উপমহাদেশের পরিস্থিতি পুনর্মূল্যায়ন করতে শুরু করলেন। আবার এদিকে তাকিয়ে তারা দেখতে পেলেন, তাদেরই প্রস্তাবিত কেবিনেট মিশন প্রস্তাব বাস্তবায়নের

www.nagorikpathagar.org

পরিণতিতে বাংলা–আসাম নিয়ে এবং পাঞ্জাব–সিন্ধু–বেলুচিস্তান–সীমান্ত প্রদেশ নিয়ে যদি দু'টি স্বাধীন মুসলিম রাষ্ট্রের উদ্ভব ঘটে, তবে কালে দু'টি রাষ্ট্রেরই অত্যন্ত শক্তিশালী হবার সম্ভবনা আছে। এমনকি, যদি স্বাধীন বাংলা, স্বাধীন পাঞ্জাব ও পাকিস্তান–এই তিনটি মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ স্বাধীন রাষ্ট্র কায়েম হয়, জাতিসংঘের প্রথম সারিতে পাশাপাশি আসনে তারা ঠাঁই করে নেবে এবং অন্যান্য মুসলিম দেশগুলোর নেতৃত্ব দেবে। বাংলা–আসাম এক রাষ্ট্র হলে তৎকালীন পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম মহানগরী কলকাতাসহ ভাগিরথী তীরের ৮৫টি জুট মিল, অন্যান্য কলকারখানা, বর্ধমান বিভাগের রানীগঞ্জের লৌহখনি, বরাকর ও আসানসোলের কয়লা খনি, আসামের ডিগবয়–ডিব্রুগড় তেলের খনি, বিশাল বিস্তৃত চা বাগান ও বিপুল বনজ-সম্পদ এবং পূর্ব বাংলার পাট, চা, চামড়া–সবকিছু মিলিয়ে নিয়ে বাংলা–আসাম হবে বিশ্বের অন্যতম সম্পদশালী রাষ্ট্র। মুসলমানদেরকে এমন একটি রাষ্ট্রের অধিকারী করা যায়না।

এরূপ চিন্তার জালে জড়িয়ে বৃটিশ মানস যখন বিব্রত, দক্ষিণ এশীয় উপমহাদেশে হিন্দু মুসলিম বিরোধ তখন তুংগে। কোলকাতা, বিহার, পাঞ্জাব, বোম্বাইসহ নানা স্থানে দাংগার আগুন দাউ দাউ করে জ্বলছে। ভাইসরয় লর্ড ওয়াভেল আপ্রাণ চেষ্টা করেও দশ কোটি মুসলমানের জন্য উপমহাদেশে স্বাধীন আবাসভূমি প্রদানে কংগ্রেসকে সম্মত করাতে পেরে উঠছেন না; শেষতক তিনি সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে, "মূল কেবিনেট মিশন প্রস্তাব" গৃহীত না হলে উপমহাদেশে প্রদেশওয়ারী স্বাধীনতা দিয়ে দেবেন [ফ্রিডম এ্যাট মিডনাইট, পৃঃ ৭০]। সে সিদ্ধান্তে বৃটিশ সরকারের সম্মতি আদায়ের জন্যে তিনি লন্ডনে অবস্থান করছেন। [ফ্রিডম এ্যাট মিডনাইট পৃঃ ৮০] ঠিক এই সময়েই ১৯৪৬ সালের ডিসেম্বর মাসে ভারত বিভাগের 'প্যাটেল–ভিপি মেনন প্রস্তাব' সাথে নিয়ে বৃটিশ অর্থমন্ত্রী স্যার স্টাফোর্ড ক্রীপস–এর সাথে এক গোপন বৈঠকে মিলিত হলেন মিঃ কৃষ্ণ মেননের নেতৃত্বে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিনিধি দল [মৃত্যুর পূর্বে ১৯৭৩ সালে কৃষ্ণ মেননের স্বীকারোক্তি, ফ্রিডম এ্যাট মিডনাইট, পৃঃ ৮]। তারা বৃটিশ সরকারকে আশ্বস্ত করলেন যে, স্বাধীন ভারত কমনওয়েলথের অন্তর্ভুক্ত থাকবে এবং ইসরাইলকে অব্যাহত সমর্থন দিয়ে যাবে। দু'টি প্রতিশ্রুতিই ভারত বিশ্বস্ততার সাথে রক্ষা করে চলেছে।

উপরোক্ত গোপন বৈঠকেই কৃষ্ণ মেননরা লর্ড মাউন্টব্যাটেনকে লর্ড ওয়াভেলের স্থলে ভারতে ভাইসরয় নিয়োগের অনুরোধ জানান। তারা এটলী সরকারকে প্রস্তাব দেন, হয় অবাধ গণতান্ত্রিক শক্তিশালী কেন্দ্রীয় পার্লামেন্ট সম্বলিত গ্রুপ সরকার গঠন করে ভারতে দু'টি মুসলিম রাষ্ট্র গঠনের সম্ভাবনা নস্যাৎ করতে, আর তা সম্ভব না হলে প্যাটেল–মেনন পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করে এমন ক্ষণস্থায়ী পাকিস্তান প্রদান করতে, যা ধ্বংস হবার পর উপমহাদেশের মুসলমানরা স্বাধীন রাষ্ট্রের স্বপ্ন ভুলে যেতে

www.nagorikpathagar.org

সূত্রঃ মেমোয়ারস - হবিবুর রহমান চৌধুরী

www.nagorikpathagar.org

বাধ্য হয়। অতঃপর বৃটিশ নেতৃবৃন্দের সাথে গোপনে কংগ্রেস ডেপুটেশনের আরো আলোচনা অনুষ্ঠিত হবার পর এক গোপন বৈঠকে লর্ড ওয়াভেলকে সরিয়ে লর্ড মাউন্টব্যাটেনকে ভাইসরয় নিয়োগের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। [ফ্রিডম এ্যাট মিডনাইট, পৃঃ ৮]। লর্ড ওয়াভেল তখন লন্ডন উপস্থিত থাকা সত্ত্বেও তাঁকে ঘুণাক্ষরেও কিছু জানতে দেয়া হয়নি। [ঐ, পৃঃ ৬৯]। প্রধানমন্ত্রী বেতার মারফত তাঁর চাকরি খতমের ঘোষণা প্রচারের কয়েক ঘন্টা আগে তিনি বিষয়টি অবহিত হন [ফ্রিডম এ্যাট মিডনাইট পৃঃ ৬৯] । এবং তার অল্প পরেই প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশ নিয়ে পত্রবাহক তাঁর কাছে হাজির হন। আর মজার ব্যাপার, তার একদিন আগেই ২২শে মার্চ, ১৯৪৭ দিল্লী অবতরণ করেন নতুন ভাইসরয় লর্ড মাউন্ডব্যাটেন [দি গ্রেট ডিভাইড, এইচ, ভি, হডসন] । লর্ড ওয়াভেল চল্লিশ মাসেও যে সমস্যা সমাধানে অপারগ ছিলেন, সুস্পষ্ট নির্দেশ ও রেডিমেড ফর্মূলা পকেটে নিয়ে এসে হ্যারো স্কুলের ছাত্র বন্ধু নেহেরুর সহচর মাউন্টব্যাটেন কৃষ্ণমেনন, ভি· ভি· প্যাটেল, ভিপি মেননের পরামর্শ ও সক্রিয় সহযোগিতায় মিঃ গান্ধীর মৌন সমর্থন লাভ করে মাত্র ৪০ দিনের মধ্যেই তা সম্পন্ন করার ব্যবস্থা সেরে ফেলেন। ২ মে ১৯৪৭, চীফ অব স্টাফ লর্ড ইসমের মারফত তিনি বৃটিশ কেবিনেটের কাছে তাঁর সরকারী প্লান প্রেরণ করেন। সিমলার লাট ভবনে তাঁর দিন-রাত্রির সঙ্গী অতিথি মিঃ নেহেরু প্লানের কতিপয় প্রশ্নে আপত্তি করায় ভি· পি· নেমনের একার হাতে ১৭ মে তারিখে তা সংশোধন করিয়ে নেহেরুর শুভেচ্ছা ও ভি· পি· মেননকে সঙ্গে নিয়ে পরবর্তী সপ্তায় ভাইসরয় নিজেই লন্ডন হাজির হন এবং বৃটিশ সরকারের কাছ থেকে তা পাস করিয়ে নেন [মাউন্টব্যাটেন এন্ড পার্টিশন অব ইন্ডিয়া, পৃঃ ৫৯]। পাস করা প্লান হাতে নিয়েই ভাইসরয় মিঃ জিন্নাহর সাথে আলোচনায় বসেন তাঁকে সম্মত করতে। ভাইসরয় তাঁকে পরিষ্কার জানিয়ে দেন যে, প্লানটি হয় গ্রহন, না হয় বর্জন করতে হবে-এতে কোনরূপ সংশোধনের প্রস্তাব রাখা চলবে না। মিঃ জিন্নাহ যদি সম্মত না হন অন্তবর্তীকালীন সরকারের প্রধানমন্ত্রী মিঃ নেহেরুর কাছেই একতরফাভাবে ভারতের সার্বভৌম শাসনক্ষমতা হস্তান্তর করে দেয়া হবে। মূলতঃ প্যাটেল-মেনন পরিকল্পনা নেহেরু-মাউন্ট ব্যাটেনের হাতে পরিমার্জিত হয়ে বৃটিশ ক্যাবিনেটে পাস হয়ে আসায় কংগ্রেস নেতারা তাতে সানন্দে সম্মতি জানান। মিঃ জিন্নাহ জানান যে, মুসলিম লীগ ওয়ার্কিং কমিটিই কেবল এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণে সক্ষম। লীগ গঠনতন্ত্র অনুযায়ী তাঁর এরূপ কোন এখতিয়ার নেই। অতঃপর প্লান মোতাবেক হস্তান্তরের চূড়ান্ত ঘোষণা প্রকাশের দিন ধার্য হয় ৩রা জুন তারিখে। ২রা জুন দিবাগত মধ্যরাত্রিতে মিঃ জিন্নাহকে ভাইসরয় ভবনের স্ট্যাডি রুমে হাজির করা হয়। প্লানটি মেনে নেয়ার ব্যাপারে ভাইসরয় তাঁর অভিমত জানতে চান এবং সেই মুহূর্তেই তাঁর সমর্থন কামনা করেন। "মিঃ জিন্নাহ হিম-শীতল কণ্ঠে আগের মতোই বলেন, "না, না, -সবকিছুই একটি আইনসম্মত পন্থায় হওয়া উচিত। আমি একাই মুসলিম

www.nagorikpathagar.org

লীগ নই।" জওয়াবে মাউন্টব্যাটেনও হতাশাক্ষিপ্ত দৃঢ় কঠিন কণ্ঠে বললেন, "শুনুন মিঃ জিন্নাহ, আমাকে আপনি ওকথা বলবেন না। দুনিয়ায় আর সবার কাছে ওকথা বলতে বা চালিয়ে দেবার চেষ্টা করতে পারেন, কিন্তু আমার কাছে নয়। দয়া করে এটা ভাববেন না যে, মুসলিম লীগে কার গুরুত্ব কতটুকু, কে কি করতে পারেন তা আমি জানি না।" "না" প্রস্তরদৃঢ়কণ্ঠে জিন্নাহ আবারো বললেন, "সবকিছুই একটি বিধিসম্মত পন্থায় হওয়া উচিত।"

'মিঃ জিন্নাহ', মাউন্ট ব্যাটেন বললেন, 'আগামীকাল সকালের সভায় আমি বলবো, জাতীয় কংগ্রেস কয়েকটি শর্তসাপেক্ষে–সেগুলো আমি পূরণ করতে পারবো–প্লান মেনে নিয়েছে। তাদের জওয়াব আমি পেয়েছি। শিখরাও মেনে নিয়েছে।' 'তারপর আমি বলবো, গতরাতে মিঃ জিন্নাহর সাথে আমার খুবই দীর্ঘ এবং হৃদ্যতাপূর্ণ আলোচনা হয়েছে; প্লানের খুটিনাটি সব দিক আমরা খতিয়ে দেখেছি এবং মিঃ জিন্নাহ আমাকে তাঁর ব্যক্তিগত আশ্বাস দিয়েছেন যে, প্লানের সাথে তিনি একমত আছেন। সেই মুহূর্তে মিঃ জিন্নাহ", মাউন্টব্যাটেন বলে চললেন, 'আপনাকে আমি কথা বলতে বলছি না, কংগ্রেসের সামনে আপনাকে আমি খোলাখুলি নাজেহাল দেখতে চাই না। আমি চাই আপনি শুধু একটি কাজ করবেন। আমি চাই, আমার সাথে যে আপনি একমত আছেন তা দেখাবার জন্য মাথাটা একটু কাৎ করবেন।'

"আপনি যদি মাথা কাৎ না করেন, মিঃ জিন্নাহ" মাউন্টব্যাটেন সতর্কবাণী উচ্চারণ করলন, 'তাহলে আপনি বিদায়, আপনার জন্য আমার আর কিছুই করার থাকবে না। সব কিছুই ধ্বসে পড়বে। এটা হুমকি নয়। এটা আমার ভবিষ্যদ্বাণী। সেই মুহূর্তে আপনার মাথা যদি কাৎ না করেন, এখানে আমার প্রয়োজন ফুরিয়ে যাবে। আপনি আর পাকিস্তান পাবেন না। আমার কথা হবে, আপনি জাহান্নামে যান" (ফ্রিডম এ্যাট মিডনাইট, পৃঃ ১৬০)। মাউন্ট ব্যাটেন আরো বললেন, "মিঃ জিন্নাহ, আমি থাকি বা না থাকি, আপনি খতম। এ প্রস্তাব অগ্রাহ্য করলে আপনার ব্যাপারে আর কেউ মাথা ঘামাবে না। আপনাকে যুদ্ধ করেই সবকিছু আদায় করে নিতে হবে। [মাউন্ট ব্যাটেন এন্ড দি পার্টিশন অব ইন্ডিয়া, পৃঃ ৪৬]।

মিঃ জিন্নাহর অবশিষ্ট রাত্রিটুকু সেই বিশাল ভাইসরয় ভবনের স্টাডিরুমে অন্তরীণ একাকিত্বে কেটেছিল না অন্য কোন ভাবে অতিবাহিত হয়েছিল–কোথাও তার কোন প্রমাণ নেই। তবে, তাঁর দৃষ্টিতে যে ভয়াবহ চিত্র ফুটে উঠা স্বাভাবিক ছিল তা সহজেই অনুমেয়। একদিকে কুটিল হিংস্র ব্রাহ্মণ্যবাদী নেতৃত্বে সারিবদ্ধ লক্ষ লক্ষ কংগ্রেস কর্মীর পেছনে জমায়েত সারা উপমহাদেশের বর্ণহিন্দু সম্প্রদায়; সারা উপমহাদেশের কোটি কোটি বর্ণহিন্দুর সমর্থন, লক্ষ লক্ষ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কর্মীর যুদ্ধংদেহী মনোভাব ও টাটা-বিড়লা কোটিপতিদের বিত্তে বলীয়ান, বিশ্বব্যাপী শক্তিশালী প্রচারমাধ্যমের মালিক

www.nagorikpathagar.org

শিক্ষিত অথচ কূটিল-হিংস্র কংগ্রেস নেতৃত্বে গৃহযুদ্ধের মহড়া আর তাদের পেছনে সমর্থন প্রদানে ব্যগ্র ভাইসরয়ের দশ লক্ষ সৈন্য নিয়ে গঠিত বিশাল সেনাবাহিনী, বিপুল বিমান বহর ও বিরাট নৌ-বহর যেগুলোর কোথাও মুসলমানদের নিয়ে গঠিত একটি ইউনিটও নেই; ৫/১০ জন অমুসলিমের পাশে এক-আধজন মুসলমান সৈনিকের অনুল্লেখ্য অস্তিত্ব। অন্যদিকে বৃটিশ-বর্ণহিন্দু চক্রান্তে দুই শতাব্দীব্যাপী শোষিত নিঃশেষিত, স্বাধিকার চেতনায় সবেমাত্র সংঘবদ্ধ দশ কোটি অশিক্ষিত-দরিদ্র মুসলমান, তাদের নেতৃত্বে রয়েছেন এমনি সব বৃটিশ-পোষ্য নবাব-নাইট খাজা-গজা-খানবাহাদুর-খান সাহেবের দল, বৃটিশ পৃষ্ঠপোষকতা প্রত্যাহৃত হবার সাথে সাথেই যাদের অনেকেই পার্শ্ব পরিবর্তন করবেন এবং তাদেরই পুরোভাগে, যক্ষ্মারোগে সম্পূর্ণ ঝাঁঝরা হয়ে যাওয়া দু'টি ফুসফুস এবং ছয় মাসের মধ্যে নিশ্চিত মৃত্যুর নোটিশ পকেটে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন তিনি। সকাল বেলার বৈঠকে তিনি যদি ভাইসরয়ের কথামতো মাথা কাৎ না করেন, সারা উপমহাদেশে জ্বলে উঠবে মুসলিম বিরোধী সর্বগ্রাসী দাংগার দাবানল,অসমশক্তির সংঘর্ষ, সেনাবাহিনীর ছত্রছায়ায় ব্রাহ্মণ্যবাদী শিবসেনারা সেখানে বিজয় পতাকা উড়াবে, কায়েম করবে রামরাজ-যেটা কামনা করে মিঃ গান্ধী গত পাঁচ বছর ধরে বৃটিশকে বলে আসছেন, "ভাগাভাগির দরকার নেই, ভারতকে তোমরা ভগবানের হাতে, যদি ইচ্ছা হয় গোলমাল ও অরাজকতার মধ্যেই ছেড়ে দিয়ে চলে যাও-স্বাধীন ভারত নিজের পথ বেছে নেবে' [ফ্রিডম এ্যাট মিডনাইট, পৃঃ ৭০, ১১৯]। মুসলমানরা আরো শিক্ষিত, সচেতন ও সংঘবদ্ধ হবার আগেই যতো দ্রুত এটা ঘটে যায়,মিঃ গান্ধীর স্বপ্ন ততই সফল ও সার্থক হয়।

আর তিনি যদি মাথা কাৎ করেন, মেনে নেয়া হবে ছেঁড়া কাটা পোকায় খাওয়া পাকিস্তান। পোকায় খাওয়া হলেও সেটা হবে নির্মূল হয়ে যাওয়ার মতো সর্বগ্রাসী ষড়যন্ত্র ও হামলার মুখে উপমহাদেশের মুসলমানদের তাৎক্ষণিকভাবে দাঁড়াবার মতো দুই টুকরা জমিন।

পরবর্তী ভোরে ৩রা জুনের বৈঠকে "মিঃ জিন্নাহ", মাউন্ট ব্যাটেনের জবানীতে, "ভাবলেশহীন রক্তশূন্য বিবর্ণ মুখে মাথা কাৎ করেছিলেন, চিবুকটিকে ঈষৎ বাঁকা করেছিলেন-আধা ইঞ্চিরও কম" [ফ্রিডম এ্যাট মিডনাইট, পৃঃ ১৬০]। সেটাই ছিল তাঁর সম্মতি।

www.nagorikpathagar.org

সলঙ্গা হত্যাকান্ড হারিয়ে যাওয়ার প্রেক্ষাপট

দক্ষিন এশীয় উপ-মহাদেশের বিংশ শতাব্দীর বৃটিশ বিরোধী আজাদী সংগ্রামে সলঙ্গা হত্যাকান্ডই নিঃসন্দেহে নিষ্ঠুরতম ও সর্ববৃহত হত্যাকান্ড। ইতিহাসে জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকান্ড সর্ববৃহত হত্যাকান্ড বলে উল্লেখিত হলেও সেটা সঠিক নয়। ১৯১৯ সালের ১৩ এপ্রিল পাঞ্জাবের জালিয়ানওয়ালাবাগের এক সচেতন রাজনৈতিক সমাবেশের উপর বৃটিশ সেনাধ্যক্ষ জেনারেল ডায়ারের নির্দেশে ইংরেজ সৈন্যরা গুলী চালালে সরকারী হিসাব মতে ৩শ' ৭৯ জন নিহত ও ১ হাজার ৫শ' জন আহত হন, যাঁদের প্রায় সবাই ছিলেন কংগ্রেস সমর্থক শিখ ও হিন্দু সম্প্রদায়ভুক্ত। বেসরকারী হিসাব মতে হতাহতের সংখ্যা ছিল ৩ হাজারের কাছাকাছি। আর ১৯২২ সালে পাবনা জেলার সলঙ্গা হাটে অসহযোগ আন্দোলনরত কর্মীদের শায়েস্তা করবার জন্য অসচেতন লক্ষাধিক হাটুরে জনতার ওপর বৃটিশ সরকারের বিশ্বস্ত কর্মচারী সিরাজগঞ্জের মহকুমা হাকিম শ্রী সুনীল কুমার সিংহরায় ও পাবনার জেলা ম্যাজিস্ট্রেট শ্রী আর, এন, দাসের নির্দেশে বিহারী হিন্দু-পুলিশ সিপাইদের গুলীতে হতাহত হন সরকারী হিসাব মতে সাড়ে চার হাজার বাঙালী সন্তান-যাঁদের প্রায় সবাই ছিলেন মুসলমান।

১৯২২ সালের জানুয়ারী মাস, ভারতীয় উপ-মহাদেশে তখন খেলাফত ও অসহযোগ আন্দোলনের উত্তাল জোয়ার। হাটে-ঘাটে, গ্রামে -গঞ্জে তখন বৃটিশ পণ্য বর্জনের আন্দোলন চলছে। পাবনা ও বগুড়া জেলার সীমান্তে চান্দাইকোনার মঙ্গলবারের হাটে বয়কট আন্দোলনে বাধা দিতে গিয়ে কয়েকজন পুলিশ জনতার হাতে প্রহৃত হয়। জনতা তাদের হাতের রাইফেল কেড়ে নিয়ে ফুলজোড় নদীতে ফেলে দেয়। তার প্রতিশোধ নেবার জন্য জেলা প্রশাসন কর্তৃপক্ষ প্রস্তুতি গ্রহণ করে। আর তার পরই ছিল সলঙ্গায় শুক্রবারের হাট। সিরাজগঞ্জ জেলার সলঙ্গা ছিল সেকালের এক বর্ধিষ্ণু ব্যবসা-কেন্দ্র। শুধু পাবনা নয়, গোটা উত্তরবঙ্গে সলঙ্গা ছিল প্রধান হাট। এই হাটে পাবনা, কুষ্টিয়া, রাজশাহী, বগুড়া, টাঙ্গাইল প্রভৃতি জেলা হতে রকমারী পণ্য, গো-মহিষাদি আনা হতো বেচাকেনার জন্য। হাটবারে সলঙ্গায় লক্ষধিক লোক সমাগম হতো। ধান, পাট ও গরু-মহিষ বেচাকেনার জন্য সলঙ্গা হাট প্রসিদ্ধ ছিল। তখন সলঙ্গায় হাট বসতো সোমবার ও শুক্রবারে। শুক্রবার ছিল বড় হাট-এদিন তুলানমূলকভাবে পণ্যাদি ও লোক সমাগম বেশী হতো। সলঙ্গা হাটের পূর্ব পাশ দিয়ে প্রবাহিত ফুলজোড় নদীর শাখা সলঙ্গা নদী। শাখা হলেও সলঙ্গা নদী সলঙ্গাহাটের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ছিলো। হাটবারে

www.nagorikpathagar.org

নদীর ঘাট দুই তিন মাইল জুড়ে বিস্তৃত হয়ে হাট বসত। নদীর তীরে এসে ভিড়তো শত শত মহাজনী ও ছিপ নৌকা। তখনও বাস-ট্রাক-লঞ্চ এদেশে আসেনি। নৌকাই ছিল পণ্য পরিবহনের প্রধান মাধ্যম এবং বিভিন্ন অঞ্চলের বিরাট বিরাট হাটগুলো ছিল বিক্রয়-কেন্দ্র। সলঙ্গা হাটের অধিকাংশ দোকানপাট, ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান ছিলো মাড়োয়ারী ও হিন্দু ব্যবসায়ীদের। এ হাটের ব্যবসা-বাণিজ্যের নিয়ন্ত্রণ ছিলো তাদেরই হাতে।

১৯২২ সালের ২৮ জানুয়ারী শুক্রবার-সলঙ্গার বড় হাটের দিন। স্থানীয় স্কুলের দশম শ্রেণীর ছাত্র আবদুর রশীদ (তখনও মওলানা হন নাই) প্রায় তিনশত স্বেচ্ছাসেবক নিয়ে সলঙ্গাহাটে কাজ করছেন। তাঁদের লক্ষ্য বিলাতী পণ্য বর্জনে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করা। স্বেচ্ছাসেবকরা অত্যন্ত উৎসাহ-উদ্দীপনা নিয়ে কাজ করছেন। এমন সময় পাবনার তৎকালীন জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রী, আর, এন, দাস, সিরাজগঞ্জ মহকুমার এস, ডি, ও শ্রী এস কে সিংহ (সুনীল কুমার সিংহ রায় আই সি এস, লর্ড বিজয় কুমার সিংহ রায়ের পুত্র) এবং পাবনা জেলার ইংরেজ পুলিশ সুপার ৪০ জন আর্মড পুলিশ নিয়ে হাটে উপস্থিত হন। আবদুর রশীদ তখন ছিলেন কংগ্রেস অফিসে। সেখান থেকে পুলিশ তাকে ধরে নিয়ে যায় হাটের দক্ষিণ প্রান্তে। পুলিশ সুপার স্বহস্তে তার ওপর দৈহিক নির্যাতন চালান। নির্যাতনে আবদুর রশীদের নাক-কান ফেটে সারা দেহ ক্ষত-বিক্ষত হয়ে রক্ত ঝরতে থাকে। অবশেষে তিনি অজ্ঞান হয়ে পড়েন। আবদুর রশীদের পিতা ছিলেন সলঙ্গা হাটের পার্শ্ববর্তী এলাকার প্রভাবশালী পীর। পীর সাহেবের পুত্রকে এ অবস্থায় দেখে মুরীদানেরা ছুটে এসেছিল তাঁকে মুক্ত করতে-সঙ্গে লক্ষাধিক হাটের জনতা। কিন্তু আবদুর রশীদসহ পুলিশ সুপার ছিলেন রাইফেলধারী পুলিশ বাহিনী দ্বারা বেষ্টিত। আবদুর রশীদের জ্ঞান ফিরে এলে পুলিশ সুপার তাঁকে নিয়ে জনতার ভেতর দিয়ে হাটের অন্য প্রান্তে জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট ও এস, ডি, ও সাহেবের কাছে রওয়ানা হন। পথিমধ্যে কোন এক হাটুরে 'নড়ি' (গরু তাড়ানো লাঠি) দিয়ে পুলিশ সুপারের টাক মাথায় সজোরে আঘাত করেন। আঘাতে রক্তক্ষরণের ফলে পুলিশ সুপার জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে এসে অজ্ঞান হয়ে পড়েন। মওলানা তর্কবাগীশের ভাষায়-"উত্তেজিত জনতা নারায়ে তকবীর ধ্বনি সহকারে অগ্রসর হয়ে চর্তুদিক থেকে তাদেরকে ঘিরে ধরে। অন্যদিকে রাইফেলধারী সিপাহীরা তখন ব্যূহবদ্ধভাবে জনতার দিকে রাইফেল তাক করে হাঁটু গেড়ে বসে।" আবদুর রশীদ জনতাকে নিরস্ত করার উদ্যোগ নেন। কিন্তু পুলিশ তাঁকে জনতার কাছে যেতে বাধা দেয়। ইতোমধ্যে পুলিশ সুপারের জ্ঞান ফিরে এলে জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট ও মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেটের অনুমতি নিয়ে তিনি গুলী করার হুকুম দেন। সিপাহীদের হাতে গর্জে ওঠে ৩৯টি রাইফেল। সঙ্গে আনা বুলেট নিঃশেষিত না হওয়া পর্যন্ত তারা গুলী চালায়। আর পাখির ঝাঁকের মতো প্রাণ হারায় সলঙ্গার হাজার

www.nagorikpathagar.org

হাজার নিরীহ মুসলমান হাটুরে। বাবু হিন্দু ব্যবসায়ী ও দোকানদারেরা বৃটিশ পণ্য বর্জন আন্দোলনের বিরোধী ছিলেন। তাই তারা জনতার এ আন্দোলনে যোগ না দিয়ে দোকান বন্ধ করে বসে থাকেন। গুলীবর্ষণে বিরত একমাত্র বিহারী ক্ষত্রীয় সিপাইকে প্রশ্ন করা হলে সে অকপটে জানায়, 'আমি তো মানুষ মারতে এসেছিলাম, গরু আমার দেবতা, আতি তো গরু মারতে পারি না।' উল্লেখ্য, ঘটনাস্থল ছিল গরু হাটা। মানুষর সাথে কতগুলো গরুও সেখানে মারা যায়।

জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকান্ডের খবর যেমন তৎকালীন ভারতের পত্র-পত্রিকাগুলোতে প্রকাশিত হয় সলঙ্গা হত্যাকান্ডের খবরও অন্তত কলকাতার দৈনিক ও সাপ্তাহিকগুলোতে তাৎক্ষণিকভাবে প্রকাশিত হয়। অথচ ৬৫ বছর পর বাংলাদেশের উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণীর যে-কোন ইতিহাসের ছাত্রের কাছেই জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকান্ড একটি অতিপরিচিত ঘটনা। কিন্তু খাস সিরাজগঞ্জ কলেজের ডিগ্রী ক্লাসের কোন ছাত্রও সলঙ্গা হত্যাকান্ডের খবর জানে না। মাত্র ৩ বছর আগেও আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের ইতিহাসের ছাত্র-ছাত্রীদের কাছেও সলঙ্গা নামটি ছিল অপরিচিত।

এমনটি হলো কিভাবে? কেন ইতিহাসের এত বড় একটা ঘটনা বিস্মৃতির ধূলিতে চাপা পড়ে গেল, কোন্ কারণে? স্বাধীন বাংলাদেশের নাগরিক হিসেবে আমাদের ইতিহাস ঐতিহ্য সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা অর্জনের জন্যে বিষয়টি খতিয়ে দেখা প্রয়োজন। সে প্রয়োজনেই তৎকালীন উপ-মহাদেশের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটের ওপর আলোক সম্পাত করা এবং জালিয়ানওয়ালাবাগ ও সলঙ্গা হত্যাকান্ডের পূর্বাপর ঘটনাপ্রবাহ পর্যালোচনা করা অত্যাবশ্যক। আপাতঃদৃষ্টিতে ১৯১৩ সাল থেকে ২৩ সাল পর্যন্ত ১০ বছর উপ-মহাদেশের ইতিহাসে মধুরতম সাম্প্রদায়িক সম্পর্কের অধ্যায়। কিন্তু ইতিহাসের অন্তঃস্রোতের দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যায়, অন্ততঃ বাংলা প্রদেশে সমাজের নীচের ধাপে তখন সাম্প্রদায়িক অসন্তোষের ধূমায়িত বিক্ষোভ বিদ্যমান। এ অধ্যায়েই জামালপুর, ঢাকা, মোমেনশাহী, বরিশাল, ফরিদপুর, মানিকগঞ্জ, টাংগাইল, সিরাজগঞ্জ সর্বত্রই বিক্ষোভ, সম্মেলন সমাবেশের মধ্য দিয়ে কৃষক অসন্তোষের প্রকাশ ঘটেছিল। হিন্দু-মুসলমান সাম্প্রদায়িক সম্পর্কে তিক্ততা বিরাজ করছিল। রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে প্রয়োজনের 'পীরিত' বহাল থাকলেও সামাজিক জীবনে বর্ণহিন্দু বাবুরা ছিলেন দেড় শতাব্দীব্যাপী বৃটিশ পৃষ্ঠপোষকতায় সমৃদ্ধ জমিদার-মহাজন, বিত্তশালী, শিক্ষিত সম্প্রদায়, আর মুসলমানেরা ছিলেন দেড় শতাব্দীব্যাপী ইংগ-হিন্দু শোসণে নির্যাতনে নিঃশেষিত নির্বিত্ত দিনমজুর প্রজা, ঋণজর্জরিত খাতক, ক্ষেতমজুর, মুটে মিস্তি, মাঝিমাল্লা। আজীবন ইসলামী সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতিতে বিশ্বাসী আলীম অসাম্প্রদায়িক

www.nagorikpathagar.org

মওলানা আবদুর রশীদ তর্কবগীশের আত্মজীবনীতেই আমরা দেখতে পাই, সেকালে বাবুরা মুসলমানদেরকে কিরূপ হেয়জ্ঞান করতেন। "ম্লেচ্ছ" 'অস্পৃশ্য' মুসলমান ছাত্রের হাতের পেন্সিলের স্পর্শকেও বাবু শিক্ষকেরা কিরূপ অপবিত্র মনে করতেন, বাবুদের বেঁধে দেয়া প্রতি সের দু পয়সা দরে দুধ বিক্রি করতে বাধ্য মুসলমান দুধওয়ালারা কিভাবে অঝোরে কাঁদতেন, দূরবর্তী গ্রাম থেকে গরুর গোশত এনে রান্না করে খাওয়ার অপরাধে কিভাবে মুসলমান প্রজাকে বাবুদের কাছারি বাড়ির কার্ণিশে ঝুলানো 'সোয়া হাত লম্বা স্পেশাল জুতায়' শায়েস্তা করা হতো। তাঁর বর্ণনাতে আমরা এটাও দেখতে পাই, সলঙ্গা হাটে গুলীবিদ্ধ মুসলমান মৃত্যু মুহূর্তেও হিন্দু পুলিশ কর্মচারীর হাতে এগিয়ে দেয়া পানির ঘটি ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে চিৎকার করে ওঠেন, 'কাফিরের হাতে পানি খেয়ে আমি মরব না।'

উনিশ শতকের শেষার্ধে ইংরেজী শিক্ষিত হিন্দুরা ভারতীয় প্রশাসনে উত্তরোত্তর অধিক অংশীদারিত্ব দাবী করায় তাদেরমোকাবিলায় দাঁড় করাবার প্রয়োজনে কূটনীতি হিসাবে ইংরেজরা মুসলমানদেরকে ১৮৭১ সাল থেকে শিক্ষাক্ষেত্রে ঈষৎ আনুকূল্য দিতে শুরু করেন। সীমিতভাবে হলেও মুসলমানদের জন্যে আধুনিক শিক্ষার দ্বার উন্মোচিত হয়। ফলে উনিশ শতকের শেষ রাতটি শেষ হবার সাথে সাথে বাংলার মুসলমানদের ইতিহাসে ভয়াবহতম শতাব্দীর অবসান ঘটে এবং বিশ শতকের প্রথম সূর্যোদয় মুসলমানদের জীবনে আবির্ভূত হয় উজ্জ্বল দিনের স্বপ্ন সম্ভাবনা নিয়ে। আর এই নিশাবসানোর ক্রান্তি মুহূর্তে ১৯০০ সালে জন্মগ্রহণ করেন মওলানা আবদুর রশীদ তর্কবাগীশ। বোধোদয়ের প্রাঙ্মুহূর্ত থেকে কৈশোরে ১২ বছর বয়স পর্যন্ত তাঁর অতিবহিত হয় নবগঠিত পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশের পাবনা জেলার পল্লী অঞ্চলে। প্রশাসনিক সুবিধার প্রয়োজনে বিশাল বাংলা প্রেসিডেন্সী (বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা ও আসাম] প্রদেশ দ্বিখন্ডিত করে নতুন প্রদেশটি গঠিত হয়। বিপুলভাবে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রাকৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধ নবগঠিত প্রদেশটি পশ্চাতপদ মুসলমান সমাজের জন্যে যেমন সম্ভাবনার দ্বারোদঘাটন করে দেয় তেমনই কলকাতা প্রবাসী পূর্ববঙ্গীয় বর্ণহিন্দু জমিদার, ব্যবসায়ী, শিল্পপতি, উকিল, ব্যারিস্টার বাবুদের স্বচ্ছন্দ্যময় জীবনের গতিপথে বাধার প্রাচীর তুলে ধরে। এ প্রাচীর ভাঙ্গার প্রয়োজনে সারা বাংলার বর্ণহিন্দু বুদ্ধিজীবীরা সক্রিয় আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েন। এবং তাদের প্রত্যক্ষ মদদপুষ্ট তরুণ সম্প্রদায় সন্ত্রাসবাদী সংগ্রাম শুরু করে। ফলে বাংলার এ অঞ্চলের মুসলমানদের সাথে বর্ণহিন্দু সম্প্রদায়ের সাম্প্রদায়িক তিক্ততা তীব্র হয়। সর্বভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস বঙ্গ ভঙ্গের বিরোধীতা করায় বৃটিশ ভারতের অন্যান্য প্রদেশের মুসলমান সমাজের ওপরও তাঁর প্রতিক্রিয়া হয়। এ কারণেই ১৯০৬ সালে ৩৫ বছরের যুবক ঢাকার নওয়াব সলিমুল্লাহের ডাকে সারা বৃটিশ ভারতের প্রবীণ মুসলিম নেতৃবৃন্দ নতুন প্রদেশের

www.nagorikpathagar.org

সলংগার নায়ক মওলানা আবদুর রশীদ তর্কবাগিশ

রহমতগঞ্জ গণ–কবরস্থানের অংশ বিশেষ

www.nagorikpathagar.org

রাজধানীতে সম্মিলিত হয়ে নিজেদের সংঘবদ্ধ করেন। ১৯১২ সাল পর্যন্ত বিদ্যমান এই পারস্পারিক মোকাবেলার মনোভাব নতুন প্রদেশটি বিলুপ্ত হবার মাধ্যমে মুসলমান সমাজে তীব্রতর হয়ে দেখা দেয়। তখন হিন্দু সাম্প্রদায় তাদেরকে এ তিক্ততা ভুলে যাওয়ার জন্য অনুপ্রাণিত করতে এগিয়ে আসেন। এটা ছিল তাদের কূটনৈতিক চাল।

১৯১১ সালেও প্রতিকূল শিক্ষা ব্যবস্থার দরুন অভিবক্ত বাংলার ৮৪টি মহকুমায় সর্বমোট ১০ জন মুসলমান এম, এ, পাস করেন। বি,এ পাস করেন ৩৬ জন, আই, এ ৯৩ জন, আই এস সি ১৩ জন এবং প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন ২১১ জন। এই নগন্যসংখ্যক মুসলিম তরুণও একদিকে যেমন ছিল স্বাধীনতা পিয়াসী, অন্যদিকে তেমনই আধুনিক সাহিত্যের বর্ণহিন্দু দিকপালদের রচিত পাঠ্যপুস্তকের জাতীয়তাবাদী ভাবধারার প্রভাবে প্রভাবিত। ১৯৪৭ সালে যে বর্ণহিন্দু বাবুরা সর্বমুখী সংগ্রাম চালিয়ে বাংলাকে দ্বিখন্ডিত করলেন, তারাই সেদিন সর্বশক্তি প্রয়োগ করে বঙ্গভঙ্গ রদের মাধ্যমে নতুন মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশটির সামপ্তি ঘটালেন। এ কাজে সফল হয়েই তারা পরিকল্পনা গ্রহণ করেন মুসলমানদের ওপর থেকে বৃটিশের 'ঈষৎ আনুকূল্যটুকুর'ও অবসান ঘটাতে। তারা চাইলেন মুসলমানদেরকে জাতীয়তাবাদী বৃটিশ বিরোধী আন্দোলনের পুরোভাগে এগিয়ে দিয়ে সরাকরকে চোখে আংগুল দিয়ে দেখাতে যে হিন্দুরা নয়–মুসলমানেরাই ইংরেজের আদি ও অকৃত্রিম জাতশত্রু।

এ মতলব হাসিলের লক্ষ্যে কংগ্রেসের বর্ণহিন্দু নেতৃবৃন্দ ১৯১২ সালের পর সর্বভারতীয় পর্যায়ে মুসলমানদের সাথে মৈত্রী প্রতিষ্ঠার আগ্রহে, মিঃ গোখেলের জাতীয়তাবাদী ভাবশিষ্য মিঃ মোহাম্মদ আলী জিন্নাহকে মুসলিম লীগে অনুপ্রবিষ্ট করান, মুসলিম লীগকে কংগ্রেসের সাথে হাত মিলাতে সম্মত করাবার জন্য। এ সময়ে ১৯১৪ সালে মিঃ এম, কে, গান্ধী আফ্রিকা থেকে ভারতে এসে কংগ্রেস আন্দোলনে অহিংস সত্যাগ্রহের সূত্রপাত করেন। মিঃ গান্ধীর 'রামরাজ্য' প্রতিষ্ঠার আবেদনে হিন্দুসমাজ ব্যাপকভাবে সাড়া দেয়। তীক্ষ্ণধী ও দূরদৃষ্টি সম্পন্ন মিঃ গান্ধী উপলব্ধি করেন যে, গড়ে হাজার বছরেরও অধিক কাল পরাধীন জীবন–যাপনে অভ্যস্ত বর্ণহিন্দু সমাজকে স্বাধীনতার পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে হলে তাদের ধীর গতিতে সুসংহত ও আত্মপ্রত্যয়ী করে গড়ে তোলা দরকার। তার অনুসৃত নীতির ফলে কয়েক বছরের মধ্যে তিনিই হয়ে ওঠেন জাতীয় কংগ্রেসের আসল নীতিনির্ধারক। অন্যান্য কংগ্রেস নেতাকে সাথে নিয়ে তিনি মুসলমান সমাজকেও জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে শরীক হবার আহবান জানান। অবিভক্ত বাংলায় মেদিনীপুরের স্যার আবদুর রহিম, সিরাজগঞ্জের সৈয়দ ইসমাঈল হোসেন সিরাজী, চাটগাঁর মওলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী, বর্ধমানের মওলবী আবুল কাসেম, বরিশালের মওলবী ফজলুল হক, কুমিল্লার

www.nagorikpathagar.org

ব্যারিস্টার আবদুর রসুল, বশির হাটের মৌলবী মুজিবর রহমান প্রমুখ তখন কংগ্রেসেরই প্লাটফর্মে কর্মরত ছিলেন। মুসলিম লীগকে তারা মুসলমান সমাজের বিশেষ বিশেষ দাবী দাওয়া পেশের একটি প্রতিষ্ঠান হিসাবেই গণ্য করতেন। ১৯১৫ সাল থেকে নিখিল ভারত মুসলিম লীগ ও নিখিল ভারত জাতীয় কংগ্রেসের বার্ষিক সম্মেলনগুলো একই শহরে পাশপাশি অনুষ্ঠিত হতে শুরু করে। ১৯১৬ সালে মিঃ জিন্নাহর চেষ্টায় "লাখনৌ হিন্দু মুসলিম মৈত্রী চুক্তি" স্বাক্ষরিত হয়। ১৯১৮ সালে দিল্লীতে নিখিল ভারত মুসলিম লীগের সম্মেলনে অভ্যর্থনা সমিতির ভাষণে ডক্টর মোখতার আহমদ আনসারী (পরবর্তীতে জাতীয় কংগ্রেসের পেসিডেন্ট) সকল স্বার্থ ত্যাগ করে বৃটিশ বিতাড়নের আন্দোলন শুরু করার আহবান জানান।

১৯১৯ সালের ১৪ নভেম্বর দিল্লীতে মওলবী ফজলুল হকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত খেলাফত সম্মেলনের মধ্য দিয়ে খেলাফত আন্দোলন শুরু হয়। ১৯১৯ সালেই প্রবর্তিত 'রাউলাট আইন' নামে অভিহিত একটি নিপীড়নমূলক আইনের প্রতিবাদে মিঃ গান্ধীর নেতৃত্বে কংগ্রেস আন্দোলনের ডাক দেয়। এ পরিস্থিতিতে খেলাফত কমিটি, জমিয়াতুল উলামায়ে হিন্দ, মুসলিম লীগ–সবাই কংগ্রেসের সাথে হাত মিলিয়ে বৃটিশ বিরোধী উত্তাল আন্দোলন শুরু করেন। সম্মিলিত এ আন্দোলনকে অসহযোগ,সত্যাগ্রহ ও বৃটিশ পণ্য বর্জন আন্দোলনে রূপ দিয়ে সংগ্রামের পুরোভাগে রাখা হয় মওলানা মোহাম্মদ আলী, মওলানা শওকত আলী, মওলানা হসরত মোহানী, মওলবী ফজলুল হক, সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজী প্রমুখ মুসলিম নেতৃবৃন্দকে। পেছনে কর্ণধার হিসেবে বিরাজ করেন মিঃ এম, কে, গান্ধী। আন্দোলনের তীব্র জোয়ারের তোড়ে জাতীয় কংগ্রেস মুসলিম লীগ ও খেলাফত কমিটি রাজনৈতিক মঞ্চে একাকার হয়ে যায়। একই মওলবী এ, কে, ফজলুল হক একাধারে নিখিল ভারত জাতীয় কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক ও নিখিল ভারত মুসলিম লীগের সভাপতি নির্বাচিত হন। একই মওলানা মোহাম্মদ আলী খেলাফত কমিটি ও জাতীয় কংগ্রেসে নেতৃত্ব দিতে থাকেন। ১৯১৩ সাল থেকে উত্তরোত্তর তীব্র হয়ে ওঠা এ আন্দোলনের ধারায় ১৯১৫ সালে মওলবী মাযহারুল হক বাঙালী নিখিল ভারত মুসলিম লীগের বোম্বাই অধিবেশনে এবং ১৯২১ সালে মওলানা হসরত মোহানী নিখিল ভারত জাতীয় কংগ্রেসের এবং মুসলিম লীগের আহমদাাদ অধিবেশনে সরাসরি স্বাধীনতার ঘোষণা উচ্চারণ করেন। এ সময়েই মালাবারে মোপলা মুসলমান অধিবাসীরা স্বাধীনতার পতাকা উড়িয়ে দেয়। ফলে ১৯৮৫ সাল থেকে লর্ড ডাফরিনের অনুসৃত নীতি অনুযায়ী মুসলমানদের প্রতি যে কিঞ্চিত আনুকূল্য প্রদর্শনের ধারা অনুসৃত হয়ে আসছিল তাও পরিবর্তিত হয়। আন্দোলনের তীব্র তোড়ে মওলানা ওবায়দুল্লাহ সিন্ধির নেতৃত্বে ১৮ হাজার বিপ্লবী মুসলিম তরুণ বৃটিশ ভারত ত্যাগ করে আফগানিস্তানে হিযরত করেন। যে

www.nagorikpathagar.org

নগন্যসংখ্যক মুসলিম ছাত্র স্কুল-কলেজে শিক্ষার সুযোগ পেতে শুরু করেছিল তারাও শিক্ষাঙ্গন ত্যাগ করে ভবঘুরে বেকারে পরিণত হয়। মুসলিম ছাত্রদের বিদ্যালয় ত্যাগের প্রশ্নে মত-পার্থক্যের দরুনই আন্দোলনের মধ্যপর্যায়ে মওলবী ফজলুল হক মিঃ গান্ধীর সাথে রাজনৈতিক সম্পর্কচ্ছেদ করেন। কিন্তু এভাবে মিঃ এম, কে, গান্ধীর নেতৃত্বে পরিচালিত অসহযোগ খেলাফত আন্দোলনের ফলে মুসলমান তরুণরা যখন বৃটিশের কোপদৃষ্টিতে পড়ে এবং শিক্ষাঙ্গন ত্যাগের মাধ্যমে বেকারত্বের আবর্তে ঘুরপাক খেতে শুরু করে, সেই মুহূর্তে মিঃ গান্ধী ১৯২২ সালের মাঝামাঝি অসহযোগ আন্দোলন প্রত্যাহার করে নেন। কারণ, সর্বভারতীয় হিন্দু সমাজকে সুসংহত করার আগে স্বাধীনতার আওয়াজ তুলতে তিনি অনিচ্ছুক ছিলেন। উপ-মহাদেশব্যাপী উত্তাল আন্দোলনের শুরুতে সংঘটিত হয় জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকান্ড এবং আন্দোলন প্রত্যাহৃত হবার মাত্র কিছুদিন আগেসংঘটিত হয় সলঙ্গা হত্যাকান্ড। আন্দোলনকালে মওলানা হসরত মোহানীর আজাদীর ঘোষণাকে বিদ্রুপ করে এক বিবৃতিতে মিঃ গান্ধী বলেন, 'মওলানা স্বাধীনতা শব্দের অতলস্পর্শী অর্থ অবহিত নন, কংগ্রেসের দাবি স্বরাজ অর্থাৎ স্বায়ত্তশাসন।' [ডাঃ আবদুল ওয়াহিদ, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১১৩} বৃটিশ আনুকূল্যে মালাবারের যুদ্ধ এলাকা সফর করে এসে ১৯২১ সালেই কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এক বিবৃতিতে মন্তব্য করেন যে, মুসলমানরা সাম্প্রদায়িক। [ ] অন্যান্য বর্ণহিন্দু নেতা প্রচার করেন যে, মালাবারে সংখ্যাগুরু মুসলমানেরা হিন্দুবিরোধী দাংগা পরিচালনাকরছে।

সম্মিলিত আন্দোলনের মাধ্যমে বর্ণহিন্দু বাবুদের এক ঢিলে ৪টি পাখি শিকার হয়ঃ

(১) ইংরেজরা মুসলমানদেরকে জাতশত্রুরূপে চিহ্নিত করে নেয়-যার পরিণতি মুসলমানেরা দেখতে পায় ১৯৪৭-এ 'ছেঁড়া কাটা পোকায় খাওয়া' পাকিস্তানের মধ্যে।

(২) আন্দোলন চলাকালে সবে শিক্ষাঙ্গনে উপস্থিত মুসলমান তরুণেরা স্কুল-কলেজ ত্যাগ করে-অশিক্ষিত ভবঘুরেতে পরিণত হয়।

(৩) ১৮ হাজার বিপ্লবী শিক্ষিত মুসলিম তরুণ উপ-মহাদেশ থেকে হিজরত করে আফগানিস্তানে চলে যায় এবং

(৪) বৃটিশ পণ্য বর্জনের ফলে সারা উপ-মহাদেশে বর্ণহিন্দু বাবুদের শিল্প কারখানা গড়ে ওঠে।

উদ্দেশ্য হাসিলের সাথে সাথে আন্দোলন গুটিয়ে নিয়ে বর্ণহিন্দু নেতারা হিন্দু মুসলিম সম্পর্কের ক্ষেত্রে নতুন অধ্যায়ের সূচনা করেন।

১৯২৩ সাল থেকে ১৯২৮ সাল পর্যন্ত চলতে থাকে সর্বভারতীয় পর্যায়ে মুসলিম সংখ্যালঘু প্রদেশগুলোতে মুসলিম বিরোধী দাংগা। ১৯২৫-২৬ থেকে ১৯২৮ সাল পর্যন্ত

www.nagorikpathagar.org

কলকাতা, ঢাকা, বরিশাল ও পটুয়াখালীতেও সে দাংগা বিস্তার লাভ করে। এ সময়ে বাংলা প্রদেশে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস ও মওলবী এ, কে, ফজলুল হকের নেতৃত্বে হিন্দু–মুসলিম নেতৃবৃন্দের মধ্যে 'বেঙ্গল প্যাক্ট' নামক মৈত্রীচুক্তি স্বাক্ষরিত হয় এবং তা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। ১৯১৫ সালে বাংলার গভর্ণরের কাউন্সিলর নিযুক্ত হন ব্রাহ্মণবাড়িয়ার নবাব সৈয়দ শামসুল হুদা। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে থেকে তিনি মুসলমান সমাজে শিক্ষা সম্প্রসারণের কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। ১৯১৯–এর মন্টেগু–চেম্‌সফোর্ড শাসন সংস্কারের পর বাংলায় মুসলিম সংখ্যাগুরু সম্প্রদায় হিসাবে এ সময় ১৯২৪ সাল থেকে মুসলমানরা গভর্ণরের মন্ত্রিসভায় ও ভাইস রয়ের উপদেষ্টা পরিষদে নিয়মিতভাবে আসন পেতে শুরু করেন। আরম্ভ হয় দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে টাগ অব ওয়ার। আগ্রাসী সাম্প্রদায়িক বর্ণহিন্দু বাবুরা তখন বাংগালী জাতীয়বাদ বিসর্জন দিয়ে সর্বভারতীয় জাতীয়তাবাদের পতাকা হস্তে মুসলমানদের সবকিছু গ্রাস করতে উদ্যত। অন্য পক্ষ, মুসলমানেরা অস্তিত্ব ও আত্মরক্ষার প্রশ্নে উদগ্রীব। দুই সম্প্রদায়ের পরস্পর বিরোধী এ ধারাই এগিয়ে চলে ১৯৩০–৩২"সালের গোলটেবিল বৈঠক, ১৯৩৫ সালের শাসনতন্ত্র, ১৯৩৭ সালে মুসলমান প্রদেশগুলোতে মুসলিম মন্ত্রিসভা এবং হিন্দুপ্রধান প্রদেশগুলোতে হিন্দু মন্ত্রিসভা কায়েমের ভেতর দিয়ে। ১৯৪৭ সালে তা উপ–মহাদেশকে বিভক্ত করে পাকিস্তান ও ভারত দু'টি পৃথক রাষ্ট্রে পরিণতি লাভ করে। ১৯৭১ সালে পাকিস্তান দ্বিধাবিভক্তির পর স্বাধীন বাংলাদেশে দাঁড়িয়ে আজ আমরা জালিয়ানওয়ালবাগ ও সলঙ্গার দিকে দৃষ্টিপাত করছি।

অসহযোগ আন্দোলনের যুগে ২২ বছরের তরুণ সেদিনের দশম শ্রেণীর ছাত্র আবদুর রশীদ (তখনও মাদ্রাসার ছাত্র হননি) কংগ্রেস স্বেচ্ছাসেবক হিসাবেই কংগ্রেস অফিসে বসে বিলেতী পণ্য বর্জন আন্দোলনে নেতৃত্ব দিতেছিলেন। সলঙ্গা হাটের পার্শ্ববর্তী এলাকার হাটুরে জনসাধারণের ১৪ আনাই ছিল মুসলমন গরীব অশিক্ষিত জনসাধারণ। পীর সাহেবের ছেলে তেজস্বী তরুণ রশীদের পিছনে তারা সমবেত হয়েছিলেন। আর, এন, দাস বাবু ও সিংহরায় বাবুর হুকুমে চালিত রাইফেলের গুলীতে তারা পাখির ঝাঁকের মতো প্রাণ হারান। অসহযোগ আন্দোলনের লক্ষ্য হাসিল না হওয়া পর্যন্ত মুসলমানদেরকে সঙ্গে রাখা প্রয়োজন ছিল, তাই তখনকার হিন্দু মালিকানাধীন আনন্দবাজার,অমৃতবাজার, বসুমতি প্রভৃতি দৈনিক পত্রিকাগুলোতে সে–খবর ছাপাও হয়েছিল। কিন্তু লক্ষ্য হাসিলের পর সে–ঘটনার পুনোরুল্লেখের আর কোন প্রয়োজন ছিল না; বরং তাকে ইতিহাসের অংগীভূত করে মুসলমানদের আত্মত্যাগের গৌরবগাঁথা রচনার কাজ তারা অসমীচীন মনে করেন। এ কারণে তারা তা করেনও নি। কিন্তু জালিয়ানওয়ালাবাগের ঘটনাকে জীবন্ত করে রাখার প্রয়োজন ছিল, জাতীয় কংগ্রেসের বৃটিশবিরোধী সংগ্রামের ভূমিকাকে পরবর্তী বংশধরদের কাছে উজ্জ্বলভাবে তুলে ধরার জন্যে। সেটা তারা করেছেনও। বাবুদের লেখা ইতিহাসে এ কারণেই সলঙ্গা হত্যাকান্ড

www.nagorikpathagar.org

ঠাঁই পায়নি। জ্যোতিষ্মান হয়ে দীপ্তি ছড়াচ্ছে জালিয়ানওয়ালাবাগ। ১৯২০ সালে অবিভক্ত বাংলায় কলেজপড়া মুসলমানের সংখ্যা ছিল সাকুল্যে শ' সাতেক। ১৯৩৭ সালে ঋণ সালিসি আইন ও তৃতীয় প্রজাস্বত্ব আইনের আগ পর্যন্ত বর্ণহিন্দু জমিদার-মহাজন বাবুদের শোষণে নির্যাতনে তাদের নাভিশ্বাস উঠেছিল। সমকালীন ইতিহাসকে লিখিত আকারে ধরে রাখার মতো মুসলিম বুদ্ধিজীবীর তখন একান্তই অভাব। তদুপরি, মুসলমানরা তখন সবেমাত্র প্রশাসনে শরীক হতে শুরু করে। ১৯২৪ সালে শিক্ষা আইন, ১৯২৮ সালের দ্বিতীয় প্রজাস্বত্ব আইন, ১৯৩০ সালের প্রাথমিক শিক্ষা আইন ও মহাজনী ঋণ নিয়ন্ত্রণ আইন প্রভৃতি পাস করে মুসলমান সমাজের জীবন ও জীবিকাকে নিরাপদ ও নিশ্চিত করাই ছিল তখন মুসলিম নেতৃবৃন্দের প্রধান কর্তব্য। সলঙ্গা হত্যাকান্ডের ঘটনাকে তুলে ধরে অহেতুক ইংরেজের আরো বিরাগভাজন হবার আশংকাকে তারা এঁড়িয়ে চলতে বাধ্য ছিলেন। জলিয়ানওয়ালাবাগের হতাহতদের শিক্ষিত আত্মীয়-স্বজন ও কংগ্রেস কর্মীরা বৃটিশের বিরুদ্ধে জনগণকে উত্তেজিত করার প্রয়োজনে ঘটনাটির অতিরঞ্জিত রূপ প্রচার করেন। পক্ষান্তরে সলঙ্গার হতাহতদের অশিক্ষিত আত্মীয়-স্বজন সরকারী নির্যাতনের ভয়ে নিহত আহতদের খবর যতদূর সম্ভব গোপন রাখার চেষ্টা করেন এবং কোর্টকাছারির আমলা-ফয়লা, উকিল মোক্তার বাবুরাও হিন্দু অফিসারদের নির্দেশে হিন্দু পুলিশের গুলীতে মুসলমানদের নিহত হবার ঘটনাটিকে সাধ্যমত চাপা দেয়ার চেষ্টা করেন। ১৯৩৮ সালে ঋণ সালিসি আইনের বদৌলতে মুক্তিপ্রাপ্ত বাংলার নবজাগ্রত মুসলমান চল্লিশ ও পঞ্চাশের দশকে প্রথম প্রজন্মের শিক্ষিত ব্যক্তিবর্গ-রাজনৈতিক, প্রশাসনিক, শৈক্ষিক, বাণিজ্যিক কর্মকান্ডের কর্তাব্যক্তিরা শৈশবে দুঃসহ দারিদ্রের মধ্যে থেকে আবির্ভূত হয়ে অনায়াসে অকল্পনীয় ভোগ-বিলাসিতার স্বাদ পেযে কেবলমাত্র নগদ স্বার্থকেন্দ্রিক কার্যক্রমে ব্যস্ত ছিলেন। তাদের সর্বনাশা ব্যক্তিকেন্দ্রিক ভোগলিপসায় বিক্ষুব্ধ ষাট ও সত্তর দশকের দ্বিতীয় প্রজন্ম ভিন্ন ধারায় কিন্তু একই প্রকৃতির কর্মকান্ডে ব্যস্ত থাকেন। এই উভয় প্রজন্মের কেউই সলঙ্গার মতো ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর ব্যাপারে মনোনিবেশ করার সময ও সুযোগ পেয়ে ওঠেননি।

তাই আশির দশকের প্রান্ত দেশে দাঁড়িয়ে আজ আমরা দেখতে পাচ্ছি, উপমহাদেশের এ শতাব্দীর আজাদী সংগ্রামে আত্মদানের উজ্জ্বলতম ঘটনা সলঙ্গা হত্যাকান্ডের কাহিনী হিন্দু সম্প্রদায়ের বুদ্ধিজীবীরা মতলবে মাড়িয়ে গেছেন আর মুসলমান সম্প্রদায়ের পুরোধাগণ প্রয়োজনে এড়িয়ে গেছেন। এই মাড়িয়ে যাওয়া ও এড়িয়ে যাওয়ার ফাঁকে পুরো ঘটনাটাই বিস্মৃতির ধূলিরাশিতে চাপা পড়ে হারিয়ে যেতে বসেছে।

www.nagorikpathagar.org

বাংলা নববর্ষ ঃ প্রসঙ্গকথা

আজ বাংলা সালের প্রথম দিন। * প্রতি বছর শেষে একবার এদিন ঘুরে আসে। আর তখনই স্মরণ হয়, বাংলা সালের সাথে সম্পর্কিত বাংলাদেশ, বাংলা ভাষা ও বাঙালী জাতীয়তার নানাদিক। মনের গভীরে প্রশ্ন জাগে এসবের উৎপত্তি ও বিকাশধারা সম্পর্কে। বাংলা ভূখন্ডের বাংলাভাষী জনগোষ্ঠীর প্রয়োজনে সৃষ্ট বলেই এর নাম বাংলা সাল। কিন্তু মূলতঃ এই ভূখন্ডের বাংলা নামকরণ, বাংলা ভাষার বিকাশ এবং সেই জমিন ও ভাষাভিত্তিক জনগোষ্ঠীর বাঙালী পরিচিতি কিভাবে কাদের প্রয়াসে সম্ভব হলো, সে ভাবনাও আজকের দিনে আমাদের মনকে নাড়া না দিয়ে পারে না।

আজ ১লা বৈশাখ, বাংলা ১৩৯৫ সাল, ২৬ সাবান, হিজরী ১৩০৮ সাল ও ১৪ এপ্রিল ইংরেজী ১৯৮৮ সাল–এটা 'এপার বাংলা'র হিসাবে। 'ওপার বাংলা'য় আজ ২৫ চৈত্র ১৯১০ শকাব্দ, ১ বৈশাখ ১৩৯৫ বঙ্গাব্দ। [তাও যদি কেউ দয়া করে লেখেন, সরকারী নির্দেশ শকাব্দ লেখার] ও ১৪ এপ্রিল ১৯৮৮ খৃষ্টাব্দ। এই যে বাংলা সাল আর বঙ্গাব্দ হিজরী সাল আর শকাব্দ–এ থেকেই ধরা পড়ে যে, 'এপার বাংলা' আর 'ওপার বাংলা' ধ্বনি ব্যঞ্জনায় এক রকম শোনালেও এদের মাঝে দুস্তর ব্যবধান বিদ্যমান। এ ব্যবধান আরো পরিস্ফুট হয়ে ওঠে যদি আমরা আবেগতাড়িত 'এপার বাংলা ওপার বাংলা' শব্দমালা থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়ে এদের বাস্তব ঐতিহাসিক পরিচয়ের প্রতি লক্ষ্য করি। এপারের ভূখন্ডটি '৪৭–এর পর থেকেই পূর্ববাংলা, এখন বাংলাদেশ আর ওপারের ভূখন্ডটি তখন থেকেই পশ্চিমবঙ্গ–বাংলা নয়। অর্থাৎ এপার বাংলা ওপার বঙ্গ–ওপার বাংলা নয়। আসলে এই 'বাংলা' আর 'বঙ্গ' পরিচয়েরই বা কোন্‌টা কতটুকু সঠিক। ঐতিহাসিক পটভূমির দিকে তাকালে দেখা যাবে, বাংলাভাষী যে বিস্তীর্ণ জনপদটি 'এপার বাংলা ওপার বৎগ বলে আজ পরিচিত, মাত্র দেড় দুই হাজার বছর আগেও তা ছিল বঙ্গ, রাঢ়, সমতট, হারিকেল, বরেন্দ্র ও রত্নদ্বীপ নামক ৬টি ভিন্ন ভিন্ন জনপদ। মূল বঙ্গ ছিল খুলনা, যশোর, কুষ্টিয়া, ফরিদপুর, ঢাকা এবং চব্বিশ পরগনা, মুর্শিদাবাদের একাংশ ও নদীয়া জেলা নিয়ে গঠিত ভূভাগ। এর দক্ষিণ–পূর্বে বরিশাল, নোয়াখালী ও কুমিল্লার অংশবিশেষ নিয়ে ছিল সমতট। বংগ ও সমতটের পূর্বে উত্তর–দক্ষিণে প্রলম্বিত সিলেট থেকে চট্টগ্রাম পর্যন্ত এলাকা ছিল হারিকেল। বংগের উত্তরে রাজশাহী, বগুড়া, পাবনা ও দিনাজপুরের অংশবিশেষ নিয়ে বরেন্দ্র জনপদ এবং তার উত্তরে দিনাজপুর, রংপুর, কোচবিহার, জলপাইগুড়ি ও দার্জিলিং নিয়ে রত্নদ্বীপ জনপদ।

ভাগীরথির পশ্চিমে বর্ধমান বিভাগের জেলাগুলো নিয়ে ছিলো রাঢ় জনপদ। দূর অতীতে তারও অন্য নাম ছিল সূহ্ম। এ ছয়টি জনপদের পাঁচটির রাজনৈতিক সীমারখা

www.nagorikpathagar.org

বিভিন্ন শতাব্দীতে পরিবর্তিত হয়েছে। এক এক সময় এক এক দিকে, হয়ত কিছুটা প্রসারিত বা কিছুটা সংকুচিত হয়েছে। কিন্তু ভাগিরথীপারের রাঢ় রাঢ়ই রয়ে গেছে। তার সীমানা বাড়েওনি কমেওনি। এই অপরিবর্তিত আদি অকৃত্রিম রাঢ়ের সাথে মূল বংগের ছেঁড়া–কাটা এক চিলতে খসিয়ে নিয়ে জুড়ে দিলে যা দাঁড়ায় তার নাম আর যাই হোক বংগ হওয়া সমীচীন হয় না। তবুও তা হয়েছে। হয়েছিল কোলকাতাকেন্দ্রিক বাবু বুদ্ধিজীবীদের প্রয়াসে। ইংরেজদের ব্যবহৃত বেংগল প্রভিন্স শব্দের বাংলা অনুবাদ তারা করেন বংগ প্রদেশ নামে। কারণ মহাভারতের ১৩ পরিচ্ছেদে মৎস্য পুরানে ৪৮২ পরিচ্ছেদ এবং বায়ু পুরানো ১১ পরিচ্ছেদে তারা বংগ জনপদের উল্লেখ পেয়েছিলেন– অবশ্য অনার্য দস্যুতস্কর অস্পৃশ্য শূদ্রের দেশ হিসেবে। ১৯৪৭–এ সেই বংগেরই একাংশ কেটে নিয়ে তারা রাঢ়েরই নতুন নামকরণ করেন পশ্চিম বংগ। তাই ওপার বাংলা বাংলাতো নয় বংগও নয়।, আসলে সেটা রাঢ়। আর এ কারণেই আজ কোলকাতার বুদ্ধিজীবী মহলেও পশ্চিম বংগের নতুন নামকরণের আলোচনা শুরু হয়েছে। তবু তাদের একাংশ, যারা নিজেরা দিল্লীর অধীনে থেকে এপার বাংলাকে তাঁদের সাথে একীভূত করে নেবার দিবাস্বপ্ন দেখেন, তাঁরাই শ্লোগান তুলেছেন এপার বাংলা ওপার বাংলা। আদিতে মূল বঙ্গ ছিল হাজার হাজার অনুচ্চ টিলার সমন্বয়ে গঠিত জলাভূমি, সেকালের এ দেশীয় জনগণের ভাষায় "বং"। সেখানে 'আল' তৈরী করে জোয়ার–ভাটায় টিলার গায়ে পানি আটকাতে হতো বলে সারা জনপদটাই ছিল 'বং' আর 'আল'–এ আচ্ছাদিত এক কথায় 'বঙাল'। আর্যদের সংস্কৃত উচ্চারণে বংগাল। ব্রাহ্মণ্য সেন রাজত্বের পূর্বে বৌদ্ধ পন্ডিতগণ সংস্কৃত পন্ডিতদের 'বঙ্গ' জনপদকে 'বংগাল' বলেই উল্লেখ করেছেন। [আর, সি মজুমদার হিস্টরী অব বেংগল, ১ম খন্ডঃ পৃঃ ২৯৪ ও ৩৩৬–৩৭]। তবে সে বংগাল মূল বঙ্গই ছিল। আজকের বাংলাভাষী বিশাল বিস্তীর্ণ ভূভাগ নয়। ইখতিয়ার উদ্দিন মুহম্মদ বিন বখতিয়ার খিলজীর নেতৃত্বে মুসলমানেরা যখন এদেশ জয় করেন, তারাও বাংলা জয় করেননি। গৌড়াধিপতি লক্ষণাবতীর রাজা লক্ষণ সেনকে পরাজিত করে গৌড় রাজ্য জয় করেন। রত্নদ্বীপ তাঁর নিজের অধিকারে আসে এবং উত্তরসূরীরা দক্ষিণ পূর্বের সুবর্ণগ্রাম বা সোনার গাঁও, দক্ষিণ–পশ্চিমে সপ্তগ্রাম বা সাতগাঁও পর্যন্ত নিজেদের রাজ্যভুক্ত করার পর তেরো শতকের চতুর্থ দশকের মধ্যে উপরোক্ত ছয়টি জনপদই একদেশ বা মুলূক এবং রাজ্য বা সালাতানাত–এর আওতায় আসে। অনার্য বৌদ্ধ পন্ডিত সমাজও বঙ্গাল শব্দই ব্যবহার করতেন। বৌদ্ধ ও শূদ্র প্রজাসাধারণের কওমী পরিচয় 'বাংগাল' শব্দটিকেই বাংলার স্বাধীন মুসলিম সুলতানেরা গ্রহণ করে নিয়ে দেশের পরিচয় দিতে থাকেন 'মূলূকে বাংগাল' এবং রাজ্যের নাম রাখেন 'সালতানাতে বাংগালা'। আরবী ব্যাকরণ–বিধিতে মূলূক পূং লিংগ ও সালতানাত স্ত্রী লিংগ হওয়ার দরুন মূলূকের ক্ষেত্রে মুসলিম মনীষীরা লিখতেন বাংগাল এবং সালতানাতের ক্ষেত্রে লিখতেন 'বাংগালাহ'।

www.nagorikpathagar.org

১৯৬৫ সালে গণচীনের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের ডিরেক্টর মিঃ সিয়ানাই তাঁর লিখিত "চীন ও পাকিস্তানের বন্ধুত্বের ঐতিহাসিক চিত্র" নামক গ্রন্থে তেরো শতকের একটি দস্তাবেজ পেশ করে জানান যে, তখন বর্তমান বাংলাদেশ অঞ্চলে 'বেংচো–লা' নামক একটি স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়। বাংগালাহ্ শব্দকেই পর্তুগীজরা ইউরোপে বয়ে নেয় 'বেংগালা' রূপে। বাংলা শব্দাবলীর যে প্রথম অভিধান আঠারো শতকের গোড়ার দিকে প্রকাশিত হয় পর্তুগালে, রোজারিওর লেখা সে গ্রন্থখানির নামও রাখা হয় 'ভোকাবোলারিও বেংগালা'। 'বেংগালা' শব্দের অনুসরণেই ইংরেজরা 'সুবে বাংগালাহ'র নাম রাখেন বেংগল। তাই দেখা যাচ্ছে যে দেশের নাম 'বাংলা' রেখেছিলেন সেকালের মুসলমানেরা, দুশো বছর বৃটিশ বর্ণহিন্দু শাসন–শোষণের শেষে মুসলিমরাই উত্তরাধিকারহিসেবে পেয়েছে সেই বাংলাদেশ।

উন্নাসিক আর্য ঋষি ব্রাহ্মণেরা কেবল বংগ জনপদকে দস্যু তস্কর অস্পৃশ্যের দেশ ঘোষণা করেই ক্ষান্ত হন নাই। এ অনার্য মূলক ছিল অযজ্ঞীয়। এখানে আগমনকারীর জন্য তারা রৌরব নরকের শাস্তি ঘোষণা করেন এবং প্রায়শ্চিত্তের বিধান দেন। এ জনপদের প্রচলিত ভাষাকে তারা পক্ষীভাষা বলে নিন্দা করতেন। তাদের উত্তরসূরী বর্ণহিন্দু বাবু বুদ্ধিজীবীরা এখনো দাবী করেন যে, সংস্কৃত ভাষার পূর্বী অপভ্রংশ বা গৌড়ীয় অপভ্রংশ থেকে বাংলা ভাষার উৎপত্তি। তাদেরকে কে বোঝাবে যে অপভ্রংশ মানে যদি ভাষার বিকৃত রূপ হয় তাহলে আর্যরা এসব জনপদে পদার্পণ করার আগেই, তাদের সংস্কৃত ভাষার সাথে পরিচিত হবার বা সংস্কৃত ভাষা বিকৃত করার সুযোগ এই জনপদবাসীর মিললো কিভাবে। আর্যদের আসার আগেই তো এ জনপদের বাসিন্দারা আলেকজান্ডারের সেনাবাহিনীকে পশ্চাদাপসরণের সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য করার মতো গংগরীড়ই সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন [R.C. Majumder, History of Bangal, I, P-41-42] তাদের কি নিজস্ব কোন ভাষা ছিল না ! ভাব প্রকাশের মাধ্যম, কোন না কোন ভাষা ছাড়া যূথচারী মানুষেরাও বনের পশু শিকার করতে পারে না। এ জনপদবাসীরা সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা ও প্রশাসন পরিচালনা করলো কিভাবে? নিশ্চয়ই তাদের ভাষা ছিল। পূর্বী অপভ্রংশ নয় পূর্বী প্রাকৃত এবং গৌড়ীয় অপভ্রংশ নয় গৌড়ীয় প্রাকৃতই ছিল এ জনপদবাসীর ভাষা। সে ভাষাই কালে বিবর্তিত ও সমৃদ্ধ হয়ে বৌদ্ধ সভ্যতার যুগে দোহা ও চর্যাপদের বাহনের রূপ নেয়। গৌতম বুদ্ধের বাণীর এতদ্দেশীয় ব্যাখ্যামূলক গ্রন্থসমূহ এ ভাষাতেই রচনা করেছিলেন নালান্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইসচ্যান্সেলর সোনারগাঁয়ের শীলভদ্র এবং বিশ্ববরেণ্য বৌদ্ধ পন্ডিত মুনশীগঞ্জের অতীশ দীপংকর ও তাঁদের অনুসারীরা। ১ শত ২০ বছরব্যাপী সেন রাজত্বের আমলে পীড়ন–নির্যাতন নিধনের মুখে বৌদ্ধ পন্ডিতেরা নিজেদের রচনাসম্ভার বগলে নিয়ে তিব্বত চীনে পালিয়ে গিয়ে প্রাণরক্ষা করেন। সেই শতাব্দীতে সংস্কৃত পন্ডিতদের

www.nagorikpathagar.org

দৌরাত্ম্যে সেকালে গঠনশীল বাংলাভাষার শ্বাসরুদ্ধ হয় ঠিকই, কিন্তু মুসলমানেরা এ দেশের শাসনভার হাতে নিয়েই অনার্য বৌদ্ধ ও শূদ্রদেরকে মানবিক মর্যাদা দানের সাথে সাথে তাদের মুখের জবানেরও পৃষ্ঠপোষকতা শুরু করেন। সে পৃষ্ঠপোষকতার ফলেই বাংলা ভাষায় নতুনভাবে সাহিত্য রচনার জোয়ার আসে। জনগণের তথা মূল বাসিন্দাদের ভাষার সাথে আরবী-ফার্সী-তুর্কী শব্দাবলীর সমাহারে গড়ে ওঠে মুসলমান শাসনামলের সমৃদ্ধ বহমান বাংলা ভাষা। আর সেই বাংলা ভাষার আধুনিক লিপি বা বর্ণমালা প্রবর্তন করেন গৌড়ে অবস্থান কালে সম্রাট শের শাহ্। ঈসা খান ও তাঁর পুত্র মুসা খান বাংলা ভাষার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে ফার্সীর পাশাপাশি বাংলাকেও দরবারে স্থান দেন। [তারিখে বাংগালা, পৃঃ ২৫; রীয়াজুস সালাতীন (অনুবাদ) পৃঃ ২৫৭, সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা, ১৩৪৫ বংগাব্দ, ১ অধ্যায়, পৃঃ ৪৪] সুতরাং বাংলা ভাষার সমৃদ্ধি ঘটে মুসলমানদের হাতেই।

ছয়টি জনপদকে মিলিয়ে বাংলা নামের দেশ ও জাতীয়তার পরিচিতি গঠন করেন মুসলমানেরা, বাংলা ভাষার উৎকর্ষ ঘটান মুসলমানেরা, ঠিক তেমনি বাংলা সালের প্রবর্তনও ঘটে মুসলমানদের হাতেই। সুবে বাংগালায় মুঘল শাসনের প্রথম পর্ব পর্যন্ত ফসলে খাজনা আদায় হতো। মুসলমান শাসকেরা হিজরী সাল অনুসরণ করতেন। হিজরী সালের বছর ৩৫২ দিনে হওয়ায় ছয় ঋতুর দেশ বাংলাতে খাজনার হিসাব ও আদায় বিঘ্নিত হতো। এ কারণেই সম্রাট আকবরের নির্দেশে ৯৬৩ হিজরী সালে বাংলায় ফসলী সন চালু হয় সৌর বছরের ৩৬৫ দিনের হিসেবে। সে ফসলী সালই বাংলার আবহাওয়ার অনুকূল হওয়ায় কালে বাংলা সাল বলে গণ্য হয়।

* প্রবন্ধটি ১৩৯৫ বাংলা সালের ১লা বৈশাখ দৈনিক ইনকিলাব নববর্ষ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়।

www.nagorikpathagar.org

সোনার বাংলার সন্ধানে

সোনার বাংলা বলে উচ্চারিত একটি মুখরোচক শব্দ এখনো সুরেল সংগীতের মতো আমাদের অনেকের অন্তরকে মোহাবিষ্ট করে। দুধে ভাতে বাংগালী, মাছে ভাতে বাংগালী, একথাগুলো ভাবতে কারো কারো মনে মৃদু গর্বের সঞ্চার হয়, কেউবা হাই তুলে দীর্ঘশ্বাস ফেলেন।

কিন্তু আসল ব্যাপারটা কি? সোনার বাংলা কি এখন আছে, না কোন দিন ছিল?

বায়তুল মোকাররমে ঝুড়ি ভরে জুয়েলারী কিনতে স্বেদসিক্ত রমনীকুলের কিছুসংখ্যক ভাগ্যবান কর্তারা ছাড়া সবাই সাক্ষ্য দেবেন, সোনার বাংলা এ দেশের সোনার হরিণ। রাজধানীকে তিলোত্তমা সাজিয়ে বিদেশীদের বোকা বানাবার জন্যে আমাদের তৎপরতা যতই বৃদ্ধি পাচ্ছে, সারা বাংলা দুঃখ দারিদ্র্যের কষাঘাতে বিবস্ত্র হয়ে রেশরম গতবের উৎকট অস্থি-পাঁজর দেখিয়ে ততই আমাদেরকে লানতগুজার করছে।

বর্তমান বিশ্বে সোনারবাংলা সবচেয়ে গরীব দেশ। বৈদেশিক সাহায্য তথা ভিক্ষাই আমাদের জাতীয় জীবনের অবলম্বন-অনেক বিদেশীর দৃষ্টিতে জাতি হিসেবে আমরা খয়রাতখোর, আমাদের মাঝে যারা চালাক চতুর, সমাজের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অংগনে যারা নেতৃত্ব দিতেছেন তাদের অনেকেই খয়রাত চোর। খয়রাতখোরি ও খয়রাত চুরিতে আমরা অদ্বিতীয়।

এ তো আজকের অবস্থা। একাত্তরে স্বাধীনতা পতাকা উড়াবার পরেও কি আমরা সোনার বাংলার কোলে ঠাঁই পেয়েছিলাম। অন্ততঃ প্রথম পাঁচ বছরে তো নয়ই। তখনো এ দেশ আন্তর্জাতিক বাজারে স্বীকৃতি পেয়েছিল 'তলাহীন ঝুড়ি' বলে; এমন একটি পাত্র যার মধ্যে দান খয়রাতের মাল ফেললেই তলায় হা করা 'চাটার দলে' গোগ্রাসে গিলে পাচার করে নিমেশেই সব শেষ করে দেয়। সে ধারা এখনো অব্যাহত। তাই, বিশ বছর সাঁতার কেটেও আমরা এক ইঞ্চি এগোতে পারিনি। কি জাতীয় উৎপাদন, কি বৈদেশিক ঋণ, কি দায়শোধ পরিস্থিতি, কি শিক্ষার মান ও পরিমাণ-সবদিক দিয়ে এখনো আমরা ১৯৬৯ সালের তুলনায় কিছু এগিয়ে আছি; তবে সামনের দিকে নয়, পেছনের দিকে।

www.nagorikpathagar.org

১৯৬৯ সালেও কি আমরা সোনার বাংলার সোনার ছেলে ছিলাম? কই, না তো! তখনো আমরা দেখেছি এবং বলেছি, সোনার বাংলা শ্মশান হয়ে গেল। তখনো আমরা দেখেছি এবং বলেছি, স্বৈরাচারী মুসলিম লীগ, পাকিস্তানী দালাল গোষ্ঠী আর পাকিস্তানী বাইশ পরিবার মিলে সোনার বাংলাকে শ্মশান করে দিয়েছে।

তবে কি ১৯৪৭ সালে, পয়লা দফা স্বাধীন হবার সময়ে এ দেশ সোনার বাংলা ছিল? ইতিহাস তো তা বলে না। সারা বাংলায় 'ম্লেচ্ছ মুসলমান' আর 'অস্পৃশ্য শূদ্র' সন্তানদের রক্ত–অস্থিতে গড়া বাংলার রাজধানী কোলকাতা মহানগরী ও তার আশেপাশের সমস্ত শিল্প–কারখানা যখন বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের সহায়তায় বর্ণহিন্দু বাবুরা কেড়ে নিলেন তখনো সোনার বাংলা ৭০ হাজার টন চাউল ও ৩০ হাজার গম খাদ্যে ঘাটতি ছিল। হিন্দুস্থানের কাছে সিন্ধু প্রদেশের পাওনা ১১ হাজার টন চাউল পূর্ববঙ্গকে দেওয়ার দাবী করা সত্ত্বেও নেহেরু সরকার তা না দেয়ায় এখানে খাদ্যাভাব দেখা দিয়েছিল। [Jarry Calling & Dominique Lapierre, Freedom at Midnight, P. 171] ১৯৪৯ সালেও 'সোনার বাংলায়' দুর্ভিক্ষ হয়েছিল–হয়েছিল ভূক মিছিল। প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলীর গাড়ীতে ছুঁড়ে মারা হয়েছিল ছেড়া জুতা।

ত্রিশের দশকে কি এই বাংলা 'সোনার বাংলা' ছিল? ছিল না। ছিল না বলেই ১৯৩৮ সালে দায়িত্ব গ্রহণ করেই বাংলার প্রধানমন্ত্রী মওলবী ফজলুল হককে রেংগুন থেকে খাদ্য আমদানী করে বন্যাকবলিত বাংলার গরীব মুসলমান ও শূদ্র সাধারণকে বিনামূল্যে ও ভর্তুকি মূল্যে সরবরাহ করতে হয়েছিল। বর্ণহিন্দু জমিদার মহাজনদের শোষণে–নির্যাতনে সর্বহারা ভূমিদাস, ক্ষেতমজুর, কুলি, কামিন, মুটে–মজুর, কোচোয়ান–গাড়োয়ান 'ম্লেচ্ছ' ও 'অস্পৃশ্য' বাংগাল'দেরকে বাঁচাবার জন্যে ঋণ সালিসি ও প্রজাস্বত্ব আইন পাস করতে হয়েছিল। তার আগের তিন দশকে সোনার বাংলার চেহারা তো আরো উৎকট। উপর তলায় বসা বৃটিশ প্রভুরা শোষণের ডিপ টিউবওয়েল দিয়ে এ দেশের রস–রক্ত যতদূর শুষে নেবার তা তো নিয়েছেই, তাদের পোষ্যপ্রাণী বর্ণহিন্দু জমিদার–মহাজনদের খাজনা–বাজনা, সুদ তস্যসুদ চাবুক আর জুতো পেটায় হাড়জিরজিরে মুসলমান ও শূদ্র সমাজ তখন কৃষক ও খাতক সম্মেলন, সমাবেশ ও বিদ্রোহের মধ্যে দিয়ে 'কৃষক সমিতি'· 'প্রজা সমিতি' ও কৃষক প্রজা সমিতির নেতৃত্বে মরণপণ লড়াইয়ে লিপ্ত। সোনার বাংলার সেই সোনার সন্তানদের ৭৫ শতাংশ লোকও তখন দু'বেলা 'ননু–লংকা পান্তা ভাত' জোটাতে পারেনি। নিজেরা গামছা পরেছে, ছেলেমেয়েরা উলংগ থেকেছে, বৌ–ঝিয়েরা

www.nagorikpathagar.org

ভাগাভাগি করে 'ডুমা' (চার/ছয় হাত লম্বা দেড় হাতবহরের এক প্রকার মোটা শাড়ী) পরেছে। সোনার হরিণও স্বপ্নে দেখা যায়। বাংলার মানুষের চোখে স্বপ্ন দেখার শক্তিও তখন ছিল না।

তবু তো 'সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি' গানটি তখনই লেখা হয়েছিল, ১৯০৩ সালে। এ গান যিনি লিখেছিলেন, ঠিকই লিখেছিলেন– তাঁর জন্ম হয়েছিল সোনার চামচ মুখে নিয়েই। বৃটিশ অনুগ্রহে ব্যাংক অব ইন্ডিয়ার স্বত্ত্বাধিকারী বহুসংখ্যক ব্যবসা–শিল্প প্রতিষ্ঠান ও কয়লা খনির মালিক প্রিন্স দ্বারিকা নাথ ঠাকুরের পৌত্র, জোড়া সাঁকোর জমিদার কবি রবীন্দ্রনাথও তৎকালীন অন্যান্য কোলকাতায়ী বাবু বুদ্ধিজীবীদের মতোই বাংগালী ও বাংলা বলতে শুধুমাত্র শিক্ষিত 'সংস্কৃতিবান' বর্ণহিন্দু সমাজকেই বুঝতেন। মর্লিমিন্টো শাসন সংস্কারের পর বাংগালী মুসলমানেরা বাংলার লোকাল বোর্ড, জেলা বোর্ড, পৌরসভা ও গভর্ণরের উপদেষ্টা পরিষদে প্রবেশাধিকার পাবার পরই কেবল তিনি এদেশে মুসলমানদের অস্তিত্ব অনুভব করতে শুরু করেন এবং ১৯১৯ সালে মন্টেগু চেমনফোর্ড শাসন সংস্কারের ফলে বাংলার প্রশাসনে মুসলমানদের প্রাধান্য ফিরে আসার সম্ভাবনা দেখা দেয়াতে ১৯১৮ সাল থেকে 'কালান্তরের' প্রবন্ধগুলোতে মুসলমানদের প্রতি উদার আচরণের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন–তার আগে ৫৮ বছর বয়স পর্যন্ত তিনিও তাঁর কোন লেখাতেই মুসলমানদেরকে বাংগালী বা মানুষ বলে মেনে নেন নাই। যাহোক, তখনো বৃহত বাংলার শতকরা বিশ জন বর্ণহিন্দুর জন্য সোনার বাংলা থাকলেও বাংলার সাধারণ মানুষের জীবনে সোনার বাংলা ছিল না। তবু স্বদেশ প্রেম ঈমানের অংশ–এ প্রবাদের অনুসারী মুসলমান সমাজ দুঃস্থ–দরিদ্র বাংলাকেই দাদা–পরদাদাদের কাছে শোনা এককালের 'সোনার বাংলা' ভেবে তার দুঃখে কেঁদেছেন।

উনিশ শতকের আগা–গোড়াই বর্ণহিন্দু বাবুদের সোনার বাংলা ছিল আরেকটু বেশী আরাম দায়িনী–নির্ঝঞ্ঝাট। ম্লেচ্ছ মুসলমান ও অস্পৃশ্য শূদ্ররা একবারেই মনুষ্য পদবাচ্য ছিল না। এ দু'টি হতভাগ্য ভূমিস্মাৎ সম্প্রদায়ের বুকের উপর পূর্ব পুরুষের পেতে দেয়া জাজিমে –তোষকে শুয়ে বসে কাটানো তাদের জীবন ছিল একেবারেই নিরুপদ্রব। তাদের রচিত কবিতা, প্রহসন, গল্প, উপন্যাসের সর্বত্রই দেখা যায় বাবুদের জীবনে কেবল তিনটি কাজই ছিল– আহার, নিদ্রা ও মৈথুন; মৈথুনের প্রয়োজনে স্বকীয়া ও পরকীয়ার ছড়াছড়ি। এ সবের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের কোন অভাব তারা বোধ করতেন না এবং তা তাদের উপার্জন করতেও হতো না। প্রয়োজনের আগেই ডাকপিয়নই পৌঁছে

www.nagorikpathagar.org

দিতো। জমিদার, মহাজন, নায়েব, গোমস্তাদের সব বাড়ীতেই খাদ্যের ছিল ছড়াছড়ি। উনিশ শতকের পাঁচের দশকের কবি ঈশ্বর গুপ্ত ভোজনে-রমনে মুখর 'বাংগালী' পরিবারের রকমারী ব্যাঞ্জন-ব্যাসন উপাচারের যে বর্ণনা দিয়েছেন তা মুখস্ত করাও রীতিমতো সময়সাধ্য ব্যাপার। তাদের একাধিপত্যের সোনার বাংলা তখন স্বর্গীয় দেবতাদের অনুসরণে লীলালাস্যে মুখরিত থাকলেও বৃহত বাংলার সবটাই তখন অশিক্ষার অন্ধকারে আচ্ছন্ন। অন্ধকারের আড়ালে 'নেড়ে ও নমোর' বীভৎস ভাগাড়। শূদ্রের ভয়াল শ্মশানের পাশাপাশি মুসলমানদের নিঝঝুম গোরস্তানের নিঃশব্দ শান্ত পরিবেশ।

আঠারো শতকের ক্রান্তিলগ্নে এপার-ওপার মিলিয়ে চার দশক, তখন কি সোনার বাংলা ছিল? হ্যাঁ, তখন একসোনার বাংলার অভ্যূদয় ঘটছিল; আরেক সোনার বাংলা অর্ধ-শতাব্দীব্যাপী শঠতা-বঞ্জনা, লুটতরাজ, সংঘাত-সংঘর্ষ, যুদ্ধ-বিগ্রহের অশ্রু ও রক্তের সয়লাবে সৃষ্ট দুর্গন্ধপুরীষ কদর্মের নীচে তলিয়ে যাচ্ছিল। নতুন সোনার বাংলা মাথায় করে নিয়ে এগিয়ে আসছিলেন যারা তাদের মধ্যে ছিলেন (১) লক্ষ্মীকান্ত বড়াল, (২) দত্তরাম দত্ত, (৩) রাম মোহন পাল, (৪) মথুরা মোহন সেন, (৫) নিত্যচরণ সেন, (৬) রাম সুন্দর পাইন, (৭) স্বরূপ চাঁদ, (৮) জগমোহন শীল, (৯) আনন্দ মোহন শীল, (১০) স্বরূপ চাঁদ আঢ্যা, (১১) কানাই লাল বড়াল, (১২) সনাতন শীল, (১৩) রাজা রাম মোহন রায়, (১৪) দর্প নারায়ণ ঠাকুর, (১৫) লক্ষ্মীকান্ত ধর ওরফে নকুড় ধর, (১৬) মতিলাল শীল, (১৭) দ্বারিকা নাথ ঠাকুর (১৮) রামহরি বিশ্বাস, (১৯) সুখময় রায়, (২০) রাম চরণ রায়, (২১) রাজা নবকৃষ্ণ প্রমুখ নব্য কোটিপতিবৃন্দ ও তাদের বিশ্বস্ত অনুগত সাথী-স্যাঙাতেরা। [এম আর আখতার মুকুল কোলকাতা বুদ্ধিজীবি পৃঃ]

তবে সেই সোনার বাংলার ভেতরটা ছিল রাংতায় ভরা; বাইরে দু'আনা আন্দাজ সোনার পালিশ এদের এনে দেয়া নব্য সোনার বাংলার ইংগ-বংগ শিক্ষা-সংস্কৃতিতে বেড়ে ওঠা উনিশ শতকীয় বাবু বুদ্ধিজীবীরা নিজেদের গৌরব-গাঁথা রচনায় ব্যস্ত ছিলেন। সেকালে তাদের কোন লেখায় হারিয়ে যাওয়া সোনার বাংলার জন্য কোনরূপ দুঃখ প্রকাশ তো দূরের কথা, সে সম্পর্কিত উল্লেখও দেখতে পাওয়া যায় না। বাবুদের সোনার বাংলায় তাঁদের প্রতিষ্ঠিত পবিত্র শিক্ষাঙ্গনে মুসলমান ও শূদ্রদের আপন বৈশিষ্ট্য নিয়ে প্রবেশের অধিকার না থাকায় সাহিত্য-ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রেও তারা ছিলেন অনুপস্থিত। ফলে আসল সোনার বাংলার পুরা খবরই গুম হয়ে যায়। বাবু বুদ্ধিজীবীরা সে ইতিহাস ভালভাবেই জানতেন। সে যুগের ফারসী ভাষায় লিখিত ও রক্ষিত ইতিহাস

www.nagorikpathagar.org

তারা পড়তে পারতেন। তাছাড়া পিতা-পিতামহদের সূত্রে তারা তা অবহিতও ছিলেন। তবু তারা তা গুম করে গেছেন। এটা বাবুদের ভুল ছিল না-ছিল তাদের সচেতন প্রয়াস। কেননা, সোনার বাংলা যে সত্যি সত্যি এককালে ছিল এবং তা ছিল ১৭৫৭ সালের পূর্বে একটানা ৫ শত বছর ধরে-এ কাহিনী প্রকাশ পেলে স্বভাবতঃই প্রশ্ন উঠতো, সেই সোনার বাংলার বিলুপ্তি ঘটলো কিভাবে, কবে, কাদের দ্বারা, কাদের যোগসাজশে? কথা উঠতো, এ ক্ষেত্রে যারা অপরাধী, নিশ্চিতভাবেই তারা বাংলার জনসাধারণের, বাংলার দুশমন।

কিন্তু বাবুরা বাংলার ইতিহাস গুম করলেও বাইরের পৃথিবীতে তা গোপন ছিল না। প্রাচ্যের মহাচীন, মধ্যপ্রাচ্যের মুসলিম জাহান এবং ইউরোপ মহাদেশের নানান দেশ থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে ব্যবসায়ী ও পর্যটকেরা আসতেন সোনার বাংলায়। তাদের ভ্রমণ কাহিনীতে বিধৃত হয়ে আছে সোনার বাংলার সমৃদ্ধির আসল চিত্র। এমনকি ইংরেজ পন্ডিতেরা নিজেদের রচনায় লুঠতরাজকে জাষ্টিফাই করার জন্য বানোয়াট ইতিহাস দাঁড় করালেও তাদের বাণিজ্যিক লেন-দেনের হিসাব সংক্রান্ত পত্রাবলী ও ব্যক্তিগত চিঠিপত্রে সোনার বাংলা শ্মশান বানাবার কার্যক্রমের প্রমাণ গেঁথে রয়েছে। ইতালীর বণিক লুডোভিকো ডি বার্থেমা, ফরাসী বণিক জীন ব্যাপটিস্ট ট্যাভারনিয়ার, ফরাসী বণিক পর্যটক ফ্রাংকয়েস বার্ণিয়ার, ওলন্দাজ বণিক স্টাভোর্ণিয়াস, মরক্কোর মুসাফির ইবনে বতুতা, পর্তুগীজ বণিক পর্যটক দুয়ার্তে বারবোসা ও সিবাস্তিয়ান মানরিক প্রমুখের সফরনামা গ্রন্থগুলো প্রকাশিত হবার ফলে সোনার বাংলার অকল্পনীয় সম্পদ ও সমৃদ্ধির কাহিনী পলাশী যুদ্ধের দুই-এক শত বছর আগে থেকেই ইউরোপীয় বুদ্ধিজীবী মহলে মশহুর ছিল। বিশ্বব্যাপী সাম্র্যাজ্যবাদী শোষণবিরোধী আন্দোলনের অগ্রনায়ক মনীষী কার্ল মার্ক্স এসব সূত্রের বরাতেই উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে তার তথ্য-সমৃদ্ধ রচনায় দেখিয়ে দেন যে, ভারতের তথা বাংলার অপরিমেয় পুঁজি ও বিত্তসম্পদ লোপাট-পাচার হয়েই বৃটিশ বিশ্ব-বাণিজ্যের পুঁজি গঠন করেছে-সোনার বাংলার সমৃদ্ধি স্থানান্তরিত হয়ে বৃটেনকে সমৃদ্ধ করেছে। তা সত্ত্বেও বাংলার বাবু বুদ্ধিজীবীরা বিষয়টি এড়িয়ে গেছেন-অনেকে আবার বিকৃত ব্যাখ্যা দাঁড় করাবার প্রয়াসও পেয়েছেন। এটা না করে তাঁদের উপায় ছিল না। কেননা এ বিষয় নিয়ে ঘেঁটাঘেটি করতে গেলে লোপাট-পাচারের বিশ্বস্ত দালাল হিসেবে তাঁদের পূর্বপুরুষদের চরিত্র সামনে এসে যায়।

চলতি শতকের চতুর্থ দশক অবধি সোনার বাংলা হারিয়ে যাওয়ার সব কাহিনীই এভাবে বাংলা সাহিত্য ও ইতিহাসে অনুচ্চারিত ছিল। ইতিহাস গবেষণার মতো শিক্ষা ও পান্ডিত্য তখনো বাংলার কোন মুসলমান ঘরের কোন

www.nagorikpathagar.org

怀圣寺大殿内景 হোয়াইশেং মসজিদের প্রধান হলরুম

'পূর্ব পুরুষের মাযার' – এর প্রবেশ–দ্বার
先贤古墓正门
(হযরত আবুওয়াক্কাসের (রাঃ) মাযার)

陵园前通道 'পূর্ব পুরুষের মাযার' – এর প্রবেশ পথ

www.nagorikpathagar.org

懷聖寺

广州市伊斯兰教协会编印

সৌজন্যেঃ অধ্যাপক হাসান আবদুল কাইয়ুম

www.nagorikpathagar.org

সন্তান আয়ত্ত করতে পারেন নাই। তবে চল্লিশের দশকেই হাওয়া ঘুরতে শুরু করলো। বিশ-ত্রিশের দশকে জন্ম নেয়া ও চল্লিশ-পঞ্চাশের দশকে উচ্চ শিক্ষা লাভের সুযোগপ্রাপ্ত বাংলার কয়েকজন বুদ্ধিজীবী-যারা শৈশবে বর্ণহিন্দুদের হাতে মুসলমান সমাজের অমানুষিক নির্যাতন স্বচক্ষে দেখেছেন এবং পিতা-পিতামহের শ্রুতি পরম্পরায় মুসলিম শাসনামলের সোনার বাংলার গৌরব গাঁথা শুনেছেন-তারা অক্লান্ত পরিশ্রমে হারানো ইতিহাসের কিছু কিছু অধ্যায় উদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছেন। বিদেশী পর্যটকদের ভ্রমণ কাহিনী ছাড়াও তাঁরা দু'শো বছরের জমাট আঁধারে হাতড়ে এদেশে রচিত অনেক মূল্যবান গ্রন্থেরও সন্ধান পেয়েছেন। অবশ্য এ সন্ধানপ্রাপ্ত গ্রন্থাবলীর সবগুলো তাদের হাতে আসেনি-রেফারেন্সই শুধু এসেছে গ্রন্থপরম্পরায়। সন্ধানপ্রাপ্ত গ্রন্থগুলোর মধ্যে রয়েছেঃ (১) আবুল ফজলের 'আকবর নামা', (২) নিজাম উদ্দিনের 'তাবকাত-ই-নাসিরী', (৩) আবদুল কাদের বদায়ূনীর 'মুনতাখাব আল তাওয়ারিখ', (৪) সম্রাট বাবুরের আত্মজীবনী, (৫) ফিরিশতার তাওয়ারিখ, ৯৬) মুহম্মদ সাদিকের 'সুব-ই-সাদিক, (৭) মীর্জা নাথনের 'বাহারিস্তান-ই-গায়বি', (৮) শিহাব উদ্দিন তালিশের 'তারিখ-ই- মুলক-ই-আসাম' ও 'ফাতেহয়া-ই-ইবরিয়া', (৯) ইউসুফ আলীর 'আহওয়াল-ই-মহব্বতজঙ্গ', (১০) ইব্রাহীম খানের 'তারিখ-ই-বাংগালা', (১১) করম আলীর 'মুযাফফরনামা', (১২) গোলাম হোসেন তাবাতাবাঈর 'সিয়ার-উল-মুতাখখেরীন, (১৩) সলিমুল্লাহর 'তারিখ-ই-বাংগালা' (১৪) গোলাম হোসেন সলীমের 'রিয়াজুস সালাতিন', (১৫) মুহম্মদ ওয়াফার 'ওয়াকিয়াত-ই-ফাতেহ বাংগালা' (১৬) মীর মুহম্মদ মাসুমের 'তারীখ-ই-মাসূমী', (১৭) আহমদ কুলী সাফাবীর 'তারীখ-ই-আলমগীরী', (১৮) আবদুল লতিফের 'হাফত-ই-কলিম', (১৯) এলাহী বখশের 'খুরশীদ জাহান নুমা', (২০) খাফি-খানের মুনতাখাব আল লুবাব, (২১) কল্যাণ সিংহের 'খুলাসাত-উল-তাওয়ারিখ', (২২) সুজন রায়ের 'খুলাসাত-উল-তাওয়ারিখ', (২৩) সতরমান কায়েতের 'চাহার গুলশান' এবং (২৪) প্রদেশের তথ্য সরবরাহকারী অফিসারদের সাপ্তাহিক, পাক্ষিক ও মাসিক রিপোর্টের সংকলন ও (২৫) রায়তদের প্রতি সরকারী অফিসারদের প্রদত্ত নির্দেশাবলীরসমাহারইত্যাদি।

বিক্ষিপ্তভাবে পাওয়া বৌদ্ধ দোহা, চর্যাপদ ও পদাবলীর সূত্র ধরে বাংলার লিখিত ইতিহাস পাওয়া যায় মোটামুটি ১৩ শত বছরের। এর ভেতর ৫ শত ৫৫ বছর মুসলিম শাসনামল-তার মধ্যেও প্রায় ৩৭২ বছর স্বাধীন সুলতানী আমল। মুসলিম শাসনামলের শেষ দেড় শত বছরের অধ্যায়ে তৎকালীন বিশ্বের সবচেয়ে

www.nagorikpathagar.org

শিক্ষিত দেশের একটি ছিল বাংলাদেশ–এবং এখানকার মুসলমান সমাজে নারী–পুরুষ কেউই অশিক্ষিত ছিল না। এরূপ বিপুলসংখ্যক শিক্ষিতের দেশে সাড়ে ৫ শত বছরের অধ্যায় নিয়ে মাত্র ২৫, ৫০ বা ১০০ খানি ঐতিহাসিক তথ্য সম্বলিত গ্রন্থ প্রণীত হবার কথা নয়। এরূপ বিপুল পরিমাণ তথ্য–উপাত্ত এখনো দক্ষিণ এশীয় উপমহাদেশের ভেতরে ও বাইরের পৃথিবীতে বহু বহু গ্রন্থ ও দলিল দস্তাবেজে ছড়ানো–ছিটানো অবস্থায় পড়ে আছে। পিতৃপুরুষের গৌরবগাঁথা আহরণের অহংকার নিয়ে কয়েকজন তরুণ যদি এ কাজে ব্রতী হন তবে আমাদের উজ্জ্বল ইতিহাস–ঐতিহ্যের ধারক সোনার বাংলার সঠিক চিত্র ভাস্বর হয়ে ফুটে উঠতে খুব বেশী সময় লাগবার কথা নয়। রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা পেলে এ কাজ আরো সহজসাধ্য হবে।

কিন্তু অসুবিধার জড় অন্যখানে। মুসলিম সন্তানেরা সোনার বাংলার সঠিক চিত্র উদ্ধারে আগ্রহী একথা বুঝতে পেরে চল্লিশের দশক থেকে বাবু বুদ্ধিজীবীরাও বিশেষভাবে তৎপর হয়ে উঠেছেন। সোনার বাংলার আর্শিতে তাদের পুর্ব পুরুষদের চেহারা লোলুপ হিংস্র কুটিল–কঠিন মানবেতর রূপ নিয়ে ধরা দিতে বাধ্য। এ কারণে তারা গত কয়েক দশক ধরে দ্বিমুখী কার্যক্রম অনুসরণ করেছেন। নিজেরা রূপকথাধর্মী পৌরণিক গাল–গল্পকে ইতিহাস–ঐতিহ্যরূপে দাঁড় করাবার আপ্রাণ চেষ্টায় রত থেকেও মুসলিম সন্তানদেরকে ঐতিহ্য–বিমুখ 'অসাম্প্রদায়িক' 'প্রগতিশীল' হবার নসিহত করছেন এবং মুসলিম সন্তানদেরকে আরবী–ফারসীতে লেখা ইতিহাস–চর্চায় নিস্পৃহ করে নিজেরাই সে–পথে অগ্রসর হচ্ছেন কপট উদ্ধৃতিবহুল বিকৃত ব্যাখ্যা সম্বলিত ইতিহাস দাঁড় করাবার জন্য। এই 'মহৎ' উদ্দেশ্যেই কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের প্রধান শ্রী মাখন লাল রায় চৌধুরী কেবল আরবী শিখেছেন তাই নয়, আল আজহার বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আরবীতে উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ করে, মূর্তি পূজায় বিশ্বাসী থেকেও 'মওলানা' হয়েছেন।

তারা নিজ ঐতিহ্যের শিকড় কৃত্রিমভাবে মজবুত করার প্রয়োজনে ইতিহাসের বানোয়াট কাহিনী তৈরী করবেন, আর আমরা নগদ স্বার্থে খয়রাত–খোরি ও খয়রাত–চুরির অভ্যাসে অভ্যস্ত থেকে সেগুলো গোগ্রাসে গিলে জাবর কাটবো! আমাদের নতুন প্রজন্ম এ হীনমন্যতা থেকে মুক্তি পেলেই কেবল আমরা আশা করতে পারি যে, হারিয়ে যাওয়া সোনার বাংলার সঠিক চিত্র একদিন আমরা দেখতে পাবো।

www.nagorikpathagar.org

সোনার বাংলার অঙ্গনে

দেশ বলতে একটি নির্দিষ্ট ভূ-খন্ডকে বুঝায়। কিন্তু তাই বলে উন্নত দেশ বলতে কোন উন্নত ভূমিকে অর্থাৎ পাহাড়-পর্বতের উপরিভাগে অবস্থিত ভূ-খন্ডকে বোঝায় না; বোঝায় সম্পদ-সম্ভারে সমৃদ্ধ দেশকে। তবে সে সমৃদ্ধি কেবল প্রাকৃতিক সম্পদের প্রাচুর্য থেকেই আপনা-আপনি আসে না। দেশের ভিতর প্রচুর সম্পদ থাকলেই সে দেশকে সম্পদশালী বলা গেলেও উন্নত দেশ বলা যায় না। বর্তমান বিশ্বে আফ্রিকা ও মধ্যপ্রাচ্যের অনেকদেশই সম্পদশালী। কিন্তু তাদের কোনটিই উন্নত নয়। দক্ষ জনশক্তির সফল প্রয়োগে প্রাকৃতিক সম্পদের ঋদ্ধি এবং তাকে ভিত্তি করে সুখী, সুন্দর, শান্তিপূর্ণ ও নিরাপদ পরিবেশ গড়ে উঠলেই কেবল সংশ্লিষ্ট দেশকে উন্নত দেশ বলা চলে। উন্নত দেশের পূর্বশর্ত তাই সংশ্লিষ্ট দেশের জনগোষ্ঠীর মনন ও মেধা তথা সুপ্ত গুণাবলীর পরিশীলিত বিকাশ অর্থাৎ শিক্ষার মাধ্যমে সাংস্কৃতিক উৎকর্ষ সাধন।

শিক্ষাই সমৃদ্ধির মূল দ্যোতক, আর সমৃদ্ধিই দেশ ও জাতির উন্নতির মাপকাঠি। এ কারণেই শিক্ষিত দেশগুলোই উন্নত, উন্নত দেশগুলোই শিক্ষিত। ১৭৫৭ সালের পূর্ববর্তী সোনার বাংলা ছিল সমৃদ্ধ ও উন্নত বাংলাদেশ। সোনার বাংলাকে জানতে হলেও তাই আমাদেরকে প্রথম জানতে হবে সোনার বাংলার জনগোষ্ঠীকে এবং তাদের মন-মস্তিষ্ক, মনন ও মেধাকে শানিত করার মাধ্যম শিক্ষা-ব্যবস্থাকে।

প্রথমেই জনগোষ্ঠীর পরিচয়ের প্রশ্ন এসে যায়। তেরো শতকের শেষভাগ অবধি এসে যারা সোনার বাংলা গড়ে তুলতে সক্ষম হলেন, পূর্ববর্তী বারো ও এগারো শতকে তারা কোথায় কিভাবে ছিলেন। কোন্ জীবন-কাঠির ছোঁয়ায় তারা সোনার মানুষে পরিণত হয়েছিলেন?

সোনার বাংলা স্রষ্টা অধিবাসীরা ছিলেন চলতি শতকের গোড়ার দিকে শোষিত, নির্যাতিত, লাঞ্ছিত-ঘৃণিত, 'ম্লেচ্ছ' মুসলমান ও 'অস্পৃশ্য' শূদ্র সম্প্রদায়েরই পূর্বপুরুষ। সোনার বাংলার মোট জনসংখ্যার সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ ছিলেন মুসলমান, অবশিষ্টেরাও প্রায় সবই অনার্য বাংগালী শূদ্র সম্প্রদায়। স্বল্প সংখ্যক ছিলেন আদিশূর এবং সেন রাজাদের আমলে আমদানীকৃত সেই পশ্চিমা কুলীন সামন্ত বর্ণহিন্দুদের বংশধর-যাদের বর্ণবাদী চাবুক-চেড়ির আঘাতে,

www.nagorikpathagar.org

শোষণে-পেষণে এগারো-বারো শতকে বাংলার সংখ্যাগরিষ্ঠ বৌদ্ধ এবং সেই সাথে অনার্য শূদ্র ও ধর্মান্তরিত স্থানীয় মুসলমানদের নাভিশ্বাস উঠেছিল। আদিশূরের আমলে ও সেন যুগে আমদানীকৃত ও উৎপাদিত কুলীনদের সাথে ষোড়শ শতকের শেষ দশকে নতুনভাবে যোগ দিয়েছিলেন মোগল আমলের সাম্রাজ্যবাদী মোগলাই মুসলমানেরা এবং মোগলাই শাহজাদা, আমীর-উমরার কাঁধে ঝুলে, ঘাড়ে চড়ে হেরেম-বালাদের আঁচল ধরে আগত সুরা ও নারীর যোগানদার রাজপূত, মাড়োয়ারী কাশ্মীর ও উত্তরভারতীয় রাজা মহারাজারা। সমাজের উপর তলায় এসব খান্দানী মোগলাই ও কুলীন বর্ণহিন্দু চরিত্রের ব্যক্তিদের গর্বিত পদচারণা থাকলেও নীচের তলায় তেরো শতক পর্যন্ত বিরাজ করছিল বৃহত্তর জনজীবনে অনার্য বাংগালী বৌদ্ধ ও তফসিলী হিন্দু সমপ্রদায়ের পাশাপাশি, রাসূলুল্লাহ মুহম্মদ (সঃ) এর জীবদ্দশায় তাঁরই প্রেরিত সাহাবা হজরত আবু ওয়াক্কাস (রাঃ) এবং তাবেয়ী হজরত মোহাইমেন প্রমুখ আরব প্রচারকবৃন্দের ও পরবর্তীকালে আগত মুসলিম বণিক ও সুফী দরবেশদের হাতে দীক্ষাপ্রাপ্ত এই দেশের নানা নিভৃত পল্লীতে বসবাসরত স্থানীয় মুসলমান সম্প্রদায় এবং তেরো শতক থেকে আঠারো শতক পর্যন্ত ক্রমবর্ধিষ্ণু হারে ধর্মান্তরিত ও বহিরাগত মুসলমানের সমন্বয়ে গঠিত বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমান।

বাবু ঐতিহাসিকদের বর্ণনামতে ১২০২ সালে তলোয়ার-বল্লমধারী তাতার ঘোড়সোয়ার হিসাবে বাংলায় মুসলমানদের প্রথম আবির্ভাব ঘটে এবং তার আগে এদেশে মুসলমানদের অস্তিত্ব ছিল না। কিন্তু আমরা জানি বাংলার ৩৫০ বছর ব্যাপী স্বাধীন সুলতানী আমলে দিল্লীর সম্রাটদের সাথে সুলতানদের অন্তত কয়েক কুড়ি যুদ্ধ হয়েছে এবং তার কোন কোনটিতে ৫০ হাজার থেকে ১ লক্ষাধিক সৈন্য সুলতানের পক্ষে যুদ্ধ করেছে। তাদের ভেতর রাজা গণেশ ও তার কিছু সংগীসাথী ছাড়া কখনো কোন হিন্দু সেনানায়ক বা সৈনিকের নাম জানা যায় নাই। তা'হলে এসব সৈন্যরা কি সবই তুর্কিস্তান, তাজাকিস্তান, আফগানিস্তান থেকে আগত? তারা কি তাদের পরিবার-পরিজনদেরকেও সেখান থেকে কাঁধে করে বা অশ্বপৃষ্টে বয়ে এনেছিলেন? অথবা সারা মুল্‌কের মানুষ রাতারাতি মুসলমান হয়ে গিয়েছিল?

এ পর্যন্ত প্রাপ্ত এদেশী ঐতিহাসিক তথ্যে এর সংগত ব্যাখ্যা পাওয়া যায়নি। কিন্তু রসুলে আকরম (দঃ)-এর আমল থেকে পরবর্তী দেড় শতাব্দীব্যাপী ইসলাম প্রচার বিষয়ক হাদিসের ইতিহাস রিজাল শাস্ত্র ও তৎকালীন অন্যান্য

www.nagorikpathagar.org

বিপুল তথ্যভান্ডার থেকে সাম্প্রতিক গবেষণায় এ সম্পর্কিত কিছু কিছু সত্য আবিষ্কৃত হতে শুরু করেছে।

তাতেই প্রকাশ পেয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (দঃ) রোমান ও পারস্য সম্রাটদেরকে ইসলাম কবুলের দাওয়াত পাঠাবার মতোই প্রাচ্যজগতে ইসলামের দাওয়াত পৌঁছাবার জন্য তাঁর মামা, মা আমিনার চাচতো ভাই এবং কাদেসিয়া যুদ্ধের বিজয়ী সেনাপতি সাদ বিন আবু ওয়াক্কাসের পিতা সাহাবা হজরত আবু ওয়াক্কাস মালিক ইবনে ওয়াইব (রাঃ)কে প্রেরণ করেন।

মক্কায় কুরায়িশদের হাতে নির্যাতিত মুসলমানদের আবিসিনিয়ার হাবাশায় হিজরত শুরু হয় নবুয়তের প্রথম বছর (৬১০ খৃষ্টাব্দে)। সপ্তম বছরই (৬১৭ খৃষ্টাব্দে) হযরত আবু ওয়াক্কাস (রাঃ) সম্রাট নাজ্জাসীর দেয়া সমুদ্রগামী জাহাজ নিয়ে বের হয়ে পড়েছিলেন। তাঁর সাথে ছিলেন সাহাবী হযরত কায়েস ইবনে হুযায়ফা (রাঃ), হযরত ওরওয়াহ ইবনে আছাছা (রাঃ) এবং হযরত আবু কায়েস ইবনুল হারেছ (রাঃ) [মুহিউদ্দিন খান, বাংলাদেশে ইসলাম প্রচার ঃ কয়েকটি তথ্যসূত্র, ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা, ২৭ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, পৃ ৩৪৫–৫১)।

প্রাচীন পৃথিবীতে প্রাচ্য–পাশ্চাত্য সামুদ্রিক বাণিজ্য ছিল আসিসিনিয়া, ইয়েমেন ও আরবদের নিয়ন্ত্রণে। লোহিত সাগরতীরের 'জার' এবং 'হাবাশা' বন্দর থেকে তারা পশ্চিমে মিসর ও পূর্বে ভারত, বাংলা, আরাকান, মালয়েশিয়া, সুমাত্রা, জাভা, বোর্ণিও হয়ে চীনদেশ পর্যন্ত যাতায়াত করতেন এবং পণ্য সম্ভার আদান–প্রদান করতেন। পারস্য উপসাগরীয় বন্দর অধুনালুপ্ত 'ওবুল্লা' থেকেও পশ্চিমে ভায়া ইরাক স্থলপথে ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে এবং পূর্বে কেরালা বাংলা জাভাদ্বীপের পথে চীন অবধি আরবদের বাণিজ্য বিস্তৃত ছিল। [সৈয়দ সুলায়মান নদভী, আরব নৌবহর, অনুঃ হুমায়ুন খান পৃঃ ৩,৫] পূর্ব দিকে রওয়ানা হয়ে তারা ১ম মঞ্জিল দক্ষিণ ভারতের মালাবার (আরবী নাম মায়বার অর্থাৎ পারঘাট; পশ্চিমঘাট ও পূর্বঘাট) উপকূলের কেরালা কালিকট অঞ্চলে জাহাজ ভিড়াতেন। সেখান থেকে উপকূল বেয়ে সিংহল অতিক্রম করে দক্ষিণ–পশ্চিম মওসুমী বায়ুতে পাল খাটিয়ে মাত্র ৪ দিনে সরাসরি বাংলামুল্‌কে হাজির হতেন। মাদ্রাজ ও নাগপুর সংলগ্ন উপকূলের পানির নীচে অনেক চোরা–গোপ্তা শৈলশ্রেণী থাকায় এভাবে সরাসরি না এসে তাদের উপায় ছিল না। বাংলার গংগা ব্রহ্মপুত্রের মোহনায় অবস্থিত তৎকালীন প্রাচ্যের অন্যতম প্রধান বন্দর

www.nagorikpathagar.org

'সামান্দার' ও 'শাতিলগাঙ' চট্টগ্রাম এ বিরতি দিয়ে তারা রায়ু প্রবাহ পরিবর্তনের প্রতীক্ষা করতেন এবং জাহাজের প্রয়োজনীয় মেরামতির কাজ সেরে নিতেন। অতঃপর উত্তর-পশ্চিম বায়ু প্রবাহে পাল উড়িয়ে তারা দক্ষিণ-পূর্ব এশীয় দেশগুলোতে হাজির হতেন এবং সেখান থেকে আবার দক্ষিণা বাতাসে উপকূল বেয়ে অগ্রসর হয়ে চীনদেশের ভূ-খন্ডে অবতরণ করতেন। ফেরার পথে একই ভাবে দক্ষিণ এশীয় উপকূল বেয়ে অগ্রসর হয়ে পূর্ব-দক্ষিণা বাতাসে পাল উড়িয়ে 'শাতিলগাঙ' ও 'সামান্দার-এ এসে বিশ্রাম নিতেন ও জাহাজ মেরামতির কাজ সেরে শীতকালীন উত্তুরে বাতাসে পাল খাটিয়ে সরন্দীব (শ্রীলংকা)-এর পাশ দিয়ে এগিয়ে মালাবার উপকূল ধরে উত্তর দিকে অগ্রসর হয়ে সময় ও সুযোগ মতো আরব সাগর পাড়ি দিতেন।

আরব অঞ্চলের অধিবাসীদের জীবিকার একটি প্রধান সূত্র সামুদ্রিক বাণিজ্য হওয়ায় সামুদ্রিক জাহাজী জীবনের সাথে তারা খুবই পরিচিত ছিল। এ কারণেই, তাদের কাছে সহজগ্রাহ্য হবে বিধায়, আল-কুরআনের বহু স্থানে 'ঝটিকা বিক্ষুব্ধ সমুদ্র', 'তরংগ সংকুল সমুদ্রে বিপন্ন জাহাজ' 'শীত ও গ্রীষ্মের অনুকূল বায়ু প্রবাহের অবদান'; এরূপ বিপদে 'বিপন্ন জাহাজীদের মনের অবস্থা', তাদের কাতর প্রার্থনা, আল্লাহর অনুগ্রহ ও বিপদমুক্তির পর জাহাজীদের মনের অবস্থার দৃষ্টান্ত পেশ করা হয়েছে। এগুলো আরবদের অপবিচিত থাকলে বারংবার প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্তরূপে পেশ করা হতো না।

'চীনা ভাষায় সে-দেশে-ইসলামের আগমন সম্পর্কিত যেসব তথ্যসূত্র রয়েছে, তা থেকে জানা যায় যে, খৃষ্টীয় ৬২৬ সনের কাছাকাছি কোন একটি সময়ের (হিজরী ৩ সনে) মধ্যেই চীন-উপকূলে ইসলাম প্রচারকগণ অবতরণ করেন। দলের নেতা ছিলেন রসুল (সঃ)-এর মাতুল। তাঁর সাথে রসুলুল্লাহর আরো তিনজন সাহাবী ছিলেন। দলনেতা হযরত আবু ওয়াক্কাস (রাঃ) ক্যান্টন বন্দরে অবস্থান করেন। তাঁর দ্বারা প্রতিষ্ঠিত কোয়াংটা মসজিদটি পরবর্তীকালীন ভক্তদের প্রচেষ্টায় সুরম্য রূপ লাভ করে এখনো সমুদ্রতীরে সুউচ্চ মিনার নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। মসজিদের অদূরেই তার কবর গত প্রায় চৌদ্দ শত বছর ধরে চীনা মুসলমানদের সর্বাপেক্ষা পবিত্র ও প্রিয় জিয়ারতগাহ রূপে গণ্য হয়ে আসছে। তারা এ দু'টির নাম রেখেছে "পূর্ব পুরুষের মসজিদ" এবং "পূর্ব পুরুষের মাযার"। অন্য দু'জন সাহাবী উপকূলীয় ফু-কীন প্রদেশের চুয়ান-চু বন্দরের নিকটবর্তী লিং নামক পাহাড়ের উপর সমাহিত রয়েছেন। চতুর্থ জন দেশের অভ্যন্তরভাগে চলে গিয়েছিলেন বলে উল্লেখ আছে। [পূর্বোক্ত]

www.nagorikpathagar.org

হিজরী তৃতীয় শতকের বিশিষ্ট মুহাদ্দিস ইমাম আবাদান মারওয়াজীর বর্ণনা অনুযায়ী হযরত আবু ওয়াক্কাস মালিক ইবনে ওয়াইব (রাঃ) নবুয়তের ৫ম সনে হাবাশায় হিজরত করেন এবং নবুয়তের ৭ম সনে ৩ জন সাহাবী ও কয়েকজন হাবশী মুসলমানসহ দু'টি সমুদ্রগামী জাহাজ যোগে চীনের পথে রওয়ানা হয়ে যান।

৬১৭ খৃষ্টব্দে রসুলের (সঃ) মদীনা হিজরতের ৬ বছর আগে তাঁরা হাবাশা থেকে রওয়ানা হন এবং ৬২৬ খৃষ্টাব্দে হিজরী তিন সালে তাঁরা চীনদেশে উপস্থিত হন। স্বাভাবিক যাত্রায় ৪/৫ মাসের পথ তারা ৯ বছরে অতিক্রম করেন। অর্থাৎ দীর্ঘ সাড়ে ৮ বছর পথিমধ্যে ইসলাম প্রচারে অতিবাহিত করেন।

হিজরী ৪র্থ শতকের দক্ষিণ-ভারতীয় লেখক শয়খ যয়নুদ্দীন লিখিত বিখ্যাত গ্রন্থ 'তোহফাতুল মোজাহেদীন'-এ উল্লিখিত আছে যে, মালাবার অঞ্চলের একজন রাজা স্বেচ্ছায় ইসলাম গ্রহণ করেন এবং মক্কায় গমন করে রসূলে আকরমের (সঃ) খেদমতে হাজির হন। বক্তব্যের সমর্থনে তিনি মালাবারের জনজীবনের মধ্যে ব্যাপকভাবে প্রচলিত সংস্কার ও প্রবাদেরও উল্লেখ করেন। [মোহাম্মদ আকরম খাঁ, মোছলেম বঙ্গের সামাজিক ইতহাস, পৃঃ ৪৯] কোলকাতা থেকে প্রকাশিত বাংলা 'বিশ্বকোষ' গ্রন্থের প্রথম দিকের সংস্করণে ১৪শ খন্ডে ২৩৪ পৃষ্ঠায় বলা হয়ঃ পুরাবৃত্ত পাঠে জানা যায় যে, চেরর (কেরল বা কেরালা) রাজ্যের শেষ রাজা চেরুমল পেরুমল ইচ্ছাপূর্বক সিংহাসন পরিত্যাগ করিয়া মুসলামান ধর্ম গ্রহণ অভিলাষে মক্কা নগরীতে গমন করেন। অবশ্য ইসলাম ও মুসলমান সম্পর্কিত যাবতীয় ঐতিহাসিক তথ্য বিকৃত করার বাবু-মানসিকতার দরুন বিশ্বকোষের সাম্প্রতিক সংস্করনের পৃষ্ঠায় "পুরাবৃত্ত পাঠে" কথাটা বদল করে তদস্থলে "কথিত আছে যে" এই শব্দত্রয় ব্যবহার করে ঘটনাটির এতিহাসিকতা লাঘবের চেষ্টাও তাঁরা করেছেন। [বিশ্বকোষ পৃঃ ৪০৩] তবে তামিল ভাষায় প্রাচীন পুঁথিপত্রে রাজা পেরুমলের ইসলাম গ্রহণ ও মক্কা গমন বিষয়ে অনেক কাহিনী রয়েছে এবং মোপলা মুসলমানদের ঘরে ঘরে তা আলোচিত উচ্চারিত হয়।

প্রাপ্ত অন্যান্য সূত্রগুলো সব মিলিয়ে দেখলে বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, হযরত আবু ওয়াক্কাসের নেতৃত্বে ইসলাম প্রচারক দল রসুলুল্লাহর (সঃ) মদীনায় হিজরতের আগেই, তাঁর মক্কা অবস্থান কালেই, প্রাচ্য সফরের পয়লা মঞ্জিল

www.nagorikpathagar.org

মালাবার উপকূলে উপনীত হন। তাদের কাছে রাজা পেরুমল ইসলাম কবুল করেন এবং রসূলের কাছে সাক্ষাৎ বয়াত গ্রহণের জন্য মক্কা গমন করেন। এভাবে রাজা, তাঁর পারিষদ বর্গ ও কিছু কিছু জন–সাধারণকে ইসলামে দীক্ষা দানের পর হজরত আবু ওয়াক্কাস (রাঃ) চীন দেশ অভিমুখে অগ্রসর হন। এ পথে তাঁকে ২য় মঞ্জিল বাংলা মুলুকের 'সামান্দার' বা 'শাতিল গাঙ' বন্দরের কোন একটিতে অবশ্যই হাজির হতে এবং যাত্রা বিরতি করতে হয়েছে। ইসলাম প্রচারই ছিল তাঁদের লক্ষ্য এবং সেকারণে ৪/৫ মাসের পথে ৯ বছর কাটিয়ে দিয়েছেন। এমতাবস্থায় সামান্দার ও শাতিলগাঙে তাঁরা ৯ মাসও অবস্থান করেন নি এটা অসম্ভব। আর তা করে থাকলে ৯ মাসে ৯ জন বাংলাদেশীকেও কি তাঁরা ইসলামে দীক্ষা দেন নাই?

এভাবে এই চার সাহাবার হাতে ইসলাম কবুল করা এদেশীয় তাবেয়ীগণ এবং পরবর্তীকালে আগত আরব বণিক ও সুফীদের মাধ্যমে বাংলায় ইসলাম প্রচারিত হয় হিজরী সপ্তম শতকের ২য় দশক থেকে ১২০২ সাল পর্যন্ত। [বিস্তারিত দেখুন, মুহিউদ্দিন খান, "বাংলাদেশে ইসলাম প্রচারঃ কয়েকটি তথ্যসূত্র", ইসলামিক ফাইন্ডেশন পত্রিকা, ২৭ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা পৃঃ ৩৪৫–

এছাড়া জানা যায় যে, খলিফা হযরত উমরের আমলে (হিজরী ১৩–২৪ সাল) দু'জন তাবেয়ী মুসলিম মুহম্মদ মা'মুন ও মুহম্মদ মোহাইমেন বাংলা মুলুকে ইসলাম প্রচার করতে আসেন। তাদের পর খৃষ্টীয় ৭ম ও ৮ম শতকে হামেদুদ্দিন, হোসেন উদ্দিন, মুহম্মদ মোর্তজা, মুহমদ আবদুল্লাহ ও মুহম্মদ আবু তালিব নামক পাঁচজন মো'মেনের একটি দলও এদেশে আসেন। বলা হয়ে থাকে যে, বিভিন্ন সময়ে এরূপ পাঁচটি দল বাংলা মুলুকে ইসলাম প্রচার করেন। প্রবল জনশ্রুতি রয়েছে যে, হযরত বায়েজীদ বোস্তামী (রহঃ) ৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে চট্টগ্রামে, সুরতান মাহমুদ মাহী সওয়ার ওরফে শাহ সুলতান বলখী ১০৪৭ খ্রীষ্টাব্দে নেত্রকোনায়, বাবা আদম শহীদ রাজা বল্লাল সেনের আমলে বিক্রমপুরে, ফরিদউদ্দিন গঞ্জশকর (১১৭৭–৮৯) চট্টগ্রামে এবং শাহ মখদুম রূপোস ১১৮৪ খ্রীষ্টাব্দে রাজশাহী অঞ্চলে অবস্থান করে জনসাধারণের কাছে ইসলামের দাওয়াত পৌছান। এসব ফকির দরবেশদের মাজার ও খানকার খাদেমেরা এবং ভক্ত মুরীদেরা তাঁদের সম্পর্কে যেসব তথ্যাবলী বংশপরম্পরায় ধরে রেখেছেন তদ্বিষয়ে যুক্তিনির্ভর গবেষণা হলে অনেক অজানা ইতিহাস উদ্ধার করা সম্ভব হবে।

www.nagorikpathagar.org

দশম শতকের বিশ্ববিশ্রুত আরব ভূগোলবিদ আবুল কাসিম উবায়দুল্লাহ বিন খুরদাজবীহের (মৃত্যু ৯১২ খৃঃ) বর্ণনায় জানা যায় যে, ইসলাম-পূর্ব যুগেই আরব-ইয়েমেনী-আবিসিনীয় বণিকেরা সন্দ্বীপের দক্ষিণ উপকূল থেকে এক দিনের পথ উত্তরে এবং কামরুত (কামরূপ) থেকে ১৫/২০ দিনের পথ দক্ষিণে, গংগা-ব্রহ্মপুত্র-মেঘনার সংগমস্থলের পার্শ্বে 'সামান্দার' (সামান+দার= পন্যাগার) বন্দরে আসা-যাওয়া করতেন। [কিতাব আল্ মাসালিক ওয়াল মামালিক (অনুবাদ-ই, জে, ব্রিল ১৮৮৯), পৃঃ ৬৩-৬৪; মূল আরবী গ্রন্থের উদ্বৃতি, মোহর আলী, দি হিস্টোরী অব দি মুসলিমস অব বেংগল, পৃঃ ৩০]। বিশ্ববিখ্যাত আরব পর্যটক ও ভূগোলবিদ আবু আবদুল্লা আল ইদ্রিসীও (মৃত্যু ১১৬৪ খৃঃ) উল্লেখ করেছেন যে, 'সামানদার' ছিল মুসলিম আরবদের প্রাচ্য বাণিজ্যে পণ্য সংগ্রহের একটি প্রধান বন্দর। তারা এখান থেকে চাউল এবং আভ্যন্তরীণ নৌ-পথে কামরুত (কৌম+হারুত=কৌমরুত থেকে কামরুত; কামার্ত মূর্তিপূজকদের হাতে কামরূপ) হতে আগর ও চন্দন কাষ্ঠ সংগ্রহ করতেন [আল-ইদ্রিসী, নুজহাত আল্ মুশতাক (অনু-Eliot, The Arab Geographers) , পৃষ্ঠা, ৯০-৯১]

কালক্রমে ব্রহ্মপুত্রের 'লৌহিত্য' নামীয় দুইটি প্রাচীন ধারাই পলিপাতের দরুণ নাব্যতা হারিয়ে ফেলায় কামরূপ বন্দরও বিলুপ্ত হয়। কিন্তু শিলং-এ প্রাপ্ত প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনসমূহ এই স্বাক্ষরই বহন করে যে, কামরূপ ছিল ইতিহাসের উষালগ্নে আরব বাণিজ্যের এক বৃহৎ নৌ-বন্দর। [নাজির আহমদ, বাংলাদেশঃ ইতিহাস ও ঐতিহ্য, সাহিত্য-সাময়িকী, দৈনিক ইত্তেফাক, ৬ই শ্রাবণ, ১৩৯৬ বাং]। আরব বণিকেরা সরন্দীব (শ্রীলংকা) হতে দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ুর আনুকূলে ৪ দিনে সামান্দার পৌছতেন এবং সেখান থেকে লৌহিত্য-সাগর (মোমেনশাহী-সিলেটের হাওর অঞ্চল) হয়ে লৌহিত্য (ব্রহ্মপুত্র) নদীর উজান ঠেলে ১৫/২০ দিনে কামরূপ হাজির হতেন। বণিকদের জাহাজে আগত সূফী-দরবেশদের সহবতে এসে বাংলায় নওমুসলিমের সংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে বাংলা-আরব সম্পর্কও ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠতে থাকে এবং বাংলার অভ্যন্তরে নদী-নালা খাল-বিলের তীর ছুঁয়ে বিদ্যমান সবুজ-শ্যামল পল্লীপ্রান্তের নানা স্থানে অসংখ্য ছোট ছোট মুসলিম জনবসতি গড়ে ওঠে। এভাবেই আজকের সাভার-সেকালের সাবাউর (সাবা+উর) অর্থাৎ 'ইয়েমেনি বসতি'-র উদ্ভব ঘটে। উত্তর ও পশ্চিম বাংলা গুপ্তসাম্রাজ্যভুক্ত হবার আগে-পরে কয়েক শতাব্দী ধরে পরমতসহিষ্ণু ও ধর্মীয় প্রশ্নে উদারনীতির অনুসারী ভদ্র বংশ, খড়গ বংশ, চন্দ্র বংশ, দেব বংশ ও পাল বংশীয় বৌদ্ধ শাসকদের আমলে বাংলা মুল্ক

www.nagorikpathagar.org

তৎকালীন বিশ্বে বৌদ্ধ শিক্ষা-সংস্কৃতি-সভ্যতার পীঠস্থান ছিল। কিন্তু এক শতাব্দী স্থায়ী ব্রাহ্মণ্যবাদী সেন বংশীয় দুঃশাসনের সৃষ্ট অন্ধকার ভেদ করে তার কোন আলোকচ্ছটা আমাদের কাছে পৌছতে পারেনি। তেমনি সপ্তম থেকে ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্যন্ত সময়ে বাংলার প্রত্যন্ত অঞ্চলে গড়ে ওঠা মুসলিম জনবসতিগুলোর ইতিহাসও কালের গর্ভে হারিয়ে গেছে।

কিন্তু তা সত্ত্বেও ১৯৮৫ সালে গাইবান্ধার পল্লীতে বাঁশঝাড়ের টিবির তলায় পাওয়া "প্রায় আস্ত একটা মসজিদে'র নির্মিতি-ফলক [মুহিউদ্দিন খান, পূর্বোক্ত] এবং সৈয়দপুরের পল্লী 'গড়গ্রাম'-এ প্রাপ্ত একটি মসজিদের নির্মিত-ফলক [মেহরাব আলী, "১২৩ হিজরীর শিলালিপি", ইসলামিক ফাইন্ডেশন পত্রিকা, মে-জুন ও জুলাই-আগষ্ট সংখ্যা, ১৯৮০] থেকে যেটুকু প্রমাণ বেরিয়ে এসেছে তাও রীতিমতো বিস্ময়কর। গাইবান্ধার মসজিদটির নির্মাণ কাল ৬৯ হিজরী (৬৮৭ খৃঃ) এবং সৈয়দপুরের মসজিদটি নির্মিত হয় ১২৩ হিজরীতে (৭৪৫ খৃঃ)। এসব সূত্র ধরে প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধান ও গবেষণার বিরাট অবকাশ রয়েছে। সে দায়িত্ব আমাদের তরুণ প্রজন্মকেই পালন করতে হবে।

আজকের বাংলা মুলুক বা বাংলাভাষী অঞ্চলের ভূ-প্রকৃতি থেকে হাজার-দেড় হাজার বছর আগের ভূ-প্রকৃতি ছিল একেবারেই আলাদা। আজকের রাজশাহী-পাবনা-ঢাকা এবং নদীয়া-কুষ্টিয়া-ফরিদপুর বৃহত্তর জেলাগুলোর সীমানা নির্দেশ করে বিদ্যমান পদ্মা সেদিন প্রমত্তা নদী ছিল না। কিংবা ঢাকা-মোমেনশাহী এবং রংপুর-বগুড়া-পাবনা বৃহত্তর জেলাগুলোর সীমানা নির্দেশক আজকের বিশাল যমুনা নদীরও কোন অস্তিত্ব ছিল না। গাইবান্ধা থেকে দক্ষিণে বর্তমান যমুনা-কালীগঙ্গা-করতোয়ার চৌমুহনা অবধি দূর অতীতের কোন মরা নদীর ক্ষীণস্রোতা রেখা থাকলেও থাকতে পারে। কিন্তু উক্ত চৌমুহনা থেকে গোয়ালন্দ অবধি এবং গাইবান্ধার উত্তরে কয়েক মাইল অবশ্যই উঁচু স্থল ভাগ ছিলো। গাইবান্ধার উত্তরে দক্ষিণমুখী ব্রহ্মপুত্র গারো পাহাড়ের পাশ দিয়ে পূর্বমুখী হয়ে একবার কিশোরগঞ্জের হাওর এলাকা ছুঁয়ে, আর একবার মধুপুর জংগলের সীমারেখা ধরে লাংগলবন্দের পাশ দিয়ে বুড়িগংগার সাথে মিলিত হতো। জলপাইগুড়ির ভেতর দিয়ে নেমে আসা পশ্চিমমুখী তিস্তা (ত্রি-স্রোতা) নদী তিন স্রোতে বিভক্ত হয়ে পুনর্ভবা, আত্রাই ও করতোয়ার সাথে মিলিত ছিল। ১৭৮৭ সালে, ফকির বিদ্রোহের শেষ পর্যায়ে এক বন্যায় তিস্তার প্রবাহ পূর্বমুখী হয়ে গাইবান্ধার দক্ষিণে অবস্থিত সাবেক মরা নদীর খাত দিয়ে বইতে শুরু করে এবং ব্রহ্মপুত্র নদের প্রবাহও তার সাথে মিলিত হয়ে বর্তমান যমুনা নদীর

www.nagorikpathagar.org

জন্ম দেয়। উপরোক্ত সাবেক মরা নদীর খাতটিই আরো এক হাজার বছর আগে গাইবান্ধার উত্তর-পশ্চিম দিক দিয়ে (যে-খাতে বন্যার পর তিস্তার স্রোত প্রবাহিত হয়) বয়ে অন্য কোন নদী ছিল কি না- তা আজ অজ্ঞাত। গংগা নদী কয়েক দফা খাত বদলের পর চতুর্দশ শতাব্দীতেও রাজমহলের প্রায় বিশ মাইল উত্তর-পূর্ব দিক দিয়ে রাজধানী গৌড় বা লক্ষণাবতীকে দক্ষিণ তীরে রেখে, মহানন্দা ও পুনর্ভবার স্রোতকে আত্মস্থ করে নিয়ে, দক্ষিণ-পূর্ব দিকে অগ্রসর হয়ে, ভাগিরথীর উৎপত্তিস্থলে দ্বি-খণ্ডিত হবার পর রাজশাহী শহর পেরিয়ে সোজা পূর্বমুখী এগিয়ে নাটোরের দক্ষিণে দীর্ঘ আত্রাই ও ক্ষুদ্র হ্রস্ব যমুনা নদীর সাথে মিলে যমুনা নাম ধারণ করে, গংগা সাগরের (বর্তমান চলন বিল) ভেতর দিয়ে আরো অগ্রসর হয়ে করতোয়া নদীর সাথে মিলিত হতো এবং সেই স্রোতধারা কালীগংগার রূপ নিয়ে বুড়িগংগার (মূল গংগা) পথে বাংগালা (বাংলাবাজার কি?) বন্দরের দক্ষিণে ব্রহ্মপুত্রের প্রবাহের সাথে মিলিত হতে। দিনাজপুর, রংপুর, রাজশাহী বগুড়াসহ সমগ্র উত্তর বাংলা বিধৌত করে করতোয়া, আত্রাই ও পুনর্ভবার খরস্রোত প্রবল বেগে প্রবাহিত হতো। সামান্দার ও বাংগালা বন্দরের মাধ্যমে আরব মুসলিম বণিক ও প্রচারকেরা নও মুসলিমদের সাথে নিয়ে বুড়িগংগা, কালীগংগা, করতোয়া, বর্তমান যমুনার তলদেশের মৃতবিস্মৃত নদী, আত্রাই-এর পথে উত্তর বাংলার মধ্যাঞ্চলে এবং ব্রহ্মপুত্র, লৌহিত্য-সাগর, লৌহিত্য নদীর পথে পূর্ব বাংলার এবং উত্তর বাংলার পূর্বাঞ্চলেও হাজির হয়েছেন। তাদের সান্নিধ্যে এসে এসব অঞ্চলে মুসলিম বসতি ও মসজিদ গড়ে উঠেছে।

মরক্কোর মুসাফির ইবনে বতুতা ঈসায়ী ১৩৪০ সালে মুলুকে বাঙ্গাল বা সুলতানাতে বাংগালা, এবং পর্তুগীজ পর্যটক দুয়ার্তে বারবোসা ১৫১৮ সালে 'বেংগালা' সফর করে দেখতে পান যে, বন্দরের অধিকাংশ বাসিন্দা ছিলেন আরব, আবিসিনীয় ও ইরানী মুসলমান। বাংগালা বন্দরে তারা সপরিবারে বসত করেন এবং এদেশ থেকে চাউল, কাপড়, চিনি ও অন্যান্য পণ্যসামগ্রী সংগ্রহ করে করোমন্ডল, মালাবার, কাম্বে, পেগু, সিংহল, মলাক্কা, সুমাত্রা প্রভৃতি দেশে রফতানি করেন। [Hakluyt society, Vol II, P-144-45] ইবনে বতুতা এ বন্দর থেকেই চীনা জাহাজে চড়ে চীন দেশে গমন করেন। [ইবনে বতুতা, রিহালা] এসব আরব-ইরান-আবিসিনীয়রা কেউই ঘোড়ায় চড়ে তলোয়ার-বল্লম হাতে এদেশে আসতেন না। সুতরাং দেখা যায়, বাংলায় মুসলিম শাসন কায়েম হয় স্থলপথে উত্তর পশ্চিম দিক দিয়ে ঘোড়সোয়ারদের হাতে।

www.nagorikpathagar.org

কিন্তু তার অনেক আগেই ইসলামের আবির্ভাব ঘটে, সমুদ্রপথে দক্ষিণ-পশ্চিম দরজা দিয়ে প্রচারক ও বণিকদের মাধ্যমে।

সুরেন্দ্রনাথ বাচস্পতি, বিপিনচন্দ্র পাল, ত্রৈলোক্যচন্দ্র বসু, বিপ্লবী স্যার রাসবিহারী ঘোষ প্রমুখের নেতৃত্বে বাংলার বাবু বুদ্ধিজীবীদের প্রদত্ত বাধার মুকাবিলায় [ডক্টর আবদুল্লাহ, নওয়াব স্যার সলিমুল্লাহ, পৃঃ ১৫৯-৬০] বাংলার মুসলিম জনসাধারণের দাবীতে ১৯২১ সালে প্রতিষ্ঠিত এবং সেকারণে 'মক্কা বিশ্ববিদ্যালয়' বলে বাবু মহল কর্তৃক ব্যঙ্গবিদ্রূপকৃত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়েরই উদ্যোগে ও মঞ্জুরীতে প্রণীত ও প্রকাশিত The History of Bengal প্রথম খন্ড বা দ্বিতীয়খন্ডের কোথাও এই বাংলা-আরব বাণিজ্য সম্পর্কের বিষয়ে কোনরূপ আলোচনা নেই। কারণ, দুই খন্ড গ্রন্থেরই লেখক ছিলেন ঢাকা, কোলকাতা ও পাটনা বিশ্ববিদ্যালয় এবং বিভিন্ন কলেজে অধ্যাপনারত 'ইতিহাস বিভাগের' এবং 'সংস্কৃত ভাষা ও সহিত্য বিভাগের' (ইতিহাসের নয়) বাবু অধ্যাপকেরা। প্রথম খন্ডের ১২ জন লেখকের মধ্যে কেউ-ই মুসলমান ছিলেন না। ব্যাপারটা আপত্তিকরভাবে দৃষ্টিকটু হওয়ায় দ্বিতীয়খন্ডে ৮ জন লেখকের মধ্যে আমরণ বাবুদের প্রতি বিনীত তরুণ মুহম্মদ হবিবুল্লাহই ছিলেন একমাত্র 'মুসলমান।'

বাবুদের দেড় শতাব্দীব্যাপী প্রয়াসে সৃষ্ট অশিক্ষার অন্ধকূপের ভেতর থেকে মুসলমান সমাজ তখন সবেমাত্র তীরে উঠতে শুরু করেছে। রাজনৈতিক আন্দোলনের ভেতর দিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করতে পারলেও ইতিহাস উদ্ধারের মতো পরিপক্ক বুদ্ধিজীবী তখনো বাংলার মুসলিম সমাজে সৃষ্টি হয়নি। ফলে, ইতিহাস লিখতে বসে বাবুরা যা করার তা-ই করেছেন। ৬৮৯ পৃষ্ঠার মূল ইতিহাস গ্রন্থে সাকল্যে প্রায় ২ শত পৃষ্ঠা ভরে রেখেছেন 'সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যে'র আলোচনায়। অথচ সাড়ে পাঁচ শত বছর ধরে সরকারী-দরবারী ভাষা ফার্সী ও গণ-ভাষা বহমান বাংলা এবং হাজার বছর ব্যাপী বৌদ্ধযুগে পালি-প্রাকৃত ভাষা, তারও আগে "দস্যু" তস্কর" "ম্লেচ্ছ" "অস্পৃশ্য অনার্য-দ্রাবিড়দের "পক্ষীভাষার এই দেশে, অংশবিশেষে গুপ্তযুগে এবং সেন শাসনামলে রাজসভায় ও ব্রহ্মণ পন্ডিত সমাজে অত্যন্ত সীমিত পর্যায়ে বড়জোর দেড় শত বছর সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের চর্চা হয়েছে। "অযজ্ঞেয়" "অপবিত্র" "রৌরব" নরকের" নামাঙ্কিত এই বাংলার জনসাধারণ কোনকালেই সংস্কৃত ভাষাকে গ্রহণ করে নাই। ব্রাহ্মণ বাবুদের মগজে ও তাদের বানোয়াট ইতিহাসে ছাড়া বাংলার কোন স্থানে কোন কালে সংস্কৃত ভাষার প্রাবল্য ছিল না। গ্রীক পন্ডিত কার্টিয়াস,

www.nagorikpathagar.org

প্লুটার্ক, টলেমী, সিসিলি দ্বীপের ডিওডোরাস প্রমুখেরা খৃষ্টপূর্ব যুগে তৎকালীন বাংলা বা ভাগিরথীর পূর্বদিকে মূলগংগা (কালিগংগা–বুড়িগংগা) বা লৌহিত্য (ব্রহ্মপুত্র) তীর অবধি এলাকা নিয়ে গঠিত গংগরিড়ই রাজ্য সম্পর্কে যেটুক যা বলেছেন, বাবুরা তা খুঁজে পেয়েছেন, উল্লেখও করেছেন। কিন্তু আরব বণিকদের এতদঞ্চলে আসা–যাওয়া আদৌ তাদের চোখে পড়েনি।

তবে ইউরোপীয় বণিকেরা আরব বণিকদের পথ ও পদ্ধতি, মানচিত্র, বায়ু প্রবাহতত্ত্ব ও কম্পাস ইত্যাদি অনুসরণ করে প্রাচ্য সমুদ্রে জাহাজ ভাসাতে শুরু করেন এবং সেকারণে তারা আরব বণিক পর্যটক ও ভূগোলবিদদের গ্রন্থাবলী থেকে তথ্য গ্রহণ করেছেন। ইলিয়ট, জর্জ, ফন্ডো হুরাণী, ই· জে ব্রিল· রোজাম্বাল, ইউল, কার্ণেল, স্মীথ, ডাউসন প্রমুখ পাশ্চাত্য পন্ডিতেরা এ বিষয়ক আরবদের লেখা বহু গ্রন্থ অনুবাদও করেছেন।

যা হোক আগ্রাসী সাম্প্রদায়িকতায় সংক্রমিত বিদ্বিষ্টমনা বাবুরা এড়িয়ে গেলেও সেসব তথ্য চাপা পড়ে রয়নি। পঞ্চাশের দশকে আবির্ভূত কয়েকজন বাংগালী মুসলিম বুদ্ধিজীবীর প্রচেষ্টায় তার কিছু কিছু উদ্ধার হয়েছে। কিন্তু যেটুকু উদ্ধার হয়েছে, তাতেই বাবুদের সব কারসাজি ধরা পড়ে গেছে। বাবুরা বলেছেন, পলাশীর যুদ্ধের ভেতর দিয়েই বাংলার আর্থ–সামাজিক জীবনে "বিপ্লব" এসেছে। [An advanced history of India, Majumder, Datta & Ray, P, 661] মুসলমান শাসিত বাংলা ছিল অশিক্ষার আঁধারে ঘুরপাক খাওয়া দারিদ্র্যক্লিষ্ট বাংলা। [Sarker. the histroy of Bengal, V. II P, 373-75,417]

কিন্তু আমরা দেখতে পাই, ১৭৫৭ পূর্ববর্তী সোনার বাংলার শাসন ব্যবস্থাই কেবল মুসলমানদের হাতে ছিল না–সোনার বাংলার জনসাধারণের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশও ছিল মুসলমান। কথাটা বাংলাদেশের অনেক তরুণের কাছে অবিশ্বাস্য মনে হবে–আবার কেউবা একথা শুনে বিস্ময়াবিষ্ট হবেন। হবারই কথা। সোনার বাংলাকে শ্মশানে পরিণতকারী লুঠেরা–ডাকাতদের পার্টনার–বংশধর বৃটিশ বর্ণহিন্দু বুদ্ধিজীবীদের আত্মরক্ষা ও আত্মপ্রশংসামূলক বানোয়াট ইতিহাস পড়ে পড়ে একথাটার ঠিক বিরোধী একটি ধারণারই ভিত রচিত হয়ে আছে দীর্ঘকাল ধরে। অতিমানবিক শ্রম–সাধনায় বাংলার ইতিহাসের তথ্যাবলী উদ্ধারকারী ইতিহাসবিদ ডক্টর আবদুর রহিম তাঁর 'বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস' গ্রন্থে [অনু- মোঃ আসাদুজ্জামান ও ফজলে রাব্বী, পৃঃ ৯২–৯৮]।

www.nagorikpathagar.org

১৯৪১ থেকে ১৮৭২ সাল পর্যন্ত আদম শুমারি রিপোর্ট পর্যালোচনা করে মুসলমান ও অমুসলমান জনসংখ্যার প্রবৃদ্ধিহারের ভিত্তিতে যৌক্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে দেখিয়েছেন, ১৭৭২ সালে বাংলায় মুসলমান জনসংখ্যা ছিল মোটামুটি ৮২ লক্ষ এবং অমুসলমান (বর্ণহিন্দু, তফশিলী হিন্দু, বৌদ্ধ ও উপজাতীয় সব মিলিয়ে) জনসংখ্যা ছিল মোটামুটি ১ কোটি ৬ লক্ষ। আঠারো শতকে বাংলায় জেলা কালেক্টর পদে কর্মরত বৃটিশ সিভিলিয়ান উইলিয়াম হান্টারও বলেছেন যে, ১৭৬৯ সালের (বাংলা ছিয়াত্তরের মন্বন্তর) মহাদুর্ভিক্ষের পূর্বে বাংলার লোকসংখ্যা ছিল প্রায় ৩ কোটি, তার মধ্য থেকে ১ কোটির কিছু বেশী অর্থাৎ ষোল জনের ছয় জন দুর্ভিক্ষে মারা যায়–দুর্ভিক্ষের পর বাংলার জনসংখ্যা ছিল ২ কোটির কিছু কম। [উইলিয়াম হান্টার, এন্যালস অব রুরাল বেঙ্গল, পৃঃ ৩০; এবং দি ইন্ডিয়ান মুসলমান]।

১৭৭০ সালের বাংলার যে অর্থনৈতিক চিত্র আমরা পাই তাতে সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, বাংলার মুসলমানেরা তখন সর্বদিক দিয়ে সর্বস্বান্ত হয়ে পড়েছে। পক্ষান্তরে ইংরেজদের ছত্রছায়ায় তাদের লুণ্ঠন–সহকারী বর্ণহিন্দু রাজা–মহারাজারা বিপুল বিত্তসম্পত্তির মালিক; জগৎশেঠ পরিবার , আমীর চাঁদ প্রর্ভতি ক্রোড়পতিদের লগ্নিকৃত অর্থে বৃটিশ মালিকানাধীন একচেটিয়া ধান–চাউলের ব্যবসায়ে বেনামী অংশীদার, ম্যানেজার, নায়েব, গোমস্তা ও বেনিয়ান বর্ণহিন্দুদের গোলা, মড়াই, আড়ৎ কাচারিতে সারা বাংলার খাদ্যশস্য তখন মওজুদ ছিল। বাংলাদেশে অভাবজনিত দুর্ভিক্ষ হয় আশ্বিন–কার্তিক মাসে। সে বছর জ্যৈষ্ঠ মাসেই খাদ্যের অভাবে মানুষ মৃত মানুষের গোশত খেতে আরম্ভ করে [উইলিয়াম হান্টার, এ্যানালস অব রুরাল বেঙ্গলের অনুবাদ পল্লী বাংলার ইতিহাস, পৃঃ ২৩] বৈশাখ মাসের মধ্যে সরকারী হিসেবে মোট জনসংখ্যার এক–তৃতীয়াংশ ও জ্যৈষ্ঠ মাসের মধ্যে প্রতি ১৬ জনের ৬ জন মারা যায়। [পূর্বোক্ত, পৃঃ ২৯] । এ একটি তথ্যই প্রমাণ করে যে, দুর্ভিক্ষটি ছিল কৃত্রিম সংকটজনিত। এরূপ কৃত্রিম দুর্ভিক্ষে রাজা–মহারাজারা, তাদের আত্মীয়–স্বজন, নব্যবিত্তশালী এজেন্ট বেনিয়ানগণ, নিলামে জমিদারী খরিদকারী নতুন বর্ণহিন্দু জমিদার শ্রেণী এবং সারাদেশে ছড়িয়ে থাকা তাদের ম্যানেজার, দালাল, নায়েব, গোমস্তাকুল–কারোর গায়েই কষ্টের আঁচড় লাগার কোন কারণ ছিল না। তাছাড়া, তৎকালে গ্রাম বাংলার প্রশাসন ছিল জামিদার শ্রেণীর তত্ত্বাধানে। মোগল আমলের প্রলম্বিত ধারায় মুর্শিদকুলী খাঁর হিন্দু তোষণমূলক ভ্রান্ত নীতির পরিণতিতে ১৭৫৭ সাল পর্যন্ত ৪০ বছরে সারা বাংলার ১৬৬০টি পরগণার প্রায় সবগুলোতেই আমীল বা পরগণা প্রধান, শিকদার বা পুলিশ ও

www.nagorikpathagar.org

কানুনগো বা পরগণার ভূমিকর ও অন্যান্য রাজস্ব জরীপকার–এই শক্তিধর পদাধিকারী এবং তাদের সহকারী চৌধুরী, দারোগা ও পাইক বাহিনীর পদগুলো সর্বক্ষমতাবান রাজা–মহারাজাদের আনুকূল্যে চলে যায় বর্ণহিন্দু বাবুদের ও তাদের দলীয়দের হাতে। [শিরীন আখতার, দি রোল অব জমিন্দারস ইন বেংগল, পৃঃ ৯০–১১৪]

১৭৫৭ থেকে ১৭৬৯ সালের মধ্যে সারাদেশে বৃটিশ–বর্ণহিন্দু শোষণের রক্তবাহী পাইপলাইনগুলোর তারাই ছিলেন অতন্দ্র প্রহরী। [পূর্বোক্ত, পৃঃ ১১৫–৪৬] তাদের সক্রিয় সহযোগিতায়ই দুর্ভিক্ষ সৃষ্টি করা হয়েছিল। এ কারণে তাদেরকেও নিশ্চয়ই মরতে দেয়া হয়নি। ঈষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর সেবায় নিয়োজিত মহারাজাদের গড়ে তোলা পাইক পেয়াদা বাহিনীতে, ডিভাইড এন্ড রুল নীতি অনুসরণে, মুসলমান কারিগর ও বিত্তশালীদের ঠেংগাবার জন্য শূদ্র সম্প্রদায়কেও তাৎক্ষণিকভাবে গ্রহণ করা হয়েছিল। এমতাবস্থায় অনুমান করা কষ্টসাধ্য নয় যে, ছিয়াত্তরের কৃত্রিম মন্বন্তরে বাংলার বর্ণহিন্দু বাবুরা কেউই মারা যান নাই, শূদ্র সম্প্রদায়ের একটি অংশও তাদের নোকরিতে বহাল হয়ে প্রাণে বেঁচে গিয়েছিলেন। কিন্তু মুসলমানেরা হয়েছিলেন দুর্ভিক্ষের পাইকারী শিকার। মোট মৃত ১ কোটি লোকের মধ্যে ৭৫ লক্ষও যদি মুসলমান ধরা হয়,তাহলে দেখা যায় যে, ১৭৬৯ সালের পূর্বে বাংলায় মুসলমান জনসংখ্যা ছিল পূর্বোক্ত ৮২ লক্ষ+মৃত ৭৫ লক্ষ = ১ কোটি ৫৭ লক্ষ এবং অমুসলমান রাজা–মহারাজা বর্ণহিন্দু, 'অচ্ছুৎ' শূদ্র ও অন্যান্যদের মিলিত সংখ্যা ছিল ১ কোটি ৬ লক্ষ+মৃত ২৫ লক্ষ = ১ কোটি ৩১ লক্ষ। সোজা কথায়, বাংলায় তখন মুসলমানেরাই ছিলেন সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়।

লাগামহীন লুটতরাজ, জুলুম–নির্যাতন ও পরিকল্পিত মন্বন্তরে তাদেরকে হত্যা করে এবং পরবর্তীকালে নানাভাবে সে ধারা বহাল রেখে সংখ্যাগুরু মুসলমানদেরকে সংখ্যালঘুতে পরিণত করা হয়।

সুতরাং নির্দ্বিধায় বলা চলে, সোনার বাংলা ছিল মুসলমান ও অনার্য শূদ্র জনসাধারণের বাংলা। তারা ছিলেন দক্ষ জনশক্তি। নিজেদের দক্ষ হাত আর পরিশীলিত মনন ও মেধার পরশেই তারা মাটির বাংলাকে সোনার বাংলায় পরিণত করেছিলেন। মুসলিম শাসন কায়েমের পূর্ববর্তী এক শতাব্দীর বাংলা ছিল ব্রাহ্মণ্য শাসনে দষ্ট–পিষ্ট বাংলা, মুসলমান শাসনের পরবর্তী ২ শত বছর ছিল বৃটিশ ব্রাহ্মণ্যবাদী শোষণে–নির্যাতনে নিঃশেষিত বাংলা।

www.nagorikpathagar.org

প্রশ্ন উঠতে পারে, মাটির মানুষগুলো সোনার বাংলা গড়ার জন্য সোনার মানুষে পরিণত হয়েছিল কোন্ যাদুর কাঠির পরশে ? উত্তর খুবই ছোট্ট, ইসলামের মানবিক মূল্যবোধ ও সার্বজনীন শিক্ষার ছোঁয়ায়। মূল্যবোধও আসলে শিক্ষণীয় ও আচরণীয় বিষয়। তাই আরো সংক্ষেপে বলা চলে, বাংলার ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থাই সোনার বাংলা গড়ার মাল-মসলার জোগান দিয়েছিল।

চলতি শতকের চল্লিশের দশক পর্যন্ত কোলকাতায়ী বাবু বুদ্ধিজীবীদের লেখা ইতিহাস সোনার বাংলার শিক্ষা ব্যবস্থার প্রকৃতি ও কাঠামো সম্পর্কে একেবারেই নির্বাক। আর ইংরেজ সাহেবরাও মুসলমান আমলের শিক্ষা ব্যবস্থাকে সংক্ষেপে 'এ্যারাবিক এন্ড পার্সিয়ান মাদ্রাসা' বলেই পাশ কাটিয়ে গেছেন। মুসলিম বাংলায় কতগুলো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছিল একথা তারা সরাসরি উল্লেখ না করলেও কতগুলো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তারা ধ্বংস করতে সক্ষম হয়েছিলেন, তার একটি জরিপ সম্পন্ন করার জন্য ১৮৩৫ সালে তারা 'এ্যাডমস্ কমিশন' গঠন করেন। কমিশনের রিপোর্টে বলা হয় যে, উক্ত সময়ের পূর্বে বাংলা ও বিহারে ৪ কোটি অধিবাসীর জন্য ১ লক্ষ প্রাইমারী বিদ্যালয় ছিল- তাতে স্পষ্টভাবে এরূপ মন্তব্যও করা হয় যে, মুসলমান শাসনামলে এরূপ বিদ্রালয়ের সংখ্যা আরো অনেক বেশী ছিল [জেমস লং, এডামস রিপোর্ট পৃঃ ১৮, ২৯, ৪০-৪২]। বিশ্ববিশ্রুত জার্মান প্রাচ্য-বিশারদ ম্যাক্সমুলারও গত শতাব্দীতে প্রকাশ করেন যে, "বাংলায় ইংরেজ শাসন প্রতিষ্ঠার ৩০ বছর পূর্বেই ৮০ হাজার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সরব ছিল।" [মওলানা উবায়দুল্লাহ সিন্ধীর 'শাহ ওয়ালিউল্লাহ আওর উনকি ইকতেসাদী তাহকিক' গ্রন্থে ম্যাক্সমুলারের উদ্ধৃতি, অনু-নূরুদ্দীন আহমদ, পৃঃ ১৪৮] উভয় সূত্র থেকে প্রাপ্ত তথ্যই সাক্ষ্য দেয় যে, সোনার বাংলায় প্রতি ৪ শত অধিবাসীর জন্য ছিল একটি করে বিদ্যালয়। কিন্তু এ কি সম্ভব? সেকালে রাষ্ট্রায়ত্ত সার্বজনীন শিক্ষার ধারণা পৃথিবীর কোথাও ছিল না। এমনকি দুনিয়ার কোন দেশে কোন সরকারের শিক্ষা দফতর বলে কোন দফতরও ছিল না। তবু বাংলার মুসলমানদের শত্রুপক্ষই সাক্ষ্য দিচ্ছেন, এটা এ রকমই ছিল। কিভাবে? হাজার বছর ধরে সারাবিশ্বে শিক্ষা-সভ্যতায় নেতৃত্বদানকারী ইসলাম জ্ঞানের আলোক-বর্তিকা হাতে যেখানেই পৌঁছেছে, তা সে বোখারা-সমরকন্দ-তাসখন্দই হোক, আফ্রিকার মিসর-মরক্কো-মালীই হোক, ইউরোপের স্পেন-আন্দলুসিয়াই হোক আর দক্ষিণ এশীয় উপমহাদেশেই হোক-সর্বত্রই প্রসারমান মুসলিম সমাজে 'আজান ধ্বনির দূরত্বের মাপে' গড়ে উঠেছে মসজিদ। মসজিদের প্রায় অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে

www.nagorikpathagar.org

মসজিদ অংগনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে মক্তব এবং আর্থিক সংগতির অনুপাতে প্রাংগণে মাদ্রাসা। আল-কুরআনের প্রথম নাজিলকৃত আয়াত 'ইক্‌রা বিস্‌মে রাব্বিকা' থেকে বাধ্যতামূলক নির্দেশ নিয়ে মদীনার মসজিদে নববীতে তার শুরু এবং দুনিয়ার মুসলিম জাতিগুলো ধ্বংস হবার শতাব্দীকাল পরে এখনো সারা মুসলিম জাহানে সে ধারা অব্যাহত রয়েছে।

'ছায়াঘন শ্যাম নয়নাভিরাম' সুজলা সুফলা শস্য শ্যামলা বাংলার মানুষও দরবেশদের তসবিহ দানার ঔজ্জ্বল্য ও অভয় বাণীতে আকৃষ্ট হয়ে পল্লীতে পল্লীতে সমবেত হবার সাথে সাথেই কায়েম করেছিলেন মসজিদ এবং মসজিদের মাঝখানে জ্বালিয়েছিলেন জ্ঞানের নির্ধূম দীপশিখা। সেন রাজত্বে বর্ণহিন্দু সামন্তদের প্রতিষ্ঠিত মন্দিরে-টোলে প্রবেশাধিকার থেকে বঞ্চিত, বেদমন্ত্র শ্রবণের পাপে কানে সীসা ঢেলে দেওয়া দেখে দেখে যারা অভ্যস্ত-সেই 'অস্পৃশ্যরা'ও অবাক বিস্ময়ে দেখেছে মুক্তদ্বার মসজিদের জ্ঞান-পীঠ থেকে কেউ তাদেরকে ঘাড়ধাক্কা দিয়ে বের করে দেয় না।

সেখান থেকেই বাংলায় শিক্ষা বিস্তারের সূত্রপাত। অতঃপর মুসলিম শাসনামলে অজস্র ধারায় ঘটেছে তার বিকাশ। মসজিদ সংলগ্ন মক্তব ছাড়াও বিত্তশালী মুসলমানরা নিজেদের ও পড়শীদের সন্তানদের জন্য বাড়ীর দহলিজে বসিয়েছেন মক্তব। "জ্ঞানার্জন প্রতিটি মুসলিম নর-নারীর জন্য ফরজ এবং এ কাজে সম্পত্তিদানে অশেষ সওয়াব" এই বিশ্বাসে বলীয়ান মুসলমানরা প্রায় প্রতিযোগিতা করে ভূ-সম্পত্তি দান করেছেন মাদ্রাসাগুলোর ব্যয়ভার ও অধ্যয়নরত এতিম অসমর্থ সন্তানদের ভরণ-পোষণের জন্য।

সোনার বাংলার ঐশ্বর্যবান মুসলমানেরা মসজিদ মক্তব মাদ্রাসার জন্য কি বিপুল সম্পদ-সম্পত্তি দান করতেন তার প্রমাণ মেলে ১৮১৮ সাল থেকে '৪০ সাল পর্যন্ত ইংরেজ কর্তৃক আয়মা-লাখেরাজ সম্পত্তি বাজেয়াফতিকরণ অভিযান কার্যকরী করার সময়ে। বাংলা প্রদেশের ২৮টি জেলার ২৬টির হিসাব আমাদের হস্তগত না হলেও, আমরা দেখতে পাই, তখন শুধুমাত্র চট্টগ্রাম জেলায় ১৪ হাজার ৮শত ৬৩টি এবং বর্ধমান জেলায় ৭২ হাজার লাখেরাজ দানপত্র পেশ করা হয়। কোনরূপ বিচার-বিবেচনা ছাড়াই সরকার সেগুলো পাইকারীভাবে বাজেয়াফত করে বর্ণহিন্দু বাবুদের জমিদারীভুক্ত করে দেন। [এ আর মল্লিক, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৬, ৩৯, ৪২, ৪৬; আবদুর রহিম, বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস, পৃঃ ৫৩, ৫৫]। সারা বাংলায় মুসলমানেরা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে লাখো লাখো ভূ-খন্ড সম্পত্তি দান করা ছাড়াও নিয়মিত নগদ অর্থ

www.nagorikpathagar.org

দান করতেন। তাতে প্রতিষ্ঠানগুলোর শিক্ষকদের বেতন, খোরাকী এবং সংলগ্ন ছাত্রাবাসে অবস্থানরত এতিম ও অসমর্থ ছাত্রদের যাবতীয় ব্যয় নির্বাহ সহজসাধ্য ছিল। একারণে সোনার বাংলায় মুসলমান ঘরে জন্ম নেয়া কোন সন্তান, নর বা নারী কাউকেই অশিক্ষার অন্ধকারে থাকতে হতো না। ফলে, 'একশত সত্তুর বছর পূর্বে বাংলার কোন মুসলমানের পক্ষে দরিদ্র হওয়া অসম্ভব ছিল।' [হান্টার, দি ইন্ডিয়ান মুসলমানস পৃঃ ১৫০, ১৭৭ এবং আর মল্লিক, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪৬]–উনিশ শতকের শেষভাগে উইলিয়াম হান্টারের এ উক্তির মতোই এটাও সত্য ছিল যে, সোনার বাংলায় কোন মুসলমান অশিক্ষিত ছিলনা।

জনকল্যাণমূলক কাজে ওয়াকফকৃত সম্পত্তিগুলো ছিল নিষ্কর। আর তার পরিমাণ ওয়ারেন হেস্টিংসের হিসাব অনুযায়ী ছিল বাংলার মোট ভূ–সম্পত্তির এক–চতুর্থাংশ। [ডক্তর আবদুর রহীম, বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস পৃঃ ৫৩–৫৫; এ, আর, মল্লিক, বৃটিশ পলিসি এন্ড দ্য মুসলিমস ইন বেংগল, ৪১]। সুলতান সুবাদারদের প্রত্যক্ষ মদদে ও দেশবরেণ্য মুসলিম মনীষীদের উদ্যোগে গড়ে ওঠে বহুসংখ্যক আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন উচ্চ মাদ্রাসা। এসব মাদ্রাসায় সরকারী পৃষ্ঠপোষকতার পরিমাণ আন্দাজের জন্য একটি মাত্র দৃষ্টান্তই যথেষ্ট যে, একমাত্র রাজশাহীতে মহামনীষী শাহ দওলা কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত বাঘা উচ্চ মাদ্রাসার (এ যুগের পরিভাষায় বিশ্ববিদ্যালয়) জন্য ১৬২২ সালে শাহজাদা শাহজাহান সরকারী অনুদান হিসেবে দিয়েছিলেন ৪২টি গ্রামের রাজস্ব –অর্থাৎ উৎপন্ন ফসলের এক–তৃতীয়াংশ ও অন্যান্য নানাবিধ শুল্ক। [J. S. B. S. 1904. উদ্ধৃতি ডক্টর মোহর আলী, হিস্টোরী অব মুসলিমস অব বেঙ্গল, ভলিউম ২, পৃঃ ৮৩৮]। সতেরো শতকের শেষভাগে ঢাকায় নিযুক্ত মোগল নৌ–বাহিনী প্রধানের জন্য প্রদত্ত ঢাকার পার্শ্ববর্তী ৮০টি গ্রাম সম্বলিত একটি জায়গীরের বার্ষিক আয় ছিল তৎকালীন মুদ্রায় ৩ লক্ষ টাকা–বর্তমান মুদ্রামানে অন্যূন ৬০ কোটি টাকা। সুতরাং বাঘা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদত্ত ৪২টি গ্রামের আয়ও অন্তত ৩০ কোটি টাকা ছিল। একটি মাত্র বিদ্যালয়ে বার্ষিক সরকারী অনুদান ৩০ কোটি টাকা। [মোহর আলী, হিষ্টোরী অব মুসলিমস অব বেংগল, পৃঃ ৯৪৮; সীয়ারুল মুতাখখেরীন, পৃঃ ৩৪৫]। বর্তমানে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে প্রদত্ত সরকারী অনুদানের পরিমাণ তুলনীয়। টাঙ্গাইলের কাগমারী পরগণাটি জায়গীর হিসাবে সবটুকুই ওয়াকফ করে দিয়ে শাহজামান কাশ্মীরী অনেকগুলো মসজিদ, মাদ্রাসা, মক্তব, হাসপাতাল, মাতৃসদনসহ

www.nagorikpathagar.org

এগারটি প্রতিষ্ঠান নির্মাণ করেছিলেন। এমন দৃষ্টান্ত সারা বাংলায় ভুরি ভুরি ছড়িয়েছিল।

সরকারী ও বেসরকারী দানে-অনুদানে গড়ে ওঠা মসজিদ-মক্তব-মাদ্রাসার পাশাপাশি মশহুর আলিম, সূফী ও দরবেশদেরকে কেন্দ্র করে রচিত হয়েছে খানকাহ, আলোচনা-গবেষণা কেন্দ্রিক একাডেমী।

এসব মক্তব, মাদ্রাসা, খানকাহ-আজকের পরিভাষায় বিদ্যালয়, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় ও একাডেমীগুলোই বাংলার মাটির মানুষদেরকে সোনার মানুষে রূপান্তরিত করেছিল; আর সেই সব সোনার মানুষেরাই গড়ে তুলেছিল সোনার বাংলা।

১২০২ সালে মুসলিম শাসন কায়েম হবার বহু পূর্ব থেকেই ধর্মান্তরিত ও বহিরাগত মুসলমানদের সমবায়ে গড়ে উঠতে থাকে বাংলার মুসলিম সমাজ। পরবর্তী এক শতাব্দীর ভেতরেই সারা বাংলায় প্রত্যন্ত অঞ্চলেই ধর্মান্তরিত ও বহিরাগত মুসলামনদের সমবায়ে মুসলিম সমাজের বিস্তার ঘটে, সাথে সাথে গড়ে ওঠে অসংখ্য মসজিদ। এসব মসজিদের সাথে সমন্বিত ছিল মক্তব-পড়া রেখা ও অংক শেখার প্রাথমিক বিদ্যালয়। মক্তবের পরই শুরু হতো মাদ্রাসা-সেখানে দরূস অর্থাৎ ভাষণ প্রদান করে শিক্ষা দেয়া হতো; এগুলো ছিল মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্কুল ও কলেজ, মাধ্যমিক মাদ্রাসার পর উচ্চ মাদ্রাসা, বিশ্ববিদ্যালয়। খানকাহ ছিল মশহুর মনীষীদেরকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা আলোচনা-গবেষণামূলক শিক্ষা প্রতিষ্টান। আজকের পরিভাষায় অনেকটা একাডেমী বা সেমিনারী। সাধারণতঃ মাদ্রাসা বলতে আমাদের চোখের সামনে ভেসে ওঠে-বৃটিশ শাসনামল থেকে শুরু করে সাম্প্রতিক সংস্কারমূলক ব্যবস্থাদি গ্রহণের পূর্ব পর্যন্ত এমন একটি পরিবেশ সেখানে দারিদ্র্য জর্জরিত ছাপড়া ঘরে ছিন্ন মলিন পোশাক পরা হুজুরদের সামনে সারিবদ্ধভাবে বসে পাঠরত বিভিন্ন ধর্মভীরু পরিবারের মেধাহীন অপদার্থ ছেলেদের পাশাপাশি সমাজের বেওয়ারিশ হতভাগ্য এতিম সন্তানেরা, যারা দান-খয়রাত, ছদকা-ফেতরার পয়সায়, এক কথায় খয়রাত খেয়ে বেড়ে উঠছে এবং শিক্ষালাভের পর বাকী জীবনও অতিবাহিত করবে কোন পল্লী মসজিদের ইমামতি, মিলাদ পাঠ, ফাতিহা, কুলখানি, মাজার জিয়ারত ইত্যাদির মাধ্যমে খয়ারাতি সাহায্য কুড়িয়ে খেয়ে। দক্ষিণ এশীয় উপমহাদেশের আজাদী সংগ্রামে এই দারিদ্র্যক্লিষ্ট মাদ্রাসা শিক্ষিতদের অবদান সর্বাধিক-একথা স্বীকার করে নিলেও না বলে

www.nagorikpathagar.org

উপায় নেই যে, এ শিক্ষা মুসলমানদের জাগতিক জীবন গঠনে তেমন কোন অবদান রাখেনি। রাখা সম্ভবও ছিল না। কিন্তু মুসলিম বাংলার মাদ্রাসার মর্যাদা ও শিক্ষার মান ছিল অকল্পনীয়ভাবে অন্যরূপ। বর্তমান কালের মাদ্রাসাগুলো সেই সব মাদ্রাসার ছায়াও ধারণ করে না।

সোনার বাংলার কোন কোন মাদ্রাসা শিক্ষাগত মান ও মর্যাদার দিক দিয়ে ইরাকের বাগদাদ, মিসরের আল-আজহার, মরক্কোর ফেজ, মালীর তিম্বুকতু এবং স্পেনের সেভিল, কর্দোভা ও গ্রানাডা মাদ্রাসার সমপর্যায়ের ছিল। তৎকালে মুসলিম পরিভাষায় এগুলোকে মাদ্রাসা বলা হলেও এগুলোই ছিল সেকালের আন্তর্জাতিক মানের বিশ্ববিদ্যালয়। ইউরোপীয় রেনেসাঁর জনক অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের আদি উদ্যোক্তাদের অন্যতম মনীষী রোজার বেকন ও তাঁর সমসাময়িক চিন্তাবিদেরা স্পেনীয় মাদ্রাসাগুলোর পাঠকক্ষে পঠিত আভিসিনা (ইবনে সিনা), আল হায়জম (ইবনে হাজম), আভেরোশ (ইবনে রুশদ), আলকিন্দি প্রমুখ মহা-মনীষীদের গ্রন্থরাজির পাতা থেকে জ্ঞানের স্ফুলিঙ্গ কুড়িয়ে নিয়েই কুসংস্কারাচ্ছন্ন আঁধার ইউরোপে প্রথম জ্ঞানের আলো প্রজ্বলিত করেন। সোনার বাংলার মাদ্রাসাগুলোতেও আরবী ও ফারসী ভাষায় লিখিত এসব গ্রন্থাবলীই সরাসরি পড়ানো হতো। শুধু মুসলিম জাহানের অন্যান্য দেশের মনীষীদের লেখা গ্রন্থাবলীই যে এখানে পড়ানো হতো তাই নয়, এ দেশীয় মনীষীদের লেখা গ্রন্থাবলীও অন্যান্য মুসলিম দেশের শিক্ষায়তনে পড়ানো হতো। পনের শতকের বিশ্ববিখ্যাত সোনারগাঁও বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা শেখ শরফুদ্দিন আবু তাওয়ামা কর্তৃক সহীহ বোখারীর হাদিসমালা গ্রন্থের উপর রচিত ভাষ্য গ্রন্থখানির একটি পাণ্ডুলিপি বাগদাদের গ্রন্থাগারে এখনো সযত্নে রক্ষিত আছে। বাবু বুদ্ধিজীবীদের কল্যাণে বাংগালী মুসলমানেরা আবু তাওয়ামার নাম ভুলে গেলেও মাত্র কয়েক বছর আগে ১৯৮০ সালে দৈনিক ইত্তেফাকের সম্পাদক জনাব আখতার-উল-আলম বাগদাদের গ্রন্থাগারে শরফুদ্দিন আবু তাওয়ামার লিখিত পাণ্ডুলিপিটি দেখতে পান। দেশে ফিরে ডক্টর কাজী দীন মুহম্মদকে সংগে নিয়ে জনাব আখতার-উল-আলম সোনারগাঁয়ের এক অবহেলিত পল্লীতে লতাগুল্মোর জঙ্গল সাফ করে শেখ আবু তাওয়ামার কবর জিয়ারত করেন, অনেক কষ্টে উদ্ধার করেন বৃটিশ প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের ১৯০৪ সালের সংরক্ষণফলক সম্বলিত সুলতান গিয়াস উদ্দিন আযম শাহ ও তাঁর কিংবদন্তীখ্যাত বিচারক কাজী সিরাজের সমাধি। মজার ব্যাপার, এ আবিষ্কারের পূর্বে ডঃ কাজী দীন মুহম্মদও জানতেন না যে, তাঁরই পূর্বপুরুষ তেজোদীপ্ত ন্যায় বিচারের জন্য সারা উপমহাদেশে মশহুর কাজী সিরাজের কবর

www.nagorikpathagar.org

এখানে পড়ে আছে। শুধু কাজী দীন মুহম্মদ কেন, সোনার বাংলার তিনশত বছরব্যাপী অন্যতম রাজধানী সোনারগাঁও-এর সোনার মানুষগুলো, বৃটিশ বর্ণহিন্দুর পরিকল্পিত অবহেলার অবর্জনা ও ঝোপঝাড়ের নীচে হারিয়ে যাওয়া কবরের গহ্বরে কে কোথায় শুয়ে তাদের পরিচিতিহীন বংশধরদের হালত দেখে রোনাজারী করছেন-তার খবর আমরাই বা কে কতটুকু রাখি? বড় জোর আমাদের কেউ কেউ ঢাকা মহানগরী থেকে বনভোজনের জন্য সোনারগাঁও গিয়ে পানামের বর্ণহিন্দু জমিদার ও বৃটিশপোষ্য আঠারো -উনিশ শতকীয় বেনিয়া বাবুদের প্রাসাদরাজির ধ্বংসাবশেষ দেখে দুধের সাধ ঘোলে মিটান, তাদের অনেকে জানেনও না যে আসল সোনারগাঁও বর্তমান সোনারগাঁওকে ঘিরে দশ-বারোটি গ্রামের বৃক্ষগুল্ম আর ঝোপঝাড়ের নীচে চাপা পড়ে আছে।

সোনার বাংলার সমসাময়িক আমলে দক্ষিণ এশীয় উপমহাদেশে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষিতের সংখ্যা বিভিন্ন এলাকায় বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রূপ থাকলেও তার প্রকৃতি ও পদ্ধতি ছিল অভিন্ন। মোগল যুগে আর্থ-সামাজিক অবস্থাভেদে বিভিন্ন প্রদেশে শিক্ষা কার্যক্রমের ব্যবধান থাকলেও সাম্রাজ্যের সর্বত্র শাহী শিক্ষানীতি অনুসৃত হতো। এ ব্যাপারে আবুল ফজলের মাধ্যমে সম্রাট আকবরের শিক্ষা সংক্রান্ত রেগুলেশনে আমরা দেখতে পাই-প্রত্যেকটি বিদ্যালয়ের পক্ষে নীতিশাস্ত্র, অংকশাস্ত্র, অংকশাস্ত্রের জন্য নতুন পদ্ধতি বা চিহ্ন, কৃষিবিদ্যা, জ্যামিতি, ক্ষেত্রবিদ্যা, শরীরবিদ্যা, চিকিৎসা বিদ্যা, রসায়ন বিদ্যা, পদার্থ বিজ্ঞান, গার্হস্থ্য বিদ্যা, সঙ্গীত, ধর্মতত্ত্ব, দর্শন, বিজ্ঞান ও ইতিহাস ইত্যাদি শেখা ছিল বাধ্যতামূলক। এর সবগুলো বিষয়ই পর্যায়ক্রমে আয়ত্ত করা যেতে পারতো। সংস্কৃত শিখতে গিয়ে ছাত্রদের বৈয়াকরণ (ব্যাকারণ), নৈয়াই (ন্যায়শাস্ত্র), বেদান্ত, পাতঞ্জলি ইত্যাদি অধ্যায়ন করাও ছিল বাধ্যতামূলক। তদানীন্তনকালে প্রয়োজন এরূপ কোন বিষয়ই কাউকে অবহেলা করতে দেয়া হত না। এ সমস্তবিধি বিদ্যালয়সমূহে নতুন আলোকের সঞ্চার এবং মাদ্রাসাগুলোর দীপ্তি বৃদ্ধি করবে বলে আশা করো হতো। [আইন-ই-আকবরী, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা ২৮৮]।

১৮৩৫ সাল অবধি বাংলার মুসলিম শিক্ষাব্যবস্থা ধ্বংস করে দেয়ার পর তৎসম্পর্কে সরেজমিনে পর্যবেক্ষণের দায়িত্বে নিয়োজিত মিঃ উইলিয়াম এডামস্ তাঁর রিপোর্টেও বলেন, "মাদ্রাসাগুলোতে অত্যন্ত ব্যাপক ধরনের পাঠ্য তালিকা রয়েছে। এতে ধারাবাহিকভাবে সম্পূর্ণ ব্যাকরণগ্রন্থ, ছন্দের পূর্ণ তালিকা, তর্কশাস্ত্র ও আইন এবং বাহ্যিক পর্যবেক্ষণ সমূহের (প্রকৃতি বিজ্ঞানের) অধ্যয়ণ

www.nagorikpathagar.org

এবং ইসলামের মূলনীতিসমূহ অন্তর্ভুক্ত ছিল। জ্যামিতি জ্যোতিঃশাস্ত্রের উপর টলেমির গ্রন্থাবলী অনূদিত হয়ে প্রাকৃতিক দর্শন ও সাধারণ দর্শনশাস্ত্রের উপর নিবন্ধসমূহের সংগে একত্রে কোন কোন বিদ্যায়তনে ব্যবহৃত হতো।" [ডক্টর এ, আর, মল্লিক, বৃটিশ পলিসি এন্ড দ্য মুসলিমস অব বেঙ্গল, পৃঃ ১৭৫]।

মাদ্রাসা নামে অভিহিত উচ্চ শিক্ষার পীঠস্থান বহুসংখ্যক বিশ্ববিদ্যালয় তখন সোনার বাংলার নানা স্থানে বিদ্যামান ছিলো। সোনার বাংলা লোপাট-পাচারের আসামীকুল ও তাদের বংশধর বৃটিশ-বর্ণহিন্দু বুদ্ধিজীবীরা "নিজেদের জাতীয় কর্তব্যের" খাতিরে, সেগুলোর কোন খবর তাদের রচিত ইতিহাসে তুলে ধরেন নাই। আর দুই শতাব্দীব্যাপী অন্ধকার আবর্তে জীবন-মৃত্যুর পাকে ঘুরপাক খাওয়া মুসলমানদের পক্ষেও সম্ভব ছিল না সেগুলোর অম্লান স্মৃতি ধরে রাখা। বিগত চার দশকে কয়েকজন নিবেদিতপ্রাণ বাংগালী মুসলিম ইতিহাসবিদের অক্লান্ত সাধনায় যেটুকু উদ্ধার হয়েছে তাতে দেখা যায় যে, মুসলমান শাসন বিস্তারের শুরু থেকেই এ দেশে এ ধরনের বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন আরম্ভ হয়। সেগুলোর মধ্যে (১) লক্ষ্মণাবতীতে সুলতান গিয়াসউদ্দিন ইউয়াজ খিলজী প্রতিষ্ঠিত বিশ্ববিদ্যালয়, (২) গৌড়ের উপকণ্ঠে গড়ে ওঠা দারাসবাড়ী বিশ্ববিদ্যালয়, (৩) সুলতান আলাউদ্দিন হোসেন শাহ কর্তৃক মালদহে প্রতিষ্ঠিত বিশ্ববিদ্যালয়, (৪) সেখান থেকে অদূরে অবস্থিত বেলবাড়ী বিশ্ববিদ্যালয়, (৫) হুগলীর সন্নিকটে ত্রিবেনীতে সুলতান রুকনউদ্দিন কায়কাউসের আমলে বাঘা কাজী নাসিরউদ্দিন কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত বিশ্ববিদ্যালয়, (৬) পান্ডুয়ায় হযরত নূর কুতবুল আলমের প্রতিষ্ঠিত বিশ্ববিদ্যালয়, (৭) বীরভূম জেলার নাগর-এ সুলতান গিয়াস উদ্দিন আযম শাহ ও নূর কুতবুল আলমের উস্তাদ প্রখ্যাত পন্ডিত হামিদ উদ্দিন কুঞ্জনশীল প্রতিষ্ঠিত বিশ্ববিদ্যালয়, (৮) বর্ধমান জেলার মংগলকোটে আবদুল হামিদ দানিশমন্দ (মহাজ্ঞানী) প্রতিষ্ঠিত বিশ্ববিদ্যালয়, (৯) রাজশাহী জেলার বাঘাতে মহামনীষী শাহ দওলা কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত বিশ্ববিদ্যালয়, (১০) নবাবী আমলের রাজধানী মুর্শিদাবাদে কাটারা বিশ্ববিদ্যালয়, (১১) তেরো শতকের শেষভাগে দিনাজপুর জেলার ঘোড়াঘাট বিশ্ববিদ্যালয়, (১২) মোগল আমলের ঢাকায় লালবাগ শাহী মসজিদ, ছোট কাটারা ও বড় কাটারা সমবায়ে গঠিত বিশালয়তন লালবাগ বিশ্ববিদ্যালয় এবং (১৩) তেরো শতকের শেষ ভাগে শরফুদ্দিন আবু তাওয়ানার হাতে প্রতিষ্ঠিত সোনারগাঁও বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম ও পরিচয় কিছু কিছু উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে।

www.nagorikpathagar.org

বোখারায় জন্ম নিয়ে খোরাসানে শিক্ষাপ্রাপ্ত "প্রকৃতি বিজ্ঞান, রসায়ন, পদার্থবিদ্যা ইত্যাদি যাবতীয় জ্ঞান-বিজ্ঞানে পারদর্শী জ্ঞানী বুজর্গ মহাপন্ডিত শরফুদ্দিন আবু তাওয়ামা কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত সোনারগাঁও বিশ্ববিদ্যালয় ষোড়শ শতকের শেষ অবধি ৩ শত বছর ধরে উপমহাদেশের পূর্বাঞ্চলকে জ্ঞানালোকে উজ্জ্বল করে রাখে। [ডক্টর মোহর আলী, হিস্টরী অব দি মুসলিম্‌স্‌ অব বেংগল, ৮৩৪ পৃষ্ঠায় চতুর্দশ শতকের লেখক শাহ শোয়ায়েবের "মানিকিবাল আসিফিয়া" গ্রন্থের উদ্ধৃতিসহ]। মুসলিম রাষ্ট্রে অমুসলিম সম্প্রদায়ের ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক স্বাধিকার বহাল রাখার সুস্পষ্ট বিধান থাকায় এবং খোলাফায়ে রাশেদার জামানায় জিম্মি হিসাবে তাদের পূর্ণ নিরাপত্তা প্রদানের নীতি অনুসৃত হওয়ায় মুসলিম বাংলায়ও সে আদর্শ ও নীতি অনুসরণ করা হয়। ফলে সেন শাসনামলের মতোই বর্ণহিন্দু সম্প্রদায় নিজেদের ধর্মীয় আদর্শ অনুযায়ী সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য ভিত্তিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনার নিরঙ্কুশ অধিকার পায়। শুধু অধিকার নয়, সারাদেশে বিদ্যমান বর্ণহিন্দু জমিদারদের মাধ্যমে সে-সব প্রতিষ্ঠান দান হিসাবে প্রাপ্ত ভূ-সম্পত্তিও লাভ করে এবং রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে সে সম্পত্তির খাজনা মওকুফ করা হয়। এভাবে বর্ণহিন্দু বিত্তশালী ব্যক্তিদের দানে ও মুসলিম সুলতান ও সুবাহদারদের অনুদানে দেশের সর্বত্র বিপুলসংখ্যক পাঠশালা গড়ে ওঠে। এগুলোতে বাংলা ও সরকারী ভাষা ফার্সীর প্রাথমিক পাঠ দেয়া হতো। পাঠশালার পাঠ শেষ করে বর্ণহিন্দু ছাত্রেরা মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান চতুস্পাঠী, টোল বা বিদ্যালয়ে সংস্কৃত ভাষায় আপন ঐতিহ্যানুযায়ী পাঠাভ্যাস করতো। মাধ্যমিক চতুস্পাঠীর পর সংস্কৃত ব্যাকরণ ও বেদ-বেদান্ত ইত্যাদি বিষয়ে পরিপূর্ণ জ্ঞানার্জনের জন্য ছিল উচ্চ পর্যায়ের টোল। বর্ধমান, নদীয়ার নবদ্বীপ, বরিশালের ফুল্লশ্রী, নোয়াখালীর যুগদিয়া প্রভৃতি স্থানগুলোতে এরূপ অনেক উচ্চ পর্যায়ের টোল প্রতিষ্ঠিত ছিল। সেগুলোতে শিক্ষাদানের জন্য দ্রাবিড় (দাক্ষিণাত্য), উৎকল (উড়িষ্যা), কাশী, ত্রিহূত ইত্যাদি অঞ্চল থেকে সুপ্রসিদ্ধ ব্রাহ্মণ পন্ডিতদেরকে নিয়ে আসা হতো [কে, কে, দত্ত, পৃঃ ২৩৬ঃ আব্দুর রহিম,পৃঃ ৩১৯-২১]। কিন্তু বর্ণাশ্রমের ভেদ-বৈষম্য আজকের চেয়েও সেযুগে প্রবল থাকায় এসব বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণ দ্বারা পরিচালিত পাঠশালা, চতুস্পাঠী ও টোলে দেবভাষা সংস্কৃতের পবিত্রতাহানির আশংকায় 'অস্পৃশ্য' নিম্নবর্ণীয় হিন্দু সম্প্রদায়ের প্রবেশাধিকার ছিল না।

পাঠশালা পর্যায়ে অনার্য তফসিলী শূদ্র ও বৌদ্ধ জনসাধারণও অনেক ক্ষেত্রে নিজেরা নিজেদের বিদ্যালয় পরিচালনা করতেন। কোথাও তাদের পৃথক বিদ্যালয় গৃহ ছিল, কোথাওবা একই গৃহে সকালে মুনশী সাহেব মুসলমান ছাত্রদেরকে

www.nagorikpathagar.org

এবং বিকালে গুরু মশায় তাদের সন্তানদেরকে পড়াতেন [জে, এন, দাসগুপ্ত, বিক্রমপুরের ইতিহাস, পৃঃ ৩০০–৩৩]। পাঠশালা স্তর অতিক্রম করে তারাও মাদ্রাসায় প্রবেশাধিকার পেতো। পনেরো শতকের প্রথম দিকে আগত চীনা রাজদূতগণ উল্লেখ করেছেন যে, বাংলাদেশে বাংলা ও ফারসী দু'টো ভাষার ব্যবহার ছিলো। মাহুয়ান বলেন, "জনসাধারণের ভাষা বাংলা ; ফারসী ভাষাও ব্যবহৃত হয়" [মাহুয়ানস এ্যাকাউন্টস, পৃঃ ১৭০] প্রাথমিক বিদ্যালয়ে–মক্তবে মুসলমান ছাত্রদের বাংলা, আরবী ও ফারসী তিনটি ভাষাই শিখতে হতো। মিঃ এ্যাডমস তার দ্বিতীয় রিপোর্টে বলেন যে, মক্তব ও পাঠশালায় মুসলমান আমলে ছন্দবদ্ধ শুভংকরের সূত্র পড়ানো হতো---- শুভংকর হয় মুসলমান আমলে জন্মেছিলেন না হয় তার নাম সম্বলিত এ রচনাগুলো মুসলমান শাসনামলেই রচিত হয়েছিল। এ সূত্রগুলো হিন্দুস্তানী ও ফারসী উভয়বিধ শব্দাবলীতে পূর্ণ। এগুলো মুসলমানী কায়দায় শব্দ প্রয়োগ রীতির স্বাক্ষর বহন করে [কে, কে, দত্ত, পৃঃ ২৩৮; উদ্ধৃতি মোহর আলী, প্রাগুক্ত পৃঃ ৩৪৮]।

মাদ্রাসায় আল–কুরআন, আল–হাদিস, ফেকাহ্, শরীয়াহ ইত্যাদি বিষয়ে উচ্চ শিক্ষা ও গবেষণার জন্য মাধ্যম ছিল আরবী ভাষা এবং সাধারণ জ্ঞান–বিজ্ঞানের শিক্ষা ও চর্চা হতো ফার্সী ভাষায়। সরকারী ভাষা ফার্সীর মাধ্যমে প্রদত্ত যাবতীয় শিক্ষাতে সকল সম্প্রদায়ের শিক্ষার্থীরা শরীক হতো। সোনার বাংলার রাজস্ব বিভাগের চাকুরীতে প্রায় একচেটিয়া দখলদার বর্ণহিন্দু বাবুরা, এমন কি উচ্চতম সরকারী দায়িত্ব পালনে সক্ষম সুশিক্ষিত রাজা–মহারাজা খেতাবপ্রাপ্ত বাবুরাও মাদ্রাসা নামধারী বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ফার্সী বিভাগে হিসাবরক্ষণসহ যাবতীয় জাগতিক জ্ঞান অর্জন করতেন। আরবী ফার্সী ভাষায় পারদর্শী এসব পারঙ্গম পুরুষদেরই শেষ উত্তরসূরী হিসাবে আমরা দেখতে পাই ঊনিশ শতকের গোড়ার দিকে সক্রিয় রাজা রামমোহন রায়, কবি সত্যেন্দ্রনাথের দাদা শ্রী অক্ষয় কুমার দত্ত, কুরআনুল করীমের প্রথম বাংলা অনুবাদক ভাই গিরীশ চন্দ্র সেন প্রমুখকে। সোনার বাংলার শিক্ষাব্যবস্থা মূল্যবোধহীন, জীবন–বিমুখ অকর্মা কেরানী তৈরীর সাম্রাজ্যবাদী কারখানা ছিল না। মক্তব শিক্ষার পর সাত বছর মেয়াদী মাধ্যমিক শিক্ষা স্তরে ছাত্রদেরকে মানবিক মূল্যবোধের ছবক দিয়ে কর্মজীবনের উপযোগী করে ছেড়ে দেয়া হতো। এর দরুনই সেকালে গড়ে উঠেছিল দেশব্যাপী এমন এক শিক্ষিত ও দক্ষ জনশক্তি, সোনার বাংলাকে তৎকালীন পৃথিবীতে যারা সর্বাপেক্ষা সম্পদশালী দেশে পরিণত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। আজকের মতো বেকার মাষ্টার ডিগ্রী হোল্ডার হবার লক্ষ্যে নয়, শিক্ষা প্রদান, গবেষণা, জ্ঞানসাধানা ও জ্ঞান

www.nagorikpathagar.org

বিসতারকে যারা জীবন ও জীবিকা হিসাবে গ্রহণ করতেন, প্রধানতঃ তারাই বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে শিক্ষা গ্রহণ করতেন।

প্রভু ইংরেজের অনুগ্রহধন্য উনিশ শতকীয় বাবু বুদ্ধিজীবীদের লেখনী ছিল ধ্বংসপ্রাপ্ত মুসলমানদের বিরুদ্ধে ব্যাঙ্গ বিদ্রুপ ও শ্লেষাত্মক [দেখুন, ঈশ্বরগুপ্ত, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, বঙ্কিমচন্দ্র ও দিজেন্দ্র লালের রচনাবলী] বিষোদগারে মুখর। মুসলিম শাসনামলে সোনার বাংলার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর শিক্ষামানের স্বীকৃতি বা প্রসংগ উল্লেখ থেকে বিরত থেকে তারা তৎকালীন শিক্ষা–সাংস্কৃতিক কুসংস্কারাচ্ছন্নতা প্রমাণেই প্রয়াস পেয়েছেন। "বাংগালীদেরকে মানুষ করতে ব্যাগ্র" ইংরেজ বুদ্ধিজীবীরাও সাধারণতঃ সে–ধারাই অনুসরণ করেছেন। তবু স্বাভাবিকভাবে নিজেদের শিক্ষা সংস্কৃতির প্রতি কিছুটা পক্ষপাতমূলক শ্রদ্ধাশীল থেকেও (যা থাকা অসমচিন নয়।) জেনারেল শ্রীম্যান লিখেছেন, "স্বম্ভবতঃ পৃথিবীতে খুব কম সম্প্রদায়ই রয়েছে, যাদের মধ্যে ভারতীয় মোহামেডানদের অপেক্ষা বেশী ব্যাপকভাবে শিক্ষা প্রসারিত হয়েছে। যিনি মাসিক বিশ টাকা বেতনে সরকারী দফতরে চাকুরী করেন, তিনি তার সন্তান–সন্ততিদেরকে সাধারণতঃ একজন প্রধানমন্ত্রীর সমতুল্য শিক্ষা প্রদান করেন। তারা আরবী ও ফার্সী ভাষার মাধ্যমে শিক্ষা গ্রহণ করে, যা আমাদের কলেজে যুবকরা সেই সেই বিষয়ে গ্রীক ও ল্যাটিন অর্থাৎ ব্যাকরণ, ছন্দ ও তর্কবিদ্যার মাধ্যমে পেয়ে থাকে। সাত বছর কাল অধ্যয়নের পর একজন মুসলমান যুবক মাথায় পাগড়ি পরিধান করে এবং অক্সফোর্ড থেকে পাস করা একজন নব্য যুবকের মতোই জ্ঞানের প্রায় সকল শাখায় পূর্ণতা লাভ করে থাকে। সে অনর্গলভাবে সক্রেটিস, প্লেটো, এরিস্টোটল, হিপোক্রেটিস, গ্যালেন ও আভিসিনা (ইবনে সিনা) সম্বন্ধে আলোচনা চালাতে সক্ষম।" তিনি আরো বলেন, "জীবনের দৈনন্দিন ঘটনাবর্তের বাইরে, বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনার্থে আমাদের আমন্ত্রণ জানানো হলে উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন ও শিক্ষিত মোহামেডানদের সংগে কথাবার্তায় আমাদের মধ্যকার শ্রেষ্ঠ ইউরোপীয়গণও নিজেদের জ্ঞানের অপূর্ণতা অনুভব করেন। একজন শিক্ষিত মোহামেডান ভদ্রলোক টলেমী কর্তৃক প্রদর্শিত পথে জ্যোতির্বিদ্যা সম্বন্ধীয় নীতিমালা, আভিসিনার গ্রন্থাবলীর মাধ্যমে হিপোক্রেটিস ও গ্যালেনের রচনাবলী ইত্যাদির সংগে মোটামুটিভাবে পরিচিত এবং তিনি দর্শন, সাহিত্য, বিজ্ঞান, কলা ইত্যাদি সকল বিষয়ের উপর কথা বলতে খুবই পারদর্শী ও তাতে তিনি খুবই উৎসাহবোধ করেন। শুধু তা–ই নয়, আধুনিককালে এসব বিষয়ে যে সকল উন্নতি সাধিত হয়েছে সেগুলোর প্রকৃতি অনুধাবন করতেও তিনি সক্ষম।"

www.nagorikpathagar.org

আবদুর রহীম, বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস, পৃঃ ৩৩৬-৩৭ঃ জেনারেল শ্লীম্যান, র‍্যাম্বলস এন্ড রিকালেকশনস, পৃঃ ৫২৩]।

সোনার বাংলায় অনুসৃত চিকিৎসাবিদ্যাও কোনদিক দিয়ে পিছিয়ে ছিলো না। বিখ্যাত ফরাসী দার্শনিক কোলবার্টের সাগরিদ, পর্যটক বার্নিয়ার নিজে রেনেসাঁ-উত্তর ইউরোপের চিকিৎসা পদ্ধতিতে একজন ভাল ডাক্তার হয়েও এবং ইউরোপীয় শিক্ষা পদ্ধতির প্রতি সব রকম পক্ষপাতিত্ব থাকা সত্বেও, বাংলার চিকিৎসাবিদদের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন [বার্নিয়ার, পৃঃ ৩৩৮-৩৯]। তাঁর সমসাময়িক ভেনিসীয় পর্যটক মানুচীও বাংলার চিকিৎসা-ব্যবস্থার তারিফ করেছেন। [ডক্টর আবদুর রহীম, বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস, পৃঃ ৩৩৯ উদ্ধৃতি এস, এম, ইকরাম, পৃঃ ৪৭৫]। সেবাস্তিয়ান মানরিকের সফরনামায়ও এদেশের চিকিৎসা-পদ্ধতির প্রশংসা দেখতে পাওয়া যায়।

জাতিসত্ত্বার সৌধ নির্মাণ বা জাতীয়তাবোধের ব্যূহ রচনা কোনটিই শূন্যের উপর সম্ভব নয়। তার জন্য ইতিহাস ঐতিহ্যের অটুট ইনফ্রাষ্ট্রাকচার প্রয়োজন হয়। প্রয়োজন হয় নিজেদের বুনিয়াদ সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারনার। চলতি শতকের প্রথম দশকে শিশু কিশোরদেরকে তাদের অশিক্ষিত অশিতিপর বৃদ্ধ দাদা-দাদীরা প্রতি সন্ধ্যায় গল্পের আসরে শোনাতেন নিজেদের দাদা-দাদীদের নিকট থেকে শোনা সোনার বাংলার প্রত্যক্ষদর্শীর বর্ণনা, রূপকথার চেয়েও বর্ণাঢ্য আপন ঐতিহ্যের সে চিত্রই তাদেরকে উজ্জীবিত করেছিল দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ দশকে বর্ণহিন্দু জমিদার-মহাজনদের শোষণের বিরুদ্ধে আপোষহীন সংগ্রাম চালিয়ে মুক্ত স্বদেশভূমি কায়েম করতে। প্রায় এক শতাব্দীকাল আগের সেই শিশু-কিশোরেরাও আজ আর বেঁচে নেই। তাদের সন্তান-সন্ততি বাংগালী মুসলিম রেনেসাঁর প্রথম প্রজন্ম, মুক্তির উল্লাসে বখরার কাড়াকাড়িতে সোনার বাংলার সেই রূপকথার কাহিনী কেউ শুনেও রাখেনি-আর আজকের তরুণদেরকে শোনাতেও পারেনি। অথচ, জাতীয় জীবনে ঐতিহ্যের বুনিয়াদ ছাড়া আত্মপ্রতিষ্ঠা-এমন কি আত্মরক্ষাও সম্ভব নয়।

আমরা যদি এক ডজন মেধাবী তরুণকেও এ কঠিন কাজে ব্রতী হতে দেখতে পাই, জাতির জন্য সেটা হবে এক মহাসৌভাগ্য।

www.nagorikpathagar.org

সোনার বাংলার সোনাদানা

সোনাদানা বিত্ত-বৈভবে, দুধে-ভাতে, প্রাণ-প্রাচুর্যে সমৃদ্ধ সোনার বাংলার সন্ধানে উনিশ শ' আটাশির ঢাকা থেকে শুরু করে সতেরো শ' সাতান্নের পলাশীর প্রান্তর অবধি আমরা তন্ন তন্ন করে খুঁজেছি। এ দীর্ঘ দু' শ' বছরে 'ফাঁকা বুলির বাংলা', 'হাইজ্যাকের বাংলা', 'তলাহীন ঝুড়ি বাংলা'· 'শ্মশান বাংলা'· 'বঞ্চনার বাংলা'· 'সীমাহীন শোষণের বাংলা', অসহনীয় নির্যাতনের বাংলা', 'অবাধ লুটতরাজের বাংলা'–বাংলার সব রূপই আমরা দেখেছি। কিন্তু সোনার বাংলার সাক্ষাৎ আমরা পাইনি।

আধুনিক বাংলার অবস্থা যখন এই, দেখা যাক প্রাচীন বাংলায় সোনার বাংলার চেহারা কেমন চকমকে। পুরাতাত্ত্বিক ও বিদেশী ঐতিহাসিক সূত্রে যতটুকু জানা যায়, গংগরীড়ই সাম্রাজ্য ও পরবর্তী সুহ্ম বা রাঢ়, বংগ, সমতট, হারিকেল, গৌঢ় ও রত্নদ্বীপের খড়গ, ভদ্র, দেব, চন্দ্র প্রভৃতির অনার্য বাংগালী বংশীয় শাসকদের আমলে বাংলার জনসাধারণ নিজেদের দেশে খেয়ে-পরে সুখে-শান্তিতে রূপকথার জীবন-যাপন করেছে- গুপ্তযুগে আমদানীকৃত ব্রাহ্মণ্যবাদের ভেদ-বৈষম্যজনিত অনাচার বাদ দিলে সেই যুগে এই জনপদ মাঝে মধ্যে প্রাচুর্য ও সমৃদ্ধির স্বাদও পেয়েছে। সেই অধ্যায়েই অনার্য বৌদ্ধ বাংগালী পাল সম্রাটদের গৌরবময় যুগ অতিক্রান্ত হয়েছে-তাঁদের বিজয়-গাঁথাই সমৃদ্ধির সাক্ষ্য বহন করে।

পাল আমলে স্বর্ণের খুব ছড়াছড়ি পাওয়া না গেলেও রৌপ্যের প্রচলন ছিল- রৌপ্যমুদ্রাও ছিল। স্বর্ণমুদ্রার অস্তিত্ব সম্পর্কে কোন ঐতিহাসিক সাক্ষ্য না মিললেও রৌপ্য মুদ্রার প্রচলন থেকেই সে যুগের বৈষয়িক বাণিজ্যিক সমৃদ্ধির প্রমাণ মেলে। পাল বংশের পতনের পর কর্নাটক থেকে আগত সেন রাজারা ব্রাহ্মণ্য বর্ণবৈষম্য দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠা করেন। ফলে বাংলার অনার্য কৃষ্ণকায় 'অস্পৃশ্য' মাটির মানুষেরা জুলুম-পীড়নের শিকার হয়। পরিণতিতে তৎকালীন কৃষি-শিল্প সকল ক্ষেত্রেই উৎপাদনে ভাটা পড়ে। বৈদেশিক লেন-দেনও লোপ পায়। এ কারণে সেন আমলে স্বর্ণ মুদ্রাতো ছিলই না, রৌপ্য মুদ্রারও সন্ধান বা সাক্ষ্য-প্রমাণ আজো মেলেনি [নীহাররঞ্জন রায়, বাংগালীর ইতিহাস, পৃঃ ১৯৫-৯৮]।

এমনকি, রাজা লক্ষণ সেন অনুগ্রহভাজনকে 'লক্ষ কড়ি' দান করতেন। স্বর্ণ, রৌপ্য বা তামার মুদ্রাও নয়, [তবকত-ই-নাসিরী (র‍্যাভাটি-ইলিয়ট) পৃঃ ৫৫৫-৫৬]।

www.nagorikpathagar.org

সেকালের গণিত গ্রন্থে, 'লীলাবতী'র সাক্ষ্য মতে, ২০ কড়িতে ১ কাকিনি, ৪ কাকিনিতে ১ পণ, ১৬ পণে ১ দ্রাকমা এবং ১৬ দ্রাকমায় ১ নিস্ক হতো। আন্তর্জাতিকভাবে গ্রহণীয় ধাতব মুদ্রার বদলে স্থানীয় দ্রব্য ঝুড়ি ঝুড়ি কড়ি দিয়ে বৈদেশিক বাণিজ্য চলা অসম্ভব। আর ব্রাহ্মণ্যবাদী শোষণে-পেষণে নিঃস্ব বাংলায় বৈদেশিক বাণিজ্যের কোন প্রয়োজনও ছিল না।

পাল শাসনামলে বৌদ্ধ বিহারের ধ্বংসস্তূপের তলায় প্রাপ্ত খালিফা হারুন-অর-রশীদের নামাঙ্কিত মুদ্রা সাক্ষ্য দেয় যে, তখন মুসলিম জাহানের সাথে বাংলার বৈদেশিক বাণিজ্য চালু ছিলো।

১২০২ সালে মুসলিম শাসন কয়েম হবার পর মানবিক অধিকার ফিরে পেয়ে বাংলার মাটির মানুষেরা উঠে দাঁড়ায়। মুসলমানদের উদার ব্যবহার ও ইসলামী মূল্যবোধের সান্নিধ্যে এসে তারা দলে দলে ইসলাম কবুল করে। তারা কর্মতৎপর হয়। তের শতকের প্রথমার্ধেই তৎকালীন সমগ্র বাংলাভাষী অঞ্চল নিয়ে 'মুলকে বংগাল' বা বাংলা রাজ্য গড়ে ওঠে এবং সারা বাংলা জুড়ে সুসংবদ্ধ বাণিজ্যিক যোগাযোগ ও লেন-দেন চালু হয়। মুসলিম রাজত্ব কায়েম হবার পর এ অঞ্চলের সাথে সমগ্র মুসলিম জাহানের সুসম্পর্ক গড়ে উঠে। ফলে শুরু হয় বৈদেশিক বাণিজ্য-রফতানী, আমদানী। মুসলিম শাসনের শুরুতেই মুসলিম জাহানের অন্যান্য স্থানের অনুসরণে এখানেও চালু করা হয় স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রা।

বাংলায় তখন দেশীয় পণ্য রফতানীর বিনিময়ে স্বর্ণ-রৌপ্য-হীরা-জহরৎ-লৌহ-তাম্র, চীনা মাটির বাসন-কোশণ ইত্যাদি বিলাসদ্রব্য ছাড়া আমদানীযোগ্য কিছুই ছিল না। বিপুল বর্ধিত উৎপাদন রফতানীর বিনিময়ে সেগুলোই আসতো। আর তার ফলে এক শতাব্দীর মধ্যে বাংলা মুলুক হয়ে ওঠে তৎকালীন বিশ্বের বিস্ময়, সুখী-সমৃদ্ধ সোনার বাংলা।

সেকালের দক্ষিণ-পশ্চিম বাংলার গভর্ণর জাফর খানের ত্রিবেনীতে অবস্থিত কবর-ফলকে তৎকালীন সুলতান শামসুদ্দীন ফিরোজ শাহকে (১৩০২-২২) উল্লেখ করা হয় 'বাদশাহ সোলেমানের রাজ্যের উত্তরাধিকারী' বলে [ফলকের প্রতিষ্ঠা, ১৮ই এপ্রিল, ১৩১৩]। মরক্কোর মুসাফির ইবনে বতুতা ১৩৪০ সালে পূর্ব বাংলা সফর করে এ দেশকে 'পৃথিবীর সবচেয়ে সম্পদশালী ও সস্তা জীবনোপকরণের দেশ' বলে তাঁর সফরনামায় উল্লেখ করেন [সফরনামা, পৃঃ ১৩০-৩২]। চীনা পর্যটক ওয়াং তাউয়ান

www.nagorikpathagar.org

১৩৫০ সালে বাংলা সফর করেও একই মন্তব্য করেছেন। [মোহর আলী, হিষ্টোরী অব দি মুসলিমস অব বেংগল, ভঃ ১/খ, পৃঃ ৯২৫]।

১৫১৪ সালে চীনা রাজকীয় প্রতিনিধিদের সাথে আগত মা'হয়ান বলেন, 'এই বিশাল বিস্তীর্ণ দেশে বিপুল সম্পদ ও অঢেল ঐশ্বর্য রয়েছে' [পূর্বোক্ত, প্রদত্ত বরাত, পৃঃ ১১৭]। প্রতিনিধিদলের এক সদস্য বর্ণনা করেছন, "দেশটি সুসভ্য ও সম্পদশালী। তারা আমাদের রাজদূতকে সোনার থালা ও গামলা এবং সহকারী দূতকে রূপার থালা-গামলা উপহার দিয়েছিলেন। সঙ্গে আগত অন্যান্যদেরকে সোনার ঘন্টা, কোমরে সাদা রশি সজ্জিত ও রেশমের কারুকাজ করা দীর্ঘ গাউন দেয়া হয়েছিল' [পূর্বোক্ত, প্রদত্ত বরাত, পৃঃ ১২৭] তাদের অন্য একজন লেখেন, "সপ্তস্বর্গ এই রাজ্যে পৃথিবীর স্বর্ণরাজি ছড়িয়ে রেখেছে" [আবদুর রহিম, সোস্যাল এন্ড কালচারাল হিষ্টোরী অব বেংগল, পৃঃ ৪৮২]। অন্যান্য চীনা দূতেরা লেখেন, বাংলা মুলকে পুরুষ-রমণী উভয়ে মাঠে কাজ করে। তাদের শস্যের মওসুম শেষ হলে, অবসর সময়ে তারা কাপড় বোনে [আবদুর রহীম, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৪৮২]।সম্রাট বাবুর তাঁর আত্মজীবনী বাবুর নামা'য় বলেছেন যে, বাংলা মুলুক অঢেল প্রাচুর্যের দেশ। বাংলার অধিবাসীদের প্রিয় হবি হচ্ছে, স্বর্ণ-রৌপ্য সঞ্চয় করা আর মৃত্যুকালে তা সন্তান-সন্ততিদেরকে দিয়ে যাওয়া। এভাবে প্রত্যেকেই উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত স্বর্ণ-রৌপ্যের মালিক হয়ে তা মাটির নীচে লুকিয়ে রাখে। [আবদুর রহীম, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৫১৭]।

সম্রাট হুমায়ুন বাংলা আক্রমণ করলে শেরশাহ গৌড় থেকে তার বিত্ত-সম্পদ রোহতাস্-এ সরিয়ে নেন। এ কাজে তার হীরা-জহরৎ, মণি-মুক্তা ও স্বর্ণ-রৌপ্য বহনের জন্য ২শ' ঘোড়া ও উট প্রয়োজন হয়েছিল। [মাখজান-ই-আফগান, পান্ডুলিপি, পৃঃ ২/ক] অতঃপর হুমায়ুন গৌড় নগরীতে প্রবেশ করে উহার সমৃদ্ধি ও প্রাচুর্য দেখে এতোই বিস্ময়াবিষ্ট হন যে, তিনি নগরীর নতুন নাম রাখেন 'জান্নাতাবাদ' [মোহর আলী, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৯২৬; আবদুর রহীম, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৪০৩]।

পরবর্তী সোয়া দু'শ' বছরে ইউরোপীয় দেশগুলো থেকে কয়েক ডজন পর্যটক বাংলা মুলুক সফর করেছেন। সাড়ে পাঁচ শ' বছরব্যাপী মুসলিম সুশাসনের পরিণতিতে বাংলায় তখন স্বর্ণ-রৌপ্যের ছড়াছড়ি। ষোল শতকের শেষভাগে আগত চীনা পর্যটকরা বলেছেন যে, বাংলা মুলুকে দৈনন্দিন বাণিজ্যিক লেন-দেনেও স্বর্ণমুদ্রা 'মোহর' ব্যবহৃত হতো এবং এখানকার মুসলিম সওদাগররা এতো সৎ যে, ১০ হাজার মোহর পরিমাণ ক্ষতি হয়ে গেলেও তারা ওয়াদা খেলাফ করে না। পাশাপাশি, সমসাময়িককালের বিভিন্ন মংগলকাব্য গ্রন্থে দেখা যায় যে, বর্ণহিন্দু বেনিয়ারা বিদেশী ক্রেতাদেরকে

www.nagorikpathagar.org

নানাভাবে ওজনে মানে ও পরিবেশনে প্রতারণা করতো [বংশীদাস, 'মনসা মংগল কাব্য' (চক্রবর্তী সম্পাদিত), পৃঃ ৩৮০-৯০ এবং মুকুন্দ রাম, 'চন্ডীমংগল কাব্য', পৃঃ ১৯১]।

সমগ্র মুসলিম আমলে শিল্প বাণিজ্যের অভাবিত উন্নতির ফলে স্বর্ণ-রৌপ্য মুদ্রার ব্যাপক চাহিদা সৃষ্টি হওয়ায় দেশের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন সময়ে ২৫টির বেশী টাকশাল প্রতিষ্ঠিত হয়। সুলতান গিয়াস উদ্দিন আজম শাহ (১৩৯০-১৪১০) ও সুলতান জালাল উদ্দিন মুহম্মদ শাহ (১৪১৪-৩১) কর্তৃক পবিত্র মক্কা ও মদীনা নগরীতে প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত মাদ্রাসা ও এতীমখানার জন্য বাংলা থেকে নিয়মিত স্বর্ণমুদ্রা পাঠানো হতো। [মোহর আলী, হিস্টোরী অব দি মুসলিমস অব বেংগল, সৌদী আরবের ইবনে সউদ ইসলামিক ইউনিভার্সিটি কর্তৃক প্রকাশিত, ১৪০ এবং ৯২৮]। ১৫৯৩ সালে আবুল ফজল উল্লেখ করেন যে, বাংলার অধিবাসীরা সোনার মোহর হাতে রাজস্ব প্রদান কেন্দ্রে হাজির হয়ে নিয়মিত রাজস্ব পরিশোধ করতো।

১৬৪০ সালে আগত পর্যটক সিবাস্তিয়ান মানরিক বলেন, বাংলায় তখন স্বর্ণ-রৌপ্য মুদ্রার এত বেশী ছড়াছড়ি ছিল যে, বিত্তবান ব্যবসায়ীদের অনেকে ধামা বা ঝুড়ি ভর্তি করে স্বর্ণ ও রৌপ্যের মুদ্রা মেপে হিসাব করতেন। ঢাকায় কয়েকটি গৃহে তিনি স্বচক্ষে এভাবে মুদ্রা মাপতে দেখেন বলে উল্লেখ করেন। মানরিকের মূলগ্রন্থ, পৃঃ ১৬২৯-৪৩, উদ্ধৃতি আবদুর রহীম পূর্বোক্ত; [মানরিকের বিবরণ, বংগ বৃত্তান্ত, অনুবাদ অসীম রায়, পৃঃ ১৮] মানরিক আরো লিখেছেন যে, শাহজাদা শূজার সুবাদারী আমলে গৌড়ের একজন কৃষক মাটির তলা থেকে তৎকালীন ৩ কোটি টাকা মূল্যের মোহর ও পাথর উদ্ধার করেছিলেন। [এস, মানরিক, পৃঃ ১২৯-৩২, বরাত উদ্ধৃতি আবদুর রহীম, পূর্বোক্ত৫১৭]।

বাংলা মুলুকে তখন জীবন ধারণের জন্য প্রয়োজনীয় সব রকম দ্রব্যাদি এবং সর্ববিধ শানশওকতপূর্ণ বিলাসপণ্য বিপুল পরিমাণে উৎপন্ন হতো। আভ্যন্তরীণ প্রয়োজন মেটার পর তার সব কিছুই বিদেশে রফতানী হতো। উচ্চমানের চীনামাটির থালা বাসন ইত্যাদি এবং কিছু কিছু সৌখিন সামগ্রী ছাড়া কোন দ্রব্যই বিদেশ থেকে আনতে হতো না। ফলে, হাজার হাজার কোটি টাকার পণ্য রফতানীর বিনিময়ে বছরের পর বছর ধরে কেবল স্বর্ণ-রৌপ্য, হীরা-জহরৎ আর মণি-মরকতই আমদানী হতো। সারা পৃথিবীর স্বর্ণরাশি এভাবে বাংলা মুলুকে এসে আটকে পড়ার পরিস্থিতি লক্ষ্য করেই পর্যটক আলেকজান্ডার ডাউ লিখেছিলেন, "ইংরেজরা আসার আগে বাংলা মুলুক ছিল এমন একটি বদ্ধ ডোবা, যেখানে সারা বিশ্বের রাশি রাশি স্বর্ণ এসে তলিয়ে হারিয়ে যায়-তা আর কোন দিনই ফিরে পাওয়া যায় না বা দেখা যায় না [আলেকজান্ডার ডাউ, ইন্দোস্তান, পৃঃ ১১২]।

www.nagorikpathagar.org

উচ্চ শিক্ষিত ফরাসী চিকিৎসক বণিক ও পর্যটক বার্নিয়ার ১৬৬৬ সালে বাংলা মুলুক সফর করে বলেন, "বাংলা মুলক হিন্দুস্তানের সর্বাপেক্ষা সম্পদশালী অঞ্চল এবং পৃথিবীর সবচেয়ে সমৃদ্ধ দেশ। মিসরকে পৃথিবীর সবচেয়ে সমৃদ্ধ ও সুন্দর দেশ বলা হয়, কিন্তু আমি দুই বার বাংলা মুলুক সফর করেছি। আমার ধারণা, মিসরকে যে প্রাধান্য দেয়া হয়, বস্তুতঃ তা বাংলারই প্রাপ্য" [বার্নিয়ার, পৃঃ ১৬৯, ৪৩৭–৩৯]। বাংলার অসাধারণ প্রাচুর্য ও সমৃদ্ধি অন্যান্য বিষয়াদির সাথে মিলে যে আকর্ষণ সৃষ্টি করে তাতে পর্তুগীজ, ইংরেজ ও ওলন্দাজদের মধ্যে একটা প্রবাদ চালু হয়েছে যে, বাংলায় প্রবেশের জন্য হাজার দরজা খোলা আছে; কিন্তু বেরোবার জন্য একটি দুয়ারও খোলা নেই [বার্নিয়ার,পূর্বোক্ত]।

বিদেশীদের কাছ থেকে আমরা এসব তথ্য পেলেও বাবু বুদ্ধিজীবী স্যার যদুনাথ সরকার সম্পাদিত বহুল পঠিত ও বিপুল প্রচারিত হিষ্টোরী অব বেংগল গ্রন্থে মোগলপূর্ব সুলতানী আমলের বাংলার বাণিজ্য ও শিল্পের সম্পূর্ণ ইতিহাস কয়েক পংক্তিতে এভাবে শেষ করা হয়েছে যে, "গোড়ার দিকে, মুসলিম শাসনাধীনে আমাদের কৃষি ও তাঁতজাতদ্রব্য মুদ্রার বিনিময়ে খুবই স্বল্প পরিমাণে বিক্রি করা সম্ভব হতো, কারণ কেবলমাত্র কিছুসংখ্যক চীনা (রৌপ্য মুদ্রা আমদানীকারক), মালয়ী, আরব (পারস্য তীরবর্তী এলাকার) এবং বছরে এক দুই বার আগত পর্তুগীজ বণিকরাই ছিল ক্রেতা। এর বাইরে, আমাদের মতোই গরীব প্রতিবেশী উড়িষ্যা ও তেলেগুভূমির সাথে সামান্য কিছু উপকূল বাণিজ্য চলতো। আভ্যন্তরীণ ক্রয়–বিক্রয়ে সম্ভাব্য সকল ক্ষেত্রেই বিনিময় প্রথা (বার্টার) বহাল ছিল এবং মুদ্রার মানের প্রেক্ষিতে দ্রব্যমূল্য অত্যন্ত কম ছিল" [ঐ পৃঃ২১২]।

বাংলায় মোগল শাসন বাস্তবে ও ব্যাপক ভিত্তিতে পত্তন হয় সম্রাট আকবর কর্তৃক ১৫৯৪ সালের ৪ঠা মে তারিখে মহারাজা মান সিংহকে বাংলার সুবাদার নিযুক্তির এবং তাঁর সাথে দুর্জন সিং, জগৎ সিং, সকত সিং প্রমুখদেরকে বাংলায় জায়গীর প্রদান করে পাঠাবার পরবর্তীতে। এর পূর্বে ১৫৭৪ সালের ২৫শে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত সমগ্র বাংলা মুলুক ছিল মোগল সাম্রাজ্যের বাইরে এবং ১৬১২ সাল পর্যন্তও বাংলার নানা স্থানে বিরাজ করছিল "বারো ভূঁইয়া" বলে অভিহিত বহুসংখ্যক সামন্ত প্রধানের শাসন। মাত্র কয়েকজন ছাড়া তাদের প্রায় সবাই ছিলেন উত্তর ভারত থেকে আগত আফগান সৈন্যাধ্যক্ষদের ও বাংলার সাবেক আফগান সুলতানদের মন্ত্রী আমীর ওমরাহদের বংশধর [যদুনাথ সরকার, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৮৭]।

১৩৪০–৪১ সালে ইবনে বতুতা সোনারগাঁও থেকে চীনা জাহাজে চড়ে ভায়া ইন্দোনেশিয়া চীন যাবার পথে ১৫ দিনের পথ অতিক্রম করার পর বাম উপকূলে একটি

www.nagorikpathagar.org

মুসলিম বসতি এলাকা দেখতে পান এবং জানতে পারেন যে, বাংলার মুসলিম সওদাগররা নিজেদের দেশ থেকে সূক্ষ্ম কাপড় নিয়ে এসে সেদেশে বিক্রয় করছে [রিহলা, পৃঃ ৬১৬, বরাত উদ্ধৃতি, মোহর আলী, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৯৩৮]।

পনেরো শতকের প্রথমদিকেও দেখা যায় বাংলা মুলক ও চীন দেশের মধ্যে স্বর্ণ, রৌপ্য, সাটিন বস্ত্র, রেশম, নীল ও সাদা চীনা মাটির পাত্র, তামা, লৌহ, মৃগনাভী, সিঁদুর, কারুকার্যময় ঘাসের মাদুর ইত্যাদি পণ্যের আমদানী রফতানী ব্যবসায় চালু ছিল। [মোহর আলী, পূর্বোক্ত, বরাত উদ্ধৃতি, পৃঃ ৯৩৭]।

১৪২৫ সালে বাংলা মূলূক সফরকারী চীনা পর্যটক মা'হুয়ান লিখেছেন, "তাদের দেশে (বাংলায়) কয়েক রং-এর 'পি-ফু' নামক কাপড় আছে। সেগুলো ৩ ফুট চওড়া ও ৫৭ ফুট লম্বা। সেগুলো যেমন সূক্ষ্ম তেমনি এত উজ্জ্বল যে, মনে হয় চিত্রিত। 'মান-চে-তি' নামে আদার মতো হলদেটে রং-এর এক প্রকার কাপড় আছে, তার প্রতিখানি ৪ ফুট প্রস্থ এবং ৫০ ফুট দীর্ঘ। এরূপ ভিন্ন ভিন্ন কাপড়ের এক দীর্ঘ ফিরিস্তি তিনি রেখে গেছেন। [মোহর আলী, পূর্বোক্ত, উদ্ধৃতি বরাত, পৃঃ ৯৩৮-৩৯]। ১৫১৫ সালে পর্তুগীজ পর্যটক দুয়ার্তে বারবোসা লিখেছেন, "বাংলায় বিপুল পরিমাণ তুলা ও তুলাজাত বস্ত্র আছে। বিভিন্ন ধরনের অতীব সুন্দর ও অত্যন্ত সূক্ষ্ম বস্ত্ররাজি রয়েছে। তাদের নিজ দেশে ব্যবহারের জন্য আছে রঙ্গিন বস্ত্রসমূহ আর বিদেশে সর্বত্র বাণিজ্যিক পণ্যরূপে প্রেরণের জন্য তারা তৈরী করে সাদা কাপড়। সেগুলো খুবই মূল্যবান। এক প্রকার কাপড়কে তারা 'এস্তার বান্তেজ' বলে-সেগুলো অতিশয় সূক্ষ্ম; আমাদের দেশের মেয়েদের শিরাবরণ এবং মুসলমান আরব ও ইরানীদের কাছে, মাথায় 'তার্বন'রূপে ব্যবহারের জন্য, এ কাপড়গুলো সর্বত্র প্রশংসিত"। এরূপ দীর্ঘ বর্ণনার পর তিনি লিখেছেন, "এ ধরনের কাপড়গুলো খন্ড হিসাবে প্রস্তুত হয়— মেয়েরা চরকায় এসব কাপড়ের সূতা কাটে এবং তারাই বয়ন করে" [বারবোসা, ২য় খন্ড পৃঃ ১৪৫-৪৬]।

সুলতানী আমলে ১৫৩৭-৩৮ সালেই সৈয়দ ৩য় মাহমুদের অনুমতি নিয়ে তৎকালীন বাংলার অন্যতম বন্দর সাতগাঁও-এ (কলকাতা থেকে ২৩ মাইল উত্তরে এবং হুগলী শহর থেকে তিন মাইল পশ্চিমে অবস্থিত) পর্তুগীজ বণিকরা কারখানা কুঠি প্রতিষ্ঠা করে। ইতালীর বণিক মাস্টার সীজার ফ্রেডারিক ১৫৬৭ সালে বাংলা মূলূক সফর করে লিখেন যে, "সাতগাঁও বন্দরে পর্তুগীজ বণিকরা প্রতি বছর ৩০/৩৫ খানি বাণিজ্য জাহাজ বোঝাই করতো। তারা চাল, নানা জাতীয় মোটা, চিকন ও সূক্ষ্ম কাপড়, লাক্ষা, চিনি, মরিচ, আদা ইত্যাদি দ্রব্য খরিদ করে নিতো [Hakliut society V.P-411-12].

www.nagorikpathagar.org

ভাগিরথী পরিবর্তিত হওয়ায় সাতগাঁও বন্দরের কর্মব্যস্ততা হ্রাস পায় এবং তার স্থান দখল করে হুগলী বন্দর। তা সত্ত্বেও ইংরেজ পর্যটক রালফ ফীশ ১৫৮৩-৯১ সালের মধ্যে বাংলা মুলূক সফর করে তাঁর ভ্রমণ কাহিনীতে উল্লেখ করেন যে, "সাতগাঁও ছিল মুসলিম নগরগুলোর মধ্যে অত্যন্ত সুন্দর একটি নগরী। বাংলায় মুসলমান সওদাগরদের জন্য প্রতিদিনই কোন না কোন বড় বাজার রয়েছে, তারা 'পংখী' (pencose) নামে পরিচিত ২৪ বা ২৬ জন দাঁড়ির সাহায্যে চালিত বড় বড় নৌকায় চাল ও অন্যান্য পণ্যসামগ্রী ক্রয়-বিক্রয় করে (Purchas-His pilgrims, X, P-183]। এই বন্দরও ছিল 'ছোট বন্দর' (porto pequeno)। 'বড় বন্দর' (porto grandie) ছিল চট্টগ্রাম। তাছাড়া এর ২শ' বছর আগে থেকে বাংলার দ্বিতীয় রাজধানী সোনারগাঁও বৈদেশিক বাণিজ্যের জন্য মশহুর ছিল। চৌদ্দ শতকের প্রথমভাগে ইন্দোনেশিয়া ও চীন দেশ থেকে বাণিজ্য জাহাজ এসে ভিড় করতো সেখানে। ১৪ শতকের ৪০-এর দশকেই ইবনে বতুতা সোনারগাঁও থেকে চীনা জাহাজে চড়ে প্রথমে জাভাদ্বীপে ও পরে চীন দেশে উপনীত হন [ইবনে বতুতা, বরাতের উদ্ধৃতি, আঃ রহীম, পৃঃ ৩৯৭]। ১৫৮৬ সালে সোনারগাঁও সফর করে রালফ ফীশও বলেন, "এখানে (সোনারগাঁও-এ) তুলাবস্ত্রের বিরাট বিপুল সমাহার রয়েছে; এই কাপড় এবং এখানকার চাল কিনে নিয়ে তারা (বণিকেরা) ভারত, শ্রীলংকা, পেগু, মলাক্কা, সুমাত্রা এবং অন্যান্য বহু স্থানে বিক্রয় করে (Purchas -His pilgrims, X, P-185].

মুসলিম শাসন আমলে বাংলার এককালীন রাজধানী তান্ডা সম্পর্কেও রালফ ফীশ জানান যে, সেখানে বিপুল পরিমাণ সূতা ও সূতী কাপড়ের ক্রয়-বিক্রয় হতো [পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৪৫]। স্থলপথে গৌড় ও জলপথে বরিশালের বাকলা বন্দরেও বিপুল পরিমাণ রেশম, রেশমী বস্ত্র, সূতীবস্ত্র ইত্যাদির বেচা-কেনা হতো।

ষোড়শ শতকের গোড়ার দিকে পর্তুগীজ পর্যটক বার্থেমা ও বারবোসা বাংলা মুলুক সফর করেন। তারা মেঘনা নদীর মোহনায় সন্দ্বীপের উত্তরে বেংগালা বন্দরে উপনীত হয়ে সেখানে বিরাট সংখ্যক মুসলিম সওদাগরকে কাপড়, চিনি ও অন্যান্য সামগ্রী ক্রয়-বিক্রয় করতে দেখেন। তাদের বর্ণনা মতে, সেকালে সূতী কাপড়, চাল, চিনি, রেশম, রেশমী কাপড়· আদা, মরিচ, লাক্ষা, মিরাবোলান ইত্যাদি ছিল বাংলার প্রধান রফতানী দ্রব্য [হ্যাকলুইট সোসাইটি, ৫ম খন্ড, পৃঃ ৪১-এ সীজার ফ্রেডারিকের বর্ণনা এবং Purchas-His pilgrims ix, বার্থেমার বর্ণনা]।

বার্থেমা উল্লেখ করেছেন যে, বেংগালা বন্দর থেকে প্রতি বছর ৫০টি জাহাজ সূতী কাপড়, রেশম ও রেশমী কাপড় বোঝাই করে নিয়ে সাগর পাড়ি দিতো। বারবোসা

www.nagorikpathagar.org

লিখেছেন, বেংগালা বন্দর থেকেই কাপড়, চিনি, আদা, মরিচ ইত্যাদি বোঝাই করে অনেকগুলো জাহাজ নিয়মিত মালয় দ্বীপপুঞ্জ, বার্মা, সিংহল, করোমন্ডেল উপকূল, আরব, পারস্য, আবিসিনিয়ার পথে সাগর পাড়ি দিতো। [Hakluyt Society. 11. P-136-37] প্রধান রফতানী পণ্যগুলোর পাশাপাশি অপেক্ষাকৃত কম পরিমাণে হলেও "ভোজ্য তেল, ঘি, শুকনা মাছ, ডাল, পান, সুপারি, পেঁয়াজ, রসুন, কর্পূর, চন্দন ও আগরকাষ্ঠ, পাটের কাপড়, ছাগল, ভেড়া, হরিণ, কবুতর ইত্যাদি" মোঘল শাসন কায়েমের পূর্বেই বাংলা মুলক থেকে পার্শ্ববর্তী অঞ্চলগুলোতে রফতানী হতো [আবদুর রহীম, সোস্যাল এন্ড কালচারাল হিষ্টোরী অব বেংগল, ১ম খন্ড, পৃঃ ৪০০]।

বাবু বুদ্ধিজীবীরা অস্বীকার করতে চাইলেও অনস্বীকার্য যে, ৭ শতক থেকে ১৬ শতকের শুরু পর্যন্ত বিশ্ব সভ্যতা-সংস্কৃতি ও শিক্ষার নেতৃত্ব যেমন-দিল্লী, গজনী, সমরখন্দ, বোখারা, বাগদাদ, দামেস্ক, কায়রো, তিমবুকতু, কর্ডোভা, গ্রানাডা, সেভিলের মুসলমানদের হাতে ছিল, তেমনি স্থলপথে চীন থেকে তুর্কীস্থান হয়ে ইউরোপ এবং সমুদ্র পথে চীন, ফিলিপাইন, জাপান ও ইন্দোনেশিয়া থেকে দক্ষিণ এশীয় উপমহাদেশ হয়ে বন্দর আব্বাসের পথে আলেকজান্দ্রিয়া রেখে ভূমধ্যসাগর পাড়ি দিয়ে ইউরোপ অবধি বাণিজ্যিক কাফেলা এবং নৌ-বহরগুলোও নিয়ন্ত্রণ করতেন মুসলমান সওদাগর ও নাবিকেরা। ভাস্কো দা গামাকে পূর্ব আফ্রিকা থেকে পথ দেখিয়ে দক্ষিণ ভারতের কালিকট বন্দরে পৌছে দেন তাঞ্জানিয়ার কিলোয়া বন্দরের মুসলিম নাবিকেরা। ইউরোপীয়রা নিজেরা সরাসরি অংশগ্রহণের পূর্বে বাংলার পণ্য সামগ্রীও মুসলিম বণিকেরাই নানা হাত বদলের ভেতর দিয়ে ইউরোপে পৌছে দিতেন। এসব মুসলিম সওদাগরদেরই একজন চট্টগ্রামের তৎকালীন প্রশাসকের আত্মীয় সওদাগর গোলাম আলীর ২টি বাণিজ্য জাহাজ মালদ্বীপের কাছে সিলভেরেয়ার নেতৃত্বে পর্তুগীজ বণিক দস্যুদল ১৫১৭ সালে লুণ্ঠন করে। [হিষ্টোরী অব বেংগল, যদুনাথ সরকার, পৃঃ ৩৫২]।

ইতিহাস থেকে মুসলামনদের গৌরব-গাঁথা ছাঁটাই করে বাদ দেয়া এবং প্রয়োজন মতো বদ-ব্যাখ্যার বেড়ী লাগিয়ে পেশ করাই বর্ণহিন্দু বাবু ঐতিহাসিকদের সাধারণভাবে অনুসৃত নীতি। বাংলাদেশের মুসলিম বা শূদ্র-সন্তানেরা যদি তাদের লেখা ইতিহাস গ্রন্থে নিজেদের উজ্জ্বল ঐতিহ্যের স্বাক্ষর খোঁজেন, তবে সেটা হবে অন্ধকার ঘরে এমন একটি কালোবিড়াল খোঁজ করা, যেটি আদৌ সে-ঘরে নেই। চলতি শতকের ৪০-এর দশক অবধি পাইকারীভাবে তাঁরা সবাই এ নীতি অনুসরণ করেছেন। পরে পরিবর্তিত রাজনৈতিক পটভূমিতে, তারা কেউ কেউ অবশ্য ভিন্নতর বুদ্ধিবৃত্তিক কূটনীতি অনুসরণ করে চলেছেন।

www.nagorikpathagar.org

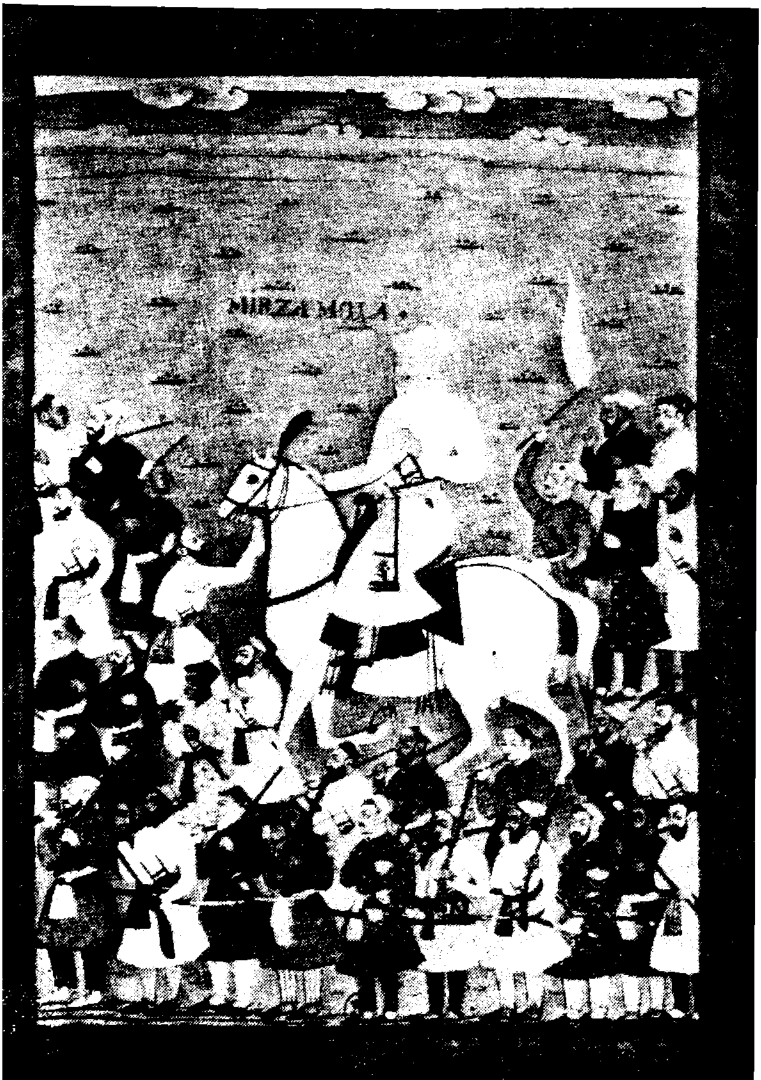

সুবাহদার মীর জুমলা

www.nagorikpathagar.org

নওয়াব শায়েস্তা খান

www.nagorikpathagar.org

কিন্তু মজার ব্যাপার, সিনিয়র পার্টনার বৃটিশ বুদ্ধিজীবীদের যোগসাজশে তাদেরই পূর্বপুরুষদের তৈরী বানোয়াট বায়া দলিলের বস্তা–বোঝাই ইতিহাসের "গাঁজার নৌকা ডাংগা দিয়ে চালাবার" কোশেশ করার সময়ে তারা একবারও ভাবেননি যে, চলতি শতকে ৩০–এর দশকে বাংগালী মুসলমান সমাজের নবজাগরণের পর ৪০/৫০–এর দশকে উচ্চ শিক্ষাপ্রাপ্ত তাদের কোন কোন সন্তান নিজেরাই নিজেদের ইতিহাস উদ্ধারে ডুবুরির দায়িত্ব গ্রহণ করবেন এবং তার ফলে বাবুদের সেরে–গুঁজে রাখা থলের বিড়ালগুলো একে একে বেরিয়ে আসবে। এরূপ কিছুসংখ্যক বেয়াড়া মুসলিম সন্তানের উদ্যোগে সোনার বাংলার অবশিষ্ট অধ্যায় অর্থাৎ পলাশীপূর্ব পৌণে দু'শ' বছরের সোনাদানার খবরও আজ বেশ কিছু পরিমাণ প্রকাশ পেয়েছে।

সম্রাট আকবরের শাসনামলে বাংলায় ছিল মোগলদের কাগজী সাম্রাজ্য। বারো ভূঁইয়া শাসিত এ মুলুকের দক্ষিণাঞ্চল খুলনার প্রতাপাদিত্য ও বরিশালের বাকলা বন্দরের (চন্দ্রদ্বীপ) রাম চন্দ্রের রাজ্যভুক্ত ছিল। তখন মেদিনীপুর থেকে চট্টগ্রাম পর্যন্ত বাংলার সমগ্র উপকূল এলাকায় পর্তুগীজদের বাণিজ্য জালের মতো বিস্তৃত ছিল। ভূঁইয়া বাবুদের সাথে তাদের সম্পর্ক এতোই ঘনিষ্ঠ ছিল যে, বাকলার রাজা রাম চন্দ্রের নৌ–বাহিনীর ক্যাপ্টেনসহ বেশ কিছু সংখ্যক এবং তার শ্বশুর প্রতাপাদিত্যের নৌ ও সেনাবাহিনীতে অনেক উচ্চ পদে পর্তুগীজদেরকে নিযুক্তি দেয়া হয়েছিল। [হিস্টোরী অব বেংগল, যদুনাথ সরকার, পৃঃ ৩৬০]।

১৫৮০ সালে বাদশাহ আকবরের ফরমান নিয়ে পর্তুগীজেরা সাতগাঁও–এর ৩ মাইল দক্ষিণ–পূর্বে হুগলীতে কারখানা স্থাপন করে। ধাপে ধাপে তাদের বাণিজ্য এতদূর প্রসার লাভ করে যে, ১৬৩২ সালে বাদশাহ শাহজাহানের গভর্ণর কাসিম খানের সৈন্যবাহিনীর সাথে যুদ্ধে পরাজিত ও উচ্ছেদ হবার পূর্ব পর্যন্ত হুগলীতে তারা প্রশাসন ও শুল্ক অফিস প্রতিষ্ঠা করে রীতিমতো প্রায় স্বাধীন সরকার পরিচালনা করছিল। ১৫১৫ সালে পর্যটক সীজার ফ্রেডারিক সাতগাঁও বন্দরে যে ৩০/৩৫ খানি পর্তুগীজ বাণিজ্য জাহাজ দেখেছিলেন, এক শতাব্দীকালের মধ্যে নিশ্চয় তার সংখ্যা বহুগুনে বৃদ্ধি পেয়েছিল। পরাজয়ের পর পর্তুগীজদের একচেটিয়া দাপট নষ্ট হলেও বাংলার বাণিজ্যক্ষেত্রে দীর্ঘকাল ধরে তারা সক্রিয় ছিল। এমনকি ১৭৮৬ সালেও দক্ষিণ বাংলার বাকেরগঞ্জের পাদ্রী শিবপুর এলাকার পর্তুগীজ সম্প্রদায় ইংরেজদের নিকট থেকে বিশেষ সুযোগ–সুবিধা আদায় করেছিল। [জে, এন, সরকার, হিস্টোরী অব বেংগল, পৃঃ৩৫০–৩৭০]।

আরাকানে অবস্থানরত কিছুসংখ্যক পর্তুগীজ আরাকানীদের সাথে মিলে দক্ষিণ বাংলায় ও বঙ্গোপসাগরে জলদস্যুর ভূমিকায় ব্যাপৃত থাকলেও ইউরোপীয় বণিকদের

www.nagorikpathagar.org

সাথে বাংলার পর্তুগীজ বণিকদের সমুদ্র-যুদ্ধের কোন খবর আজো মেলেনি। দক্ষিণ বাংলায় পর্তুগীজ প্রাধান্যের যুগে এক পর্যায়ে কিছু কিছু মুসলিম বাণিজ্য জাহাজ গভীর সমুদ্রে লুণ্ঠিত হয়। কিন্তু ওলন্দাজ ও আর্মেনীয় খৃষ্টানদের সাথে বাংলার বাণিজ্য অব্যাহত থাকে। ১৬৩০-এর দশক থেকে ওলন্দাজদের বাণিজ্য ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পায়। এ সময়ে ইংরেজরাও উড়িষ্যায় অবস্থিত তাদের বালেশ্বর বাণিজ্য ঘাঁটি থেকে জাহাজ পাঠিয়ে বাংলার পণ্যসামগ্রী সংগ্রহ করতো। তবে, তখন বাংলায় ইংরেজদের তুলনায় ওলন্দাজদের বাণিজ্যের পরিমাণ ছিল দশগুণ বেশী। [জে, এন, সরকার, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৩৮৩]।

তখনই ১৬৫৯ সালের ২৮শে জানুয়ারী ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর ইংল্যান্ডস্থ সদর দফতর থেকে বাংলায় তাদের এজেন্টকে মাল খরিদের ফর্দ সম্বলিত যে চিঠি লেখা হয়, তার একখানিতে ৯ হাজার পাউন্ড অর্থাৎ সেকালে ৯০ হাজার টাকা ও বর্তমান মুদ্রামানে ২২ কোটি টাকার অর্ডার ছিল [বরাতের উদ্ধৃতি, মোহর আলী, ১/বি, পৃঃ ৯৪৫]।

১৬৬১ সালে ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী বাংলায় প্রথম তাদের কারখানা প্রতিষ্ঠা করেন হুগলী বন্দরে। তাদের বাণিজ্য বৃদ্ধি পেয়ে ১৬৮০ সালে দাঁড়ায় ১ লাখ ৫০ হাজার পাউন্ড এবং পরবর্তী বছর হয় ২ লাখ ৩০ হাজার পাউন্ড অর্থাৎ তৎকালীন মুদ্রামানে ২৩ লাখ টাকা ও বর্তমান (১৯৮৮) মুদ্রামানে কমপক্ষে ৫ শ' কোটি টাকা [জে এন সরকার, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৩৮৩]। তখনো বাংলার বাণিজ্যের প্রধান ভাগীদার ছিল ওলন্দাজ বণিকেরা এবং তাদের পাশাপাশি কর্মরত ছিল আর্মেনীয় খৃষ্টান, আরব ও ইরানী মুসলমান এবং নবাগত ফরাসী বণিকেরা। সমুদ্রপথ ছাড়াও উপমহাদেশের বিভিন্ন স্থানে নদী ও সড়ক পথে বাংলার পণ্যসামগ্রী রফতানী হতো। এছাড়াও ছিল স্থলপথে কর্মরত আর্মেনীয় খৃষ্টান, আরব ও ইরানী মুসলমান এবং নবাগত ফরাসী বণিকেরা। সমুদ্রপথ ছাড়াও উপমহাদেশের বিভিন্ন স্থানে নদী ও সড়ক পথে বাংলার পণ্য সামগ্রী রফতানী হতো। তার উপরেও ছিল স্থল পথে কর্মরত ইরান, তুরান ও মধ্যএশীয় বণিকেরা। এমনকি বাংলার সূক্ষ্ম বস্ত্র তখন রাশিয়ার বাজারেও বিক্রি হতো। একবার রাশিয়ায় প্রেরিত বাংলার পণ্যবাহী ৩ খানি জাহাজের দুইখানি আরব সাগরে ঝড়ের কবলে পড়ে ডুবে যায়। [আর কে মুখার্জী, হিস্টোরী অব ইন্ডিয়ান শিপিং, পৃঃ ১৫৭]।

বাদশাহ শাহজাহান ও আওরঙ্গজেব আলমগীরের শাসনামলে (১৬২৭-১৭০৭) বাংলা মুলুক ছিল আইন-শৃংখলার প্রশ্নে সম্ভবতঃ তৎকালীন পৃথিবীতে সর্বাধিক শান্তিপূর্ণ দেশ। এ সময় আভ্যন্তরীণ শিল্প উৎপাদন ও বৈদেশিক বাণিজ্যে অব্যাহত

www.nagorikpathagar.org

নওয়াব মুর্শিদ কুলি খান

www.nagorikpathagar.org

শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হয়। বাংলার শিল্প বাণিজ্যের সমৃদ্ধির এই জোয়ার ১৭৫৭ পর্যন্ত অব্যাহতছিল।

ইতিহাসের এ অধ্যায়েই চান্দেরনগর, কাসিমবাজার, পাটনা ও ঢাকায় (ফরাশগঞ্জে) ফরাসীদের বাণিজ্য-কুঠি ও কারখানা প্রতিষ্ঠিত হয় এবং সক্রিয় থাকে। ইংরেজরাও এ সময়েই হুগলী, কোলকাতা, ঢাকা, রাজশাহী, ইংরেজ-বাজার (মালদহে) ও পাটনায় কারখানা-কুঠি প্রতিষ্ঠা করেন। এদের পাশাপাশি ওলন্দাজ, আর্মেনীয়, স্পেনীয়, জার্মান, আরব, ইরানী, তূরানী বণিকেরাও ছিলেন।

এ সময়ে বাংলার কৃষি ও শিল্পজাত রফতানিপণ্যের দীর্ঘ তালিকা ইতিহাসে খুঁজে পাওয়া গেছে। সেগুলোর মধ্যে, চাউল, লবণ, চিনি, মিছরি, ঘি, মসলিন বস্ত্র, সাধারণ সূতী কাপড়, পাটের কাপড়, রেশমী কাপড়, রেশম, আফিম, সল্টপিটার (বারুদ তৈরীর উপাদান), সুপারী ও পান, পাট, পাটজাত দ্রব্য, সোহাগা, কর্পূর, মোম, শুকনা মাছ, লাক্ষা, নীল, আদা, মরিচ, হলুদ, দারুচিনি, আগর কাঠ ইত্যাদি ছিল প্রধান। এগুলোর মধ্যে মসলিন বস্ত্রের মাহাত্ম্য বাড়িয়ে বলার অবকাশ নেই। তৎকালীন সভ্য জগতের সর্বত্র রাজা-বাদশাহ, সম্রাট-শাহানশাহের পরিবারে সম্রাজ্ঞী ও শাহজাদীদের কাছে মসলিনের কদর ছিল। বস্ত্রের উৎকর্ষ, সূক্ষ্মতা, বুনন, বর্ণ, স্বর্ণ ও রৌপ্যের কারুকাজভেদে মসলিন ছিল অনেক প্রকারের; অন্যান্য সূতী কাপড় মিলিয়ে কয়েক কুড়ি প্রকার বাংলাদেশী কাপড় বিশ্বের বাজারে চালু ছিল। বণিক পর্যটক বার্থেমা (১) বৈরাম, (২) লিমোনে, (৩) লিজাতি, (৪) বাইনতার, (৫) দৌউজার ও (৬) সীনাবাফ কাপড়ের উল্লেখ করেন। [বরাত উদ্ধৃতি, আব্দুর রহীম, বাংলার সমাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস, পৃঃ ৪১৪]। বারবোসার বিবরণে (১) এস্তারভানদিস, (২) মামোনা (৩) দুগুয়াজাস, (৪) চাউতারী, (৫) সীনাবাফ এবং ঈস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর দলিলপত্রে (১) মলমল, (২) তানজীব (৩) আবরোয়ান (৪) আল্লাবালী (৫) নয়ণসুক (৬) বদ্দুনখাস (৭) সরবতি(৮) তেরিনদাম (৯) সরকার আলি (১০) জামদানী (১১) হাম্মাম (১২) দরিয়া (১৩) শিরবন্ধ (১৪) জংগল খাসা (১৫) ঝুনা (১৬) রাড (১৭) রাফতা (১৮) সানো (১৯) গুররাহ (২০) আন্নিতি ও চিন্তজ [এন কে সিংহ, পৃঃ ১৭৭-৭৯] এবং ফিলিপ ফ্রান্সিস-এর তালিকায় (১) চোপ্পা (২) মোয়ামী (৩) লাহী (৪) মুক্তা ও (৫) মুগগা নামীয় কাপড়ের উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায় [পি, ফ্রান্সিস, মিনিটস অব সেটেলমেন্ট অব রেভিন্যু অব বেংগল, পৃঃ ৯৮]।

রফতানি পণ্য হিসাবে মসলিন ও সূতী কাপড়ের পরই দ্বিতীয় স্থান ছিল রেশম ও রেশমী কাপড়ের। তার পরই ছিল আফিম ও সল্টপিটারের গুরুত্ব। কিন্তু সেকালে বাংলার শিল্পোৎপাদন কিভাবে কি পর্যায়ে ছিল এবং রফতানি পণ্যের পরিমাণ ও

www.nagorikpathagar.org

আর্থিক মূল্য কতো ছিল, তার বিস্তারিত খবর পাওয়া আজ অসম্ভব। বৃটিশ-বর্ণহিন্দুর সাত পুরুষব্যাপী নিপীড়ন-অভিযানের পরিণতিতে বাংলার মুসলমানেরা চলতি শতকের তৃতীয় দশক অবধি শিক্ষা-সংস্কৃতির অংগন থেকে ছিলেন সম্পূর্ণ নির্বাসিত। সীমাহীন জুলুম চালিয়ে তাদের বাপের নাম ভুলিয়ে দেয়া হয়েছিল। আর বৃটিশ বর্ণহিন্দু ঐতিহাসিকরা ব্যস্ত ছিলেন মুসলমান শাসনামলের উজ্জ্বল দিকগুলোকে মসীলিপ্ত করে কেবল তাদের ত্রুটি-বিদ্যুতির বিশদ ও বিস্তারিত বর্ণনাসম্বলিত ইতিহাস গ্রন্থ পেশ করে মুসলিম সন্তানদের মন ও মগজে হীনমন্যতার বীজ বপন করতে এবং নিজেদের সন্তানদেরকে জাগৃতির চেতনায় উজ্জীবিত করতে। তবুও তাদের সব বাধার ফৌকল গলিয়ে এ পর্যন্ত যেটুকু তথ্যাবলী আমাদের হাতে এসে পৌছেছে তা-ও অবিশ্বাস্যরূপে বিস্ময়কর। এ ক্ষেত্রেও আমাদেরকে খোলামেলা তথ্য ও বর্ণনার জন্য নির্ভর করতে হয় বিদেশী পর্যটকদের উপর। বৃটিশ-বর্ণহিন্দু বুদ্ধিজীবীদের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করতে হয় তাদের গোপন করে যাওয়া হিসাবাদি ও চিঠিপত্রের ফাঁক-ফৌকল থেকে।

১৬৪০ খৃষ্টাব্দে বাংলা মুলুক সফর করে পর্তুগীজ পর্যটক সিবাস্তিয়ান মানরিক বলেন, বাজারে মোতায়েন পণ্যদ্রব্যের যে কোন এক প্রকারের মাল দিয়ে কয়েকটি জাহাজ বোঝাই করা যায় [মানরিক, ট্রাভেলস, হাকলুয়িত সোসাইটি, পৃঃ ১০৪, ১১৮ ও১৩৫]।

১৬৬৬ সালে ফরাসী ডাক্তার ব্যবসায়ী পর্যটক বার্নিয়ার বাংলা মুলুক সফর করে লিখেছেন, "বাংলার মতো দুনিয়ার অন্য কোথাও বিদেশী বণিকদেরকে আকৃষ্ট করার জন্য এত বেশী রকমের মূল্যবান পণ্যসামগ্রী দেখা যায় না----- বাংলায় এতো বিপুল পরিমাণ সূতী ও রেশমী পণ্যসামগ্রী রয়েছে যে, কেবল হিন্দুস্তান বা মোগলদের সাম্রাজ্যের নয়, বরং পার্শ্ববর্তী দেশগুলো এবং ইউরোপের বাজারসমূহের জন্য বাংলাকে এ দু'টি পণ্যের সাধারণ গুদামঘর বলে অভিহিত করা চলে। মিহি ও মোটা, সাদা ও রঙিন ইত্যাদি সকল রকম সূতী বস্ত্রের বিরাট স্তুপ দেখে আমি মাঝে মাঝে বিস্ময়াভিভূত হয়েছি যে, কেবলমাত্র ওলন্দাজ বণিকেরা একারাই বিভিন্ন প্রকারের ও মানের সাদা এবং রঙ্গীন সূতীবস্ত্র বিপুল পরিমাণে, বিশেষ করে জাপান ও ইউরোপে রফতানী করে থাকেন। ইংরেজ, পর্তুগীজ ও দেশীয় বণিকেরাও এসব দ্রব্যে প্রচুর ব্যবসা করে থাকেন। রেশম ও বিভিন্ন রেশমজাতদ্রব্য সম্পর্কেও একই কথা প্রযোজ্য" [বার্নিয়ার, পৃঃ ৪৩৯]।

বাংলার চাউল সম্পর্কে বার্নিয়ার বলেন, 'বাংলায় এতো বেশী পরিমাণ চাউল উৎপান্ন হয় যে, উহা কেবল প্রতিবেশী দেশগুলোতেই নয়, দূরবর্তী রাজ্যগুলোতেও

www.nagorikpathagar.org

নওয়াব আলীবর্দী খান

www.nagorikpathagar.org

রফতানী করা হয়ে থাকে। গংগার পথে এ চাউল পাটনার পশ্চিমাঞ্চলে প্রেরণ করা হয় এবং সমুদ্রপথে মসলিপত্তম ও করোমন্ডল উপকূলের নানাস্থানে প্রেরিত হয়। সাগর পারের রাজ্যসমূহে, বিশেষ করে সিংহল ও মালদ্বীপেও চাউল পাঠানো হয়।" তিনি লিখেছেন, "বাংলা মুলুক চিনি উৎপাদনেও একই রকম সমৃদ্ধিশালী। এই চিনি গোলকুন্ডা ও কর্নাটক রাজ্যে (সেখানে সামান্য চিনি উৎপাদিত হয়), মোকা ও বসোরা শহরের মাধ্যমে আরব ও মেসোপটেমিয়ায় এবং বন্দর আব্বাসের পথে পারস্য পর্যন্ত সরবরাহ করা হয়ে থাকে।" বার্নিয়ারের বর্ণনা মতে, বাংলা থেকে সেযুগে সব থেকে উন্নত ধরনের লাক্ষা, আফিম, মোম, মরিচ, গন্ধদ্রব্য এবং ঔষধপত্রও রফতানী হতো। তিনি বলেন, "ঘি-এর উৎপাদন এত প্রচুর যে, রফতানীর ক্ষেত্রে এটা খুব ভারী বস্তু হওয়া সত্ত্বেও সমুদ্র পথে বহুস্থানে প্রেরিত হয়" [বার্নিয়ার, পৃঃ ৪৩৭-৩৯]। বার্নিয়ার জানান, "বাংলা মুলুকের পর্তুগীজ অধ্যুষিত এলাকায় অর্থাৎ দক্ষিণ বাংলায় নানান জাতীয় মিষ্টিও তৈরী হয়ে বিদেশে রফতানী হয়ে থাকে" [পূর্বোক্ত, ৪৩০, ৪৩৮]।

বার্নিয়ার আরো লিখেছেন, "ওলন্দাজেরা মাঝে মাঝে কাসিমবাজারে তাদের রেশম কারখানায় ৭ বা ৮ শত দেশীয় কারিগর নিয়োগ করেন। অনুরূপভাবে ইংরেজ ও অন্যান্য বাণিকেরাও নিজ নিজ কারখানায় দেশীয় লোকদেরকে নিয়োগ করেন। ওলন্দাজেরা যে বিপুল পরিমাণ সূতীবস্ত্র রফতানী করেন তা দেখে মাঝে মাঝে আমি বিস্ময়াবিষ্ট হয়ে পড়ি" [বার্নিয়ার পৃঃ ৪৪০]। মুর্শিদাবাদ নগরী থেকে ২০ মাইল দক্ষিণে অবস্থিত কাসিমবাজার শিল্প এলাকা পরিদর্শন করে অপর একজন পর্যটক ট্যাভার্নিয়ার ১৬৬৬ সালেই লিখেছেন, "সে সময়ে কাশিমবাজারের কাঁচা রেশম উৎপাদনের পরিমাণ ছিল বার্ষিক ২৫ লক্ষ পাউন্ড। তার মধ্যে থেকে ৭ $\frac{১}{২}$ লক্ষ পাউন্ড গুজরাটসহ উপমহাদেশের অন্যান্য স্থানে রফতানী হতো-তার কিছু অংশ তাতার বণিকেরা মধ্য এশিয়ায় নিয়ে যেতো। ওলন্দাজেরা প্রতিবছর ৭ $\frac{১}{২}$ লক্ষ পাউন্ডের মতো জাপান ও ইউরোপে রফতানী করতো। বাদ বাকি ১০ লক্ষ পাউন্ড বাংলার কারখানাগুলোতে ব্যবহৃত হতো।" [ট্যাভার্নিয়ার, ২য় খন্ড, পৃঃ ২-৩; জে সি সিংহ, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৩৫-৩৬]। স্মর্তব্য যে, কাসিমবাজার ছিল বাংলার অন্যতম রেশম শিল্প এলাকা-রাজশাহী, মালদহ,রংপুর এবং নদীয়াতেও প্রচুর রেশম ও রেশমী বস্ত্র উৎপন্ন হতো [রীয়াযুস সালাতীন, মূল গ্রন্থ, পৃঃ ৫০]। ১৬৮০ সালের দিকেও পর্যটক স্ট্রেশাম মাস্টার কাসিমবাজারের পার্শ্ববর্তী গ্রামগুলো তুঁতগাছে পরিপূর্ণ দেখতে পান [জে সি সিংহ, পৃঃ ৩৫-৩৬]। বর্গী হামলার যুগে রেশম চাষ ও বস্ত্র বয়ন শিল্প ভাগিরথী নদীর পূর্বপাড়ে বোয়ালিয়া, জংগীপুর, কুমারখালী, রাধানগর ইত্যাদি অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। নবাব আলীবর্দীর আমলে একমাত্র মুর্শিদাবাদের শুল্ক অফিসে শুধু দেশীয় বিনিয়োগে ৭০

www.nagorikpathagar.org

লক্ষ টাকা ১৯৮৯ সালের মুদ্রামানে ১,৪০০,০০০০০০০ (এক হাজার চার শত কোটি টাকা) মূল্যের রেশমের হিসাব ঘাপলারূপে ধরা পড়ে [জে সি সিংহ, পৃঃ ৩৩-৩৬]। এটি ছিল একটি মাত্র ঘাপলার ব্যাপার। সারা দেশে এমন ঘাপলা আরো নিশ্চয়ই ঘটতো। কার্পাসের চাষ এবং সূতা ও সূতী কাপড় উৎপাদন ছড়িয়ে ছিল সারা বাংলার প্রায় প্রতিটি পল্লীতে। তবে সর্বোৎকৃষ্টমানের মসলিন কাপড় উৎপন্ন হতো সোনারগাঁও, জাহাঙ্গীর নগর ও জংগলবাড়ী অঞ্চলে এবং সেসব কাপড়ের সূতাও উৎপন্ন হতো স্থানীয়ভাবে এবং টাংগাইলের বাজিতপুর অঞ্চলে। বর্তমানের টাংগাইল শাড়িও এই বাজিতপুর অঞ্চলেই তৈরী হয়। "ঢাকার ১২ মাইল দক্ষিণ-পূর্বে অবস্থিত ফিরিংগিবাজার (বৈদ্যের বাজার কি?) থেকে মেঘনা নদীর তীর ধরে ইদিলপুর পর্যন্ত সাগরসংগম থেকে ২০ মাইল উত্তরে শুরু হয়ে দৈর্ঘ্যে ৪০ মাইল ও প্রস্থে কোথাও কোথাও ৩ মাইল এলাকা নিয়ে -কেদারপুর, বিক্রমপুর, রাজেন্দ্রনগর, কার্তিকপুর ও ইদিলপুর পরগণাভুক্ত এই এলাকায় পৃথিবীর সর্বোৎকৃষ্ট তুলা উৎপন্ন হয়। ---- ভারতের অন্য কোন অঞ্চলে অথবা মরিশাস দ্বীপপুঞ্জ বা বোর্বন অঞ্চলে-পৃথিবীর কোথাও, আমি যতদূর খবর রাখি, ঢাকার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের তুলার মতো উৎকৃষ্টমানের তুলা জন্মে না" [ঢাকায় অবস্থানরত ইংরেজ বাণিজ্য প্রতিনিধি জে বি টেলরের বর্ণনা, উদ্ধৃতি, আবদুর রহীম পূর্বোক্ত,পৃঃ ৪১৭-১৮]।--

ফিরিংগিবাজার থেকে ইদিলপুর অবধি লক্ষ্যা ও ধরেশ্বরী নদীর তীর ভূমিতে রূপগঞ্জের কিছুটা উপর পর্যন্ত ১৬ মাইল বিস্তৃত এবং ছোট ব্রহ্মপুত্রের তীরভূমিতে ধলেশ্বরীর উত্তরে কয়েক মাইল এলাকা ঢাকা প্রদেশে (বর্তমান বৃহত্তর ঢাকা জেলা) ব্যবহৃত অধিকাংশ কার্পাস সরবরাহ করে। অবশিষ্টাংশ কার্পাস ঢাকা জেলা বলদাখাল (পরগণা), ভওয়াল (পরগণা) ও আলেপসিং (মোমেনশাহীর পরগণা) এলাকায় উৎপন্ন হয়। তাছাড়া ভূসনা (যশোর জেলার পরগণা) এবং রাজশাহী প্রদেশের (বৃহত্তর রাজশাহী জেলা) কিছু কিছু সূতা জাহাংগীর নগর এলাকায় আনিত হয় [এ, করিম, ঢাকা, জে ,এ, এস, পৃঃ, ৭ম খন্ড, ২য় অধ্যায়, পৃঃ ৩১৩-১৪ তে, জে, বি, টেলরের উদ্ধৃতি]। শুধুমাত্র এসব অঞ্চলে উৎপন্ন 'ফটি' নামক সূতা দ্বারাই মসলিন কাপড় তৈরী হতো। সুরাট ও মীর্জাপুর থেকে আমদানীকৃত সূতা মসলিন বা মিহি কাপড় তৈরীতে ব্যবহৃত হতো না- সেগুলো দ্বারা ইউরোপীয় বণিকদের কুঠি-কারখানায় মোটা কাপড় তৈরী হতো।---- বীরভূমের সূতার উৎপাদন ছিল ব্যাপক, কিন্তু এর দ্বারা কেবলমাত্র মোটা বস্ত্র তৈরী হতো। বর্ধমানে 'নূরমা', 'মুহরী' ও বোগ্গা-এই তিন প্রকারের সূতার অস্তিত্ব ছিল। নয়নসুখ, মলমল, শরবতি, দরিয়া ইত্যাদি বস্ত্র তৈরীর জন্য নূরমা সূতা ব্যবহৃত হতো। গোজি ও গুররা বস্ত্রের জন্য 'মহরী' এবং 'গুররা', মিশালী কাপড়ের জন্য 'গুররা' 'মুহরী' ও 'বোগগা' এই তিন প্রকারের সূতা প্রস্তুত হতো।

www.nagorikpathagar.org

কাউর–এ চমৎকার সূক্ষ্মসূতা হতো। মেদিনীপুরে কুরেরারা ও 'মুহরী'–এ দু' প্রকারের সূতার উৎপাদন ছিল। কুরেরারা ছিল কোমল ও সূক্ষ্ম ধরনের এবং এ সূতা সূক্ষ্ম বস্ত্রাদি যেমন–'নয়মসুখ', 'শরবতি' ও অন্যান্য প্রকার মসলিন তৈরীর জন্য ব্যবহৃত হতো। মুহরী সূতা দিয়ে 'দিমিতি' ও অপেক্ষাকৃত মোটা অন্যান্য কাপড়াদি বোনা হতো। উত্তরে ব্রহ্মপুত্র ও দক্ষিণে চলন বিলের মধ্যবর্তী হারিয়াল অঞ্চলের 'দেশ' ছিল অপেক্ষাকৃত মোটা সূতা। শান্তিপুর অঞ্চলের সূতা ছিল উৎকৃষ্টমানের [এন, কে, সিনহা, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১১৩–১৯]।

গোলাবারুদ তৈরীর একটি অত্যাবশ্যক উপাদান সল্টপিটার মুসলিম বাংলায় বিপুল পরিমাণে উৎপন্ন হতো। বাংলার রংপুর ও পূর্ণিয়া জেলা ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের একটি প্রধান অর্থকরী পণ্য ছিল সল্টপিটার। এছাড়া বিহারের হাজীপুর, ত্রিহুত ও শরণ জেলায় তৈরী সল্টপিটারও বাংলার নদীপথ হয়ে সমুদ্রপথে বহির্বিশ্বে রফতানী হতো। গবাদিপশুর গোয়াল ঘরের পেছনের পশুমূত্র মিশ্রিত মাটি থেকে নির্যাস বের করে তা জ্বাল দিয়ে শুকিয়ে নিয়ে সল্টপিটার তৈরী হতো।

আফিমের চাষও উত্তর বাংলা ও পূর্ব বিহারের জেলাগুলোতে করা হতো। মুসলিম আমলে মাদকদ্রব্য আফিমের ক্রয়–বিক্রয় দেশের অভ্যন্তরে নিষিদ্ধ ছিল। এ কারণে চীন, জাপান, মালয়, সিংহল প্রভৃতি দেশের মতো বাংলা মুলুকে আফিমের নেশা কোনকালেই ব্যাপক বিস্তৃতি লাভ করেনি। সরকার নিযুক্ত এজেন্টের মাধ্যমে চাষীদের কাছ থেকে সরাসরি আফিম ক্রয় করে তা বিদেশী বণিকদের সরবরাহ করা হতো।

১৭৫৭–এর পূর্ববর্তী শতাব্দীগুলোতে বহির্বিশ্বে বাংলার চিনিরও বিপুল চাহিদা ছিল। তৎকালের ওলন্দাজ বণিকদের এক রিপোর্টে জানা যায় যে, তারা যেটুকু জানতে পেরেছিলেন সে মতে চিনির বার্ষিক সরবরাহ ছিল ৮০ হাজার মণ [বার্নিয়ার, পৃঃ ৪৩৭]। ১৬৬৬ সালে বাংলা সফরকারী বার্নিয়ারের ভাষায়, "বাংলায় প্রচুর চিনি উৎপন্ন হয়। তা গোলকুন্ডা ও কর্নাটকে রফতানি হয়ে থাকে। তাছাড়া বাংলার চিনি মোকা ও বসোরা শহরের মাধ্যমে আরব, মেসোপটমিয়া প্রভৃতি রাজ্যে এবং বন্দর আব্বাসের মধ্য দিয়ে পারস্যে রফতানি করা হয়ে থাকে [বার্নিয়ার, পৃঃ ৪৩৭]। তাঁর দেড়শত বছর আগে ১৫০৩ সালেও ইতালীয় বণিক লিউইচ বার্থেমা ও ১৫১৫ সালে পর্তুগীজ পর্যটক বারবোসা মেঘনার মোহনায় বেংগালা বন্দর থেকে চিনি রফতানি হতে দেখে বলেছেন যে, "চিনি দিযে তারা বহু জাহাজ বোঝাই করে বিক্রয়ের জন্যে অন্যান্য দেশে প্রেরণ করে" [হালকুয়েত সোসাইটি, ২য় খন্ড, পৃঃ ১৪৫ ও জে, এন, দাসগুপ্ত, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১১৭]। মধ্য দক্ষিণ ও পূর্ব বাংলার জেলাগুলো ছিল আখ ও চিনি উৎপাদনের জন্য

www.nagorikpathagar.org

মশহুর। খেজুর গুড় থেকেও সুগন্ধী 'খান্দেশ্বরী' চিনি তৈরী হতো। আমি নিজেই শৈশবে ১১৪ বছর বয়েসী নানার কাছে শুনেছি, তাঁরাও তাঁদের দাদা নানাদের কাছ থেকে শ্রুতি পরম্পরায় জেনেছিলেন সেকালের খলিফাতাবাদ বর্তমান বাগেরহাটের পার্শ্ববর্তী নিভৃত পল্লী রহিমাবাদ তৎকালে যশোর জেলার বিখ্যাত চিনির বন্দর 'মোকাম রহিমাবাদ' বলে প্রসিদ্ধ ছিল। সেকালে বাংলার বহুস্থানে এ রকম বহু মোকাম বিরাজমান ছিল। পলাশী যুদ্ধের পূর্ববর্তী ৪/৫ শতাব্দীকালে বাংলা মুলুকে পাট থেকেও শাড়ী ও অন্যান্য বস্ত্র তৈরী হতো। মনসামংগল কাব্যে উল্লেখ আছে, চাঁদ সওদাগর বিদেশে পাটবস্ত্র বা পাটের শাড়ী ও ধুতি সওদা হিসেবে নিয়ে গিয়ে বিক্রয় করতেন। [মনসা মংগল, বিজয় গুপ্ত, পৃঃ ১৩৩]। ১৮ শতকের গোড়ার দিকেও পাটের চট, ব্যাগ ও রশি বিদেশে রফতানি হতে দেখা যায়।

সেকালের পৃথিবীতে লাক্ষা ছিল একটি অতি ব্যবহৃত সামগ্রী। গালা হিসাবে আসবাবপত্র পালিশসহ নানা ধরনের কাজে এবং রং হিসাবে বস্ত্রসহ নানা রকম শিল্পজাত পণ্যে লাক্ষা ব্যবহৃত হতো। বৈদেশিক বাণিজ্যে অনেক দেশের বাজারে বাংলাদেশী লাক্ষার মনোপলি ছিল।

প্রাচীনকাল থেকে বাংলায় নীলের চাষ হতো। মুসলিম শাসনামলে বৈদেশিক বাণিজ্য বিস্তার লাভ করায় নীলও রফতানি পণ্যের তালিকাভুক্ত হয়। ফরিদপুর, ঢাকা, রাজশাহী, পাবনা, নদীয়া, মুর্শিদাবাদ যশোর ও খুলনায় নীলের চাষ হতো। সামুদ্রিক লবণ উৎপাদনের জন্য বাংলার প্রসিদ্ধি ছিল। অবশ্য বিত্তশালী জনসাধারণের কেউ কেউ সখ করে খনিজ লবণ খেতে পছন্দ করতো বিধায় উত্তর ভারত থেকে বাংলা মুলকে লবণ আমদানিও হতো। [উল্লেখ্য যে, বর্তমান কালেও এটা পরীক্ষিত সত্য যে, সারা পৃথিবীতে যে ২/৩টি এলাকার সমুদ্রের পানিতে সর্বাধিক লবণাক্ততা রয়েছে, বঙ্গোপসাগর তার একটি। একারণে, অনেকে এরূপও মনে করেন যে, বঙ্গোপসাগরের পানিই বাংলার এক অতি গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ। এ পানিকে লবণদ্রব্য (ব্রাইনওয়াটার) রূপে ব্যবহার করে যে নানা জাতীয় ও বিপুল পরিমাণ সোডিয়াম সমৃদ্ধ কেমিক্যালস তৈরী হতে পারে, তার বিক্রয়লব্ধ অর্থেই এদেশবাসীর খাদ্য সংস্থান সম্ভব]। যা হোক, বর্তমান সাতক্ষীরা জেলার রায়মঙ্গল ছিল সেকালে দক্ষিণ বাংলার লবণ ব্যবসায়ের প্রধান মোকাম বা বন্দর।

এসব পণ্যের বৈদেশিক বাণিজ্যে কেবল ইউরোপীয়রাই নিয়োজিত ছিলেন না। বাংগালী মুসলিম সওদাগরেরাও ছিলেন। তাদের বিরাট বিরাট জাহাজগুলো এদেশেই তৈরী হতো। ৮ম ও নবম শতকেও আরব ও চীনা বণিকদের জাহাজ মেরামত হতো

www.nagorikpathagar.org

'শাতিল গাঙ' (চিটাগাং) বন্দরে এবং মেঘনার মোহনায় তৎকালীন বিশালায়তন সন্দ্বীপের কোন এক অংশে বা কাছে অবস্থিত 'সামান্দার' বন্দরে [মোহর আলী, হিষ্টোরী অব দি মুসলিমস অব বেঙ্গল, পৃঃ ৩৩]। ইবনে বতুতা যে বাংগালী মুসলিম বণিকদেরকে মালয়–ইন্দোনেশিয়া অঞ্চলে বাংলাদেশী কাপড় বিক্রি করতে দেখেছিলেন তারা, অথবা বারবোসার আমলে 'বেংগলা বন্দরের যেসব বাংগালী মূর (মুসলমান) চিনি ব্যবসায়ীরা জাহাজ বোঝাই চিনি নিয়ে সমুদ্র পাড়ি দিতেন তাদের জাহাজগুলো এদেশেই তৈরী হতো। বাংলায় তৈরী এসব বিরাট বিরাট জাহাজগুলো আরবের মোকা বন্দরে নির্মিত জাহাজের মতোই মজবুত হতো।

এর পাশাপাশি সারা বাংলায় সমতল,অর্ধসমতল ও টীলাভূমি ইত্যাদির গঠনবিন্যাস অনুযায়ী, মরিচ, হলুদ, রসুন, দারুচিনি উৎপন্ন হয়ে এবং সিলেট, রংপুর, কোচবিহার, আসাম অঞ্চলের অরণ্য থেকে সংগৃহীত চন্দন কাঠ ও আগর–কাঠ বিদেশেরফতানিহতো।

প্রশ্ন উঠতে পারে, এতো যে রফতানি, এর বিনিময়ে আমদানী হতো কি কি পণ্য কত পরিমাণে? বিষয়টি বিবেচনার আগে অবশ্য স্মর্তব্য যে, পলাশী যুদ্ধের প্রাক্কালেও বাংলা মুলুকের জনসংখ্যা পৌনে তিন কোটির কাছাকাছি ছিল। ১৮৭২ সালের আদমশুমারী অবধি জনসংখ্যার প্রবৃদ্ধির হার বিবেচনা করে সে হিসাব পশ্চাতমুখী ভাবে টেনে নিলে বাংলা মুলুকের জনসংখ্যা সতেরো শতকের মধ্য ভাগে (১৭৬৯–এর কৃত্রিম মন্বন্তরে নিহত ১ কোটি বাদ দিয়ে) মোটামুটিভাবে ২ কোটি এবং ষোল শতকের প্রথমভাগে দেড় কোটির কাছাকাছি দাঁড়ায়। পূর্ণিয়া ও ছোট নাগপুর থেকে সিলেট এবং নেপালের সীমান্ত থেকে মেদিনীপুর ও চট্টগ্রাম পর্যন্ত বিস্তৃত এই বিশাল দেশ বা মুলুকে বাংগালা দেড়, দুই, আড়াই বা তিন কোটি জনসংখ্যা নিয়ে বিরাজ করছিল এবং বিদেশী পর্যটকদের সূত্রে প্রাপ্ত উপরোক্ত বর্ণনায় প্রকাশ পায় যে, কেবল জীবন ধারণ নয়, প্রাচুর্যপূর্ণ সৌখিন জীবন যাপনের জন্য প্রয়োজনীয় সব উপকরণই এদেশে এত বেশী উৎপন্ন হতো যে, আভ্যন্তরীণ প্রয়োজন মিটিয়ে তা বিদেশে রফতানি হতো। সুতরাং পণ্য সামগ্রী আমদানির তেমন কোন অবকাশই তখন এদেশে ছিল না।

পলাশী যুদ্ধের পূর্ববর্তী দশকে পারস্য উপসাগর ও লোহিত সাগরের তীরবর্তী দেশগুলোতে বাংলা মুলুক থেকে সেকালের মুদ্রায় ৩০ লাখ টাকার পণ্য রফতানি হতো। [এন, কে, সিনহা, পৃঃ ১২৮, উদ্ধৃতি আব্দুর রহীম, ২য় খন্ড, পৃঃ ৪৩৩]। ১৭২৪–২৫ সালে ওলন্দাজদের এক কোটি টাকার পূর্বাঞ্চলীয় বাণিজ্যে ৬০% অর্থাৎ ৬০ লাখ টাকার বাণিজ্য হয় বাংলার পণ্যে [এন,কে, সিনহা, বেংগল এন্ড ওয়ার্ল্ড

www.nagorikpathagar.org

ট্রেড,খন্ড, ১, পৃঃ ৩৫]। তাদের প্রধান পণ্য ছিল সল্টপিটার ও আফিম। ১৭৪৬ সালে তারা ৩৩ হাজার মণ সল্টপিটার খরিদ করে। অতি দ্রুত ক্রয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়ে ১৭৪৮ সালে দাঁড়ায় ৬০ হাজার মণ। তখন তারা আফিমের ব্যবসায় নেতৃস্থানীয় থেকে সিংহল, মালাক্কা ও মালয় উপদ্বীপে আফিম রফতানি করতো। ওলন্দাজদের আফিম রফতানির পরিমাণ নিশ্চয়ই সেই তুলনায় অনেক বেশী ছিল-তাদের নিজেদের ১৭২৪ সালের তুলনায় এ সময়ের পরিমাণ ২৫ বছরে মাত্র দ্বিগুণ ধরলে মোটেই অসমীচিন হয় না। এছাড়া কাসিমবাজারস্থ ওলন্দাজ কারখানায় উৎপন্ন বার্ষিক প্রায় আড়াই লাখ পাউন্ড রেশম তারা ইউরোপে পাঠাতো। তার তৎকালীন মূল্য ছিল ২ লাখ টাকা [এন, কে, সিংহ, পৃঃ ৫৫-৫৬]। তাহলে তাদের খরিদা মালের মূল্য দাঁড়ায় অন্তত ১ কোটি ২০ লাখ টাকা।

১৭৫০ সালের দিকে ইংরেজরা তাদের প্রাচ্য দেশীয় বাণিজ্যে কোলকাতা থেকে ৩০ লাখ টাকার আফিম, ১০ লাখ টাকার সিট কাপড় ও ৫ লাখ টাকার সল্টপিটার রফতানি করে। বিবিধ পণ্য সামগ্রীতে কোলকাতা-করোমন্ডল উপকূলের বাণিজ্যে তারা ২৪ হাজার টন বহন ক্ষমতা সম্পন্ন জাহাজসহ ৩৪ লাখ টাকা পুঁজি নিয়োগ করে। আট থেকে দশ সপ্তাহে সেখানে তাদের প্রতি চালান মাল ক্রয়-বিক্রয় শেষ হতো। যদি বছরে মাত্র ৪ দফা পুঁজি আবর্তিত হয় তাহলে এক্ষেত্রে তাদের বার্ষিক রফতানির পরিমাণ ছিল অন্ততঃ ১ কোটি ৪৫ লাখ টাকা। তারা পশ্চিম ভারতীয় উপকূলে ২৮ হাজার টন বহন ক্ষমতা সম্পন্ন জাহাজ নিয়োগ করে সূতী ও রেশমের পিস কাপড়, চিনি, খাদ্যশস্য, ডাল, মরিচ, পাটের রশি ইত্যাদি রফতানি করতো[এন,কে,সিনহা, পৃঃ ১২৬]। এ ক্ষেত্রে তাদের রফতানি পণ্যের মূল্য করোমন্ডলের অর্ধেক ধরলেও ৭০ লাখ টাকা দাঁড়ায়। ইংরেজদের ঢাকা কুঠির এককালীন অধ্যক্ষ মিঃ টেইলরের ১৭৯০ সালের দিকে প্রদত্ত এক হিসাব মতে ১৭৪৭ সালে ঢাকা থেকে ২৮$\frac{১}{২}$ লাখ টাকার কাপড় রফতানি হয়। উক্ত হিসাবেই দেখা যায় ঢাকা থেকে ইংরেজ কোম্পানীর মালিকানায় ৩ লাখ ৫০ হাজার টাকার এবং বেনামীতে কোম্পানীর কর্মচারীদের ২ লাখ টাকার রফতানি পণ্য ছিল। ঈস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীকে প্রদত্ত সরকারী শুল্ক রেয়াতির অপব্যবহার করে ১৭ শতকের শেষদিক থেকেই কোম্পানীর কর্মচারীরা ব্যক্তিগত বেনামী ব্যবসা চালু করে। এসব নিয়ে প্রথমে সুবাহদার ও পরে নবাব মুর্শিদকুলী খাঁ, নবাব শুজাউদ্দিন ও নবাব আলীবর্দী খাঁর সাথে তাদের বিবাদ বিসম্বাদ অব্যাহত ছিল। ১৭৯০ সালে কোম্পানীর নিজস্ব শাসনাধীন বাংলার তুলনায় নবাবী আমলে শুল্ক রেয়াতী অপব্যবহারের পথে তাদের চোরাচালানীর সুযোগ অনেক বেশী ছিল। ১৭৯০ সালে কোম্পানীর রফতানির তুলনায় ব্যক্তিগত

www.nagorikpathagar.org

নওয়াব শূজা উদ্দীন

www.nagorikpathagar.org

নওয়াব সরফরাজ খান

www.nagorikpathagar.org

রফতানির পরিমাণ দুই–তৃতীয়াংশ হলে সে–আমলে নিশ্চয়ই কোম্পানীর কর্মচারীদের এসব চোরা গোপ্তা রফতানির (প্রাচ্য দেশীয় বাণিজ্যে যা চালানো তাদের জন্য অনেক সহজসাধ্য ছিল) হিসাব কোন স্থায়ী হিসাববহিতে রক্ষিত নেই। ২ শত বছর পর তা উদ্ধার করাও সম্ভব নয়। কিন্তু তা বলে উহার অস্তিত্বকে অস্বীকার করা যায় না। ইংরেজদের এই চোরা–গোপ্তা ব্যবসার পরিমাণ তাদের অফিসিয়াল রফতানির দুই–তৃতীয়াংশও ধরা হলেও পরিমাণ দাঁড়ায় (৩০+১০+৫+১৪৬+৭০=২৬১ লাখ) ২ কোটি ৬১ লাখ টাকার দুই–তৃতীয়াংশ ১ কোটি ৭৪ লাখ টাকা।

সুতরাং দেখা যায় শুধুমাত্র ওলন্দাজ ও ইংরেজদের হাতে রফতানির পরিমাণ সর্বদিক দিয়ে কমিয়ে হিসাব ধরলেও দাঁড়ায় (১ কোটি ২০ লাখ+২ কোটি ৬১ লাখ + ১ কোটি ৭৪ লাখ=৫৫৫ লক্ষ)৫ কোটি ৫৫ লাখ টাকা। এর বাইরে ফরাসী, আর্মেনীয়, জার্মান বণিকদের সামুদ্রিক বাণিজ্য এবং স্থলপথে মোগল সাম্রাজ্যের অন্যান্য প্রদেশসহ ইরান আফগানিস্তান ও মধ্য এশিয়ায় মুসলিম সওদাগরদের হাতে পরিচালিত বাণিজ্য– সব মিলিয়ে উপরোক্ত পরিমাণের এক–তৃতীয়াংশ ধরা হলেও তার পরিমাণ দাঁড়ায় ১ কোটি ৮৫ লাখ টাকা। সর্ব সাকুল্যে দেখা যায় নবাব আলীবর্দী খাঁর আমলে বাংলার বার্ষিক রফতানি বাণিজ্যের পরিমাণ ছিল তৎকালীন মুদ্রামানে ৭ কোটি ৪০ লাখ টাকা–একালের মুদ্রামানে ১৪ হাজার ৮ শত কোটি টাকা।

এই বিপুল পরিমাণ রফতানির বিনিময়ে তাদের আমদানী ছিল খুবই কম–মোটা কাপড় প্রস্তুতের জন্য সুরাট ও মির্জাপুর থেকে কিছু সূতা এবং রেশম বস্ত্রের বাড়তি চাহিদা মেটাবার জন্য চীনদেশ থেকে কিছু কাঁচা রেশম আমদানি হতো। ধনী বাংগালীরা খনিজ লবণ ভালোবাসতো বিধায় নিজেদের তৈরী সামুদ্রিক লবণ রফতানি করে উত্তর ভারত থেকে খনিজ লবণ আমদানি করতো। এছাড়া চীনামাটির সৌখিন থালাবাসন আমদানি হতো। আর আমদানি হতো কাফ্রী ক্রীতদাস–দাসী। বাংলার নিত্য বর্ধিষ্ণু কৃষি ও শিল্পোৎপাদনে শ্রমশক্তির বিপুল চাহিদা ছিল, ঠিক যেমনটি বর্তমান বিশ্বের শিল্পোন্নত দেশগুলোতে রয়েছে। বিদেশী বণিকেরা ক্রীতদাস–দাসী নিয়ে এসে বাংলায় বিক্রি করতো। বাংলার মুসলমান কারখানাদার ও খামার–মালিকেরা তাদেরকে খরিদ করে উৎপাদনকার্যে নিয়োগ করতেন। কিন্তু স্থায়ীভাবে তাদেরকে ক্রীতদাস–দাসীরূপে রাখতে পারতেন না। সেকালে মোগলাই অভিজাতদের লাম্পট্যলীলার দিক বাদ দিলে দেশবাসীর মধ্যে ধর্মীয় নিষ্ঠা ও নৈতিকতাবোধ ছিল প্রবল। ক্রীতদাসদের ব্যাপারে পবিত্র কোরআন ও সুন্নাহর বিধান রয়েছে যে, তাদের প্রতি স্বীয় পরিবারের সদস্যদের মতোই আচরণ করতে হবে এবং তাদের কেউ মনিবের কাছে চুক্তিশ্রমের মাধ্যমে মুক্তিপণ পরিশোধ করে আজাদী চাইলে তাকে আজাদ করে দিতে হবে। এর

www.nagorikpathagar.org

ফলে আমদানিকৃত ক্রীতদাসেরা কয়েক বছরের মধ্যেই আজাদী পেয়ে যাওয়ায় নতুন ক্রীতদাস গ্রহণের প্রয়োজন দেখা দিত। এ কারণেই বাংলায় নিয়মিত ক্রীতদাস আমদানি হতো। এর বাইরে তেমন কিছুই আমদানি করতে হতো না। এসব আমদানিপণ্যের মূল্য যদি সেকালের মুদ্রায় ৪০ লাখ টাকা (বর্তমান মুদ্রামানে ৮শত কোটি টাকা ধরা হয়, তাহলে বাংলার বৈদেশিক বাণিজ্যের নীট উদ্বৃত্ত দাঁড়াতো বার্ষিক ৭ কোটি টাকা– বর্তমান মুদ্রামানে ১৪ হাজার কোটি টাকা। এ অর্থ এদেশে আসতো স্বর্ণ, রৌপ্য ও মূল্যবান পাথর হীরা–জহরত মণিমরকত হিসাবে। এ থেকে দিল্লী দরবারে দেয় রাজস্ব এবং নবাবী আমলের পূর্ববর্তী সুবাদার ও উচ্চ পদস্থ কর্মচারীগণ কর্তৃক নিয়ে যাওয়া অর্থের পরিমাণ গড়ে বার্ষিক সেকালের ১ কোটি বা এযুগের ২ হাজার কোটি টাকা বাদ দিলেও বাংলার বার্ষিক বৈদেশিক মুদ্রা সঞ্চয়ের নীট পরিমাণ ছিল ১২ হাজার কোটি টাকা। ১২ হাজার নয়, ১২ কোটি নয়, ১২ হাজার কোটি টাকা। এ বাণিজ্যিক উদ্বৃত্ত আয় সঞ্চালিত হয়েছিল এবং সঞ্চিত হয়েছিল বাংলার সর্বত্র। মুর্শিদাবাদ ও ঢাকাস্থ নবাবের খাজাঞ্চিখানা থেকে শুরু করে নিভৃত পল্লীর কৃষক কারিগরের ঘরেও সোনার মোহর রূপার তংকা ও বহমূল্য অলংকার সামগ্রী হিসাবে উহা প্রাচুর্যের দ্যুতি ছড়াতো।

১৭৫৭ সাল পর্যন্ত বাংলায় মুসলিম শাসনের পাঁচ শত চুয়ান্ন বছরের মধ্য থেকে প্রথম ৫০ বছর বাদ দিয়ে অবশিষ্ট ৫শত বছর ধরে বাংলা মূলুকে জীবন ধারনের জন্য নিত্য ব্যবহার্য দ্রব্য সামগ্রীর মূল্য ছিল কল্পনাতীতভাবে কম। ১৭৫৭ সালের পূর্বে মুসলিম বাংলায় চাউল কোন দিনই টাকায় ৪ মণের কম বিক্রি হয়নি–সুবাদার শায়েস্তা খাঁ (১৬৬৪–৭৮ও ১৬৭৯–৮৮) এবং নবাব শূজাউদ্দিনের আমলে (১৭২৭–৩৯) টাকায় ৮ মণ চাউল পাওয়া যেতো। [আব্দুর রহীম, বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস, পৃঃ ৫১৩]। তখন ১ মণ লবণের দাম ছিল ৪ পয়সা [এন, কে, সিংহ, পৃঃ ২১৮, বরাত উদ্ধৃতি আব্দুর রহীম, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৫০২], একখানি সাধারণ শাড়ীর মূল্য ছিল আধা পয়সার কম [ভি, সি, সেন, পৃঃ ২৩৩, উদ্ধৃতি আব্দুর রহীম, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৫১৪], ২০টিরও বেশী মুরগী কেনা যেতো ১ টাকায় এবং মাছ এতো সস্তা ছিল যে, মনে হতো তার কোন মূল্যই নেই। ১৭৫০ সালের দিকে বাংলা মূলুকে স্বামী–স্ত্রী ও ৩টি সন্তান নিয়ে গঠিত একটি পরিবার ১ টাকা ৪ আনায় ভাত–মাছ–গোশত–দুধ–চিনি–ঘি ইত্যাদি খেয়ে সাধারণ কাপড় পরে এক মাস চালিয়ে দিতে পারতো। অথচ একজন সাধারণ কারিগর বা দক্ষ শ্রমিকের আয় ছিল তার থেকে কয়েকগুণ বেশী। বিপুল পরিমাণ রফতানির বিনিময়ে ব্যাপকভাবে স্বর্ণ ও রৌপ্য আমদানি হওয়ায়, বাড়তি উৎপাদনের কারণে নিত্য ব্যবহার্য পণ্যের মূল্য কম থাকলেও ১৭৫৭–এর পূর্ববর্তী ৫০ বছরে শ্রমের মজুরি বৃদ্ধি পায়। বস্ত্রশিল্পে একজন দক্ষ কারিগর মাসে সাত

www.nagorikpathagar.org

টাকা আট আনা, মধ্যম শ্রেণীর কারিগর ৫ টাকা ও সাধারণ কারিগর ৩ টাকা রোজগার করতো [এন, কে সিংহ, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৭৬]। সূতা কাটার কাজে নিয়োজিত একজন দক্ষ মহিলা মাসে ৩ টাকা, মধ্যম মানের মহিলা ২ টাকা এবং অপটু বা পার্ট টাইম মহিলা ১২/১৪ আনা উপার্জন করতেন [এন, কে, সিংহ, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৮৪-৮৭]। এসব তাঁতী কারিগরেরা প্রায় সবাই ছিলেন মুসলমান [আব্দুর রহীম, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৪৯৩] তারা নিজেরা উৎপাদন কার্যে নিজেদের পুঁজি ব্যবহার করতেন [এন, কে, সিংহ, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৫৮-৫৯]। সুতরাং পারিশ্রমিকের পাশাপাশি তারা বিনিয়োগ জনিত মুনাফাও অর্জন করতেন। যে-কোন দেশে, যে কোন একটি সেক্টরে বর্দ্ধিত শ্রম-মূল্য অন্যান্য সেক্টরের শ্রম-মূল্যও বাড়িয়ে দেয়। ফলে বাংলার সকল প্রকার শিল্পে ও অন্যবিধ কাজে নিয়োজিত শ্রমিকদের মজুরিও তখন এর সাথে সাজুয্য রক্ষা করে নির্ণিত হতে থাকে। "ইংরেজ কোম্পানীর অষ্টাদশ শতকের প্রথম পাদের দলিল-পত্র থেকে জানা যায় যে, একজন পাইক পিওন বা কুলির মাসিক ২ টাকা, একজন দারোয়ান ২ টাকা ও পাল্কী বাহক শক্ত কাজের জন্য ১২ টাকা মাহিনা পেতো। ১৭৫৭ সালে কুলীদের দৈনিক মজুরি পরিশোধের জন্য কোম্পানী এক আনা মানের মুদ্রা বাজারে ছাড়ে। ১৭৫৯ সালে কোম্পানী নানা শ্রেণীর অদক্ষ শ্রমিকের মাসিক মজুরি নির্ধারণ করে দেয়। তাতে খানসামা (বার্বুচি) ৪ টাকা, খিদমতগার (ভৃত্য) ৫ টাকা, ঘোড়ার গাড়ীর গাড়োয়ান ৫ টাকা, ধোপা ৩ টাকা, নাপিত ১ টাকা ৮ আনা, ঘোড়ার সহিস ২ টাকা, মালী ২ টাকা, চাকরানী ২ টাকা এবং সেবিকা ৪ টাকা হিসাবে মাহিনা পাবে বলে স্থিরীকৃত হয়। দক্ষ শ্রমিক যেমন সূতার, ঘরামী ও ওস্তাগার ইত্যাদির মাহিনা বাজারে আরো বেশী হারে প্রচলিত ছিল" [আব্দুর রহীম, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৫১৫]। ১৭৫৮ সালে কলকাতা দুর্গ নির্মাণের সময়ে সাধারণ কুলী জোগালদারকে মাসিক ৩ টাকা হারে মজুরি দেয়ায় তারা সবাই কাজে ইস্তফা দিয়ে কলকাতা শহর ছেড়ে চলে যায়। [কে, পি বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃঃ ৫৩৯, উদ্ধৃতি মোহর আলী, পূর্বোক্ত, ৯৬৩]। ১৭৫৭ সালের পূর্বে একটি মোহরের মোটামুটি মূল্য ছিল১০ টাকার সমান। সুতরাং দেখা যায় অত্যন্ত সচ্ছলভাবে সংসার চালিয়েও একটি তাঁতী পরিবার স্বামী-স্ত্রীর মিলিত রোগজারে প্রতি বছর অন্ততঃ ৮/১০টি সোনার মোহর, একটি দক্ষ শ্রমিক পরিবার ৫/৬টি মোহর ও একটি অদক্ষ শ্রমিক পরিবার ২/৩টি সোনার মোহর সঞ্চয় করতে পারতো। তাই বলা চলে, সারা বাংলায় প্রতিটি ঘরেই তখন অন্ততঃ দুই একটি করে হলেও সোনারমোহর বা সোনার গহনা সঞ্চিত ছিল।

সারা বাংলার লোককাহিনী ও কিংবদন্তীতে যে সোনার মোহর, হীরা-জহরত আর মণিমুক্তার ছড়াছড়ি তা কি একেবারেই অনর্থক?

তবু চল্লিশের দশক অবধি বাবু বুদ্ধিজীবীরা বাংলায় মুসলিম শাসনামলে, এমন কি মোঘল ও নবাবী আমলেও কোথাও কোনরূপ স্বাচ্ছন্দ্যের নিদর্শন দেখতে পাননি।

www.nagorikpathagar.org

'কোটি টাকা পাচারকারী' নওয়াব শায়েস্তা খান

সাড়ে পাঁচ শত বছরব্যাপী মুসলিম শাসিত বাংলা মুল্‌কে রচিত কয়েক কুড়ি বিরাটায়তন ইগিহাস গ্রন্থ এবং প্রশাসনিক ও বাণিজ্যিক ক্ষেত্রে বিদ্যমান শত সহস্র তথ্যসূত্রকে সরাসরি অস্বীকার করে ইংরেজ প্রভুদের লুণ্ঠনকালীন সাফাইসাক্ষ্যকে সূত্র ধরে উনিশ শতকীয় বাবু বুদ্ধিজীবীরা বাংলার ইতিহাস বানাতে শুরু করেন। তাদের উত্তরসূরীরা চলতি শতকের চল্লিশের দর্শক অবধি সেই বানোয়াট ইতিহাস বানানোর ধারা অব্যাহত রাখেন। সেই ধারারই একখানি মহাগ্রন্থ বাবু স্যার যদুনাথ সরকারের 'দি হিষ্ট্রী অব বেংগল।' ৮ জন বাবু ইতিহাসবিদের যৌথ চেষ্টার ফসল এ গ্রন্থে আগাগোড়াই মুসলিম শাসনামলের ব্যক্তিত্বগুলোর চরিত্র হনন করা হয়েছে; সত্য গোপন করে ভিত্তিহীন কাল্পনিক, ক্ষেত্রবিশেষে অর্ধসত্য ও অর্ধমিথ্যার বানোয়াট ককটেল পরিবেশন করে তরুণ মুসলিম ছাত্রছাত্রীদের মনে হীনমন্যতার সংক্রমণ ঘটিয়ে চিন্তা ও চেতনাকে বিপথগামী করার প্রয়াস পাওয়া হয়েছে।

বাদশাহ আলমগীরের বিশ্বস্ততম সহকারী সুবাদার নওয়াব শায়েস্তা খান স্বভাবতঃই তাদের আক্রোশের একটি প্রধান শিকার হয়েছেন। তাঁর সম্পর্কে আলোচনার অধ্যায়ে অনেকগুলো অগোছালো বানোয়াট অভিযোগের একটিতে বলা হয়েছেঃ

"An Assamese traditional history states: Shaista khan used to inport by ship salt. betel nuts and other articles and sell them in Bangal on profitable terms. He accumulated 17 crores of rupees.

He also sold salt and supari to merchants in the city of Dhaka. The later were thus debarred from making purchases and sales on their own accounts (Bhuyan, Annals, 167) Prince Azimuddin when governor of Bangla (1698-1707) carried on this private trade (Sauda-e-Khas), for which he received a shirp reprimand from his grand father Aurangzib (Riyaz-us-S. 243)." [History of Bengal 375].

"একটি অহমীয়া লোক-কাহিনীতে কথিত আছে যে, শায়েস্তা খান জাহাজ বোঝাই করে লবণ, সুপারী ও অন্যান্য পণ্য সামগ্রী আমদানি করতেন এবং লাভজনক মূল্যে বাংলা মূলক-এ তা' বিক্রয় করতেন---তিনি ১৭ কোটি-

www.nagorikpathagar.org

টাকা সঞ্চয় করেন। ঢাকা নগরীর বণিকদের কাছেও তিনি লবন ও সুপারী বিক্রয় করতেন। এভাবে, ঢাকার ব্যবসায়ীদেরকে নিজেদের মালিকানায় তা ক্রয় বিক্রয় করা থেকে বিরত রাখা হতো। ভূঁইয়া, এ্যানালস, ১৬৭) শাহজাদা আজিমুদ্দিন বাংলার গভর্ণর থাকা কালে (১৬৯৮-১৭০৭) এই ব্যক্তিগত ব্যবসা পরিচালনা করেন এবং তাতে তাঁর দাদা বাদশাহ আওরঙ্গজের তাকে কঠিনভাষায় তিরষ্কার করেন। (রিয়াজুস সালাতীন, ২৪৩)।" [দি ইষ্টোরী অব বেংগল, পৃঃ ৩৭৫]।

যদিও শায়েস্তা খানের শাসনামলের প্রথম কযেক বছরের প্রত্যক্ষদর্শী ঐতিহাসিক শাহাবুদ্দীন তালিশ সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করেন যে, শায়েস্তা খান তাঁর পূর্ববর্তীদের আমলে চালু যাবতীয় শাহী একচেটিয়া ব্যবসা বন্ধ করে দিয়েছিলেন, বাবু স্যার যদুনাথ সরকার তাঁর সাক্ষ্য বাতিল করে দিয়ে, ট্রানজিট পারমিট দ্বারা চোরাচালানী ব্যবসায়ে লিপ্ত থাকার দায়ে শাস্তিপ্রাপ্ত ইংরেজ কোম্পানীর কর্মচারী ক্যালভাল এবং ষ্ট্রেশাম মাষ্টারের কুৎসামূলক বর্ণনাকে সত্য বলে মেনে নিয়েছেন।

কিন্তু একটি প্রশ্নের উত্তর তাঁর লেখায় নেই। শায়েস্তা খান বাংলায় এসে ১৬৬৪ সালে একচেটিয়া ব্যবসা বন্ধ করলেন এবং ১৬৯৮ সালের পর শাহজাদা আজিমুদ্দীন তা পুনর্বহাল করলেন ও বাদশাহর ধমক খেয়ে বন্ধ করলেন। [হিষ্ট্রী অব বেংগল, পৃঃ ৩৭৫] প্রথমতঃ নিজের পৌত্র আজিমুদ্দীনকে যদি ধমক দিযে বাদশাহ একচেটিয়া ব্যবসা বন্ধ করলেন, শায়েস্তা খান শাহাবুদ্দীন তালিশের মৃত্যুর (১৬৬৮) পর কখনো তা পুনর্বহাল করলে তিনিও নিশ্চয়ই বাদশাহের ধমক থেকে রেহাই পেতেন না। সর্বোপরি আজিমুদ্দীন কর্তৃক পুনর্বহাল ও ধমক খাওয়া থেকে প্রমাণিত হয় যে, তার পূর্ববর্তী শাযেস্তা খানের আমলে সেরূপ ব্যবসা চালু ছিলনা।

কিন্তু এটা বাবুদের বিবেচনায় আসার কথা নয়। লোক-কাহিনীর গাল-গল্পকে ইতিহাসরূপে চালাবার চেষ্টায় জীবিত ঐতিহাসিকের লিখিত ইতিহাসকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে নিজেদের চুরির সমর্থনে বাটপাড় চোরাচালানী ইংরেজের সাক্ষ্য গ্রহণ করাই ছিল তাদের জন্যে যুক্তিসংগত।

সূত্রের প্রশ্ন বাদ দিযে এবারে সম্ভাব্যতা বিচার করে দেখা যাক। দেখা যাক যে, ঘটনা হিসেবে তৎকালীন প্রেক্ষাপটে আদৌ এটা হওয়া সম্ভব ছিল কিনা।

বাংলা মুলুকে ১৭৬৯ সালে জনসংখ্যা ছিল ৩ কোটি। তবে সে বাংলা আজকের বাংলাদেশ বা চলতি শতকের ত্রিশ চল্লিশের দশকের অবিভক্ত বাংলা প্রদেশও নয়- শায়েস্তা খানের শাসিত বাংলা সুবাহ ছিল উত্তরে দার্জিলিং থেকে

www.nagorikpathagar.org

দক্ষিণে চট্টগ্রামের প্রান্তদেশ, পূর্বে সিলেট থেকে পশ্চিমে মেদিনীপুরের পশ্চিম সীমা অবধি বিস্তৃত। সেটা ছিল সতেরো শতকের সত্তুর ও আশির দশক। আঠারো শতকের সত্তুরের দশকে বাংলা বিহার উড়িষ্যার মোট লোকসংখ্যা ৩ কোটি হলে এক শতাব্দী আগের শুধু বাংলার জনসংখ্যা ২ কোটির বেশী ছিল না–কোন প্রতিবাদের আশংকা না করেই এ কথা বলা চলে।

দুই কোটি অধিবাসী অধ্যুষিত সেই বাংলাদেশের দীর্ঘ উপকূলভাগ জুড়ে মেদিনীপুর, বশিরহাট, সাতক্ষীরা, বাগেরহাট, পিরোজপুর, পটুয়াখালী, ভোলা, সন্দ্বীপ, চট্টগ্রাম, কক্সবাজারের অীধবাসীরা সামুদ্রিক লবণ উৎপাদন করে কেবল নিজেদের চাহিদাই মিটাতো না। বাংলার সেই সমৃদ্ধ লবন শিল্প উনিশ শতকের গোড়ার দিকে ইংরেজদের শোষণ–নির্যাতনে ধ্বংস হবার পূর্বতক প্রায় দুই শতাব্দী ধরে বাংলাদেশ থেকে সামুদ্রিক লবণ বিদেশে রফতানিও হতো–তার প্রমাণ আমাদের হাতে এসে পৌছেছে। আসামে বাংলার লবণ রফতানি হতো। উপরোক্ত উপকথাও তারই সাক্ষ্য বহন করে। তবে মধ্য, উত্তর–পশ্চিম বাংলার অনেকে এবং দক্ষিণ বাংলায় নগর বন্দরবাসী পশ্চিমা মুসলমানদের কেউ কেউ খনিজ লবণ খেতে ভালবাসতো। খনিজ লবণ আমদানি হতো পাঞ্জাবের লবন পাহাড় অঞ্চল থেকে। সেই লবন আমদানি ও পাইকারী বাজারজাত করণের ব্যবসা হয়তো বা নবাবের একচেটিয়া ব্যবসায়ের অন্তর্ভূক্ত থাকতে পারে। এখন প্রশ্ন উঠা স্বাভাবিক যে, এই আমদানিকৃত লবনের বার্ষিক পরিমাণ কতো ছিল? তৎকালীন বাংলা মুলকের মোট ২ কোটি লোক সংখ্যার গড়ে প্রতি পাঁচ জনে একটি করে পরিবার ধরে নিলে দেখা যায় পরিবারের সংখ্যা ছিল ৪০ লাখ। পাঠকের নিজ পরিবারের হিসাব নিলেই দেখা যাবে ৫ সদস্য পরিবারের জন্য গড়ে প্রতিমাসে ১½ সের লবণের বেশী প্রয়োজন হয় না। তর্কের খাতিরে যদি ধরে নেয়া হয় যে, সারা বাংলার প্রতিটি লোকই, এমন কি সাগরকূলের লবন উৎপাদক শ্রমিকও নিজের তৈরী লবণ বাদ দিযে, শায়েস্তা খানের আমদানিকৃত লবণ খেতো, তাহলেও বাংলা মুলকে ৪০ লাখ পরিবারে মাসিক ৬০ লাখ সের অর্থাৎ ১½ লাখ মণ লবণ খাওয়া হতো। প্রতি পরিবারে মাসিক ২ সের লবণ খাওয়া হলেও এবং প্রতিটি মানুষ খণিজ লবণ খেলেও প্রতি মাসে ২ লাখ মণ এবং বছরে ২৪ লাখ মণ লবণের বেশী দরকার হতো না। এবারে দেখা যাক এই দুই লাখ লবণের মূল্য কত দাঁড়ায়।

আমরা জানি আঠারো শতকের গোড়ার দিকে ১০০ মণ লবণের মূল্য ছিল ৪/– (চার টাকা) অর্থাৎ প্রতি মণ লবণ বিক্রি হতো ০·৪ (চার পয়সা) দরে।

www.nagorikpathagar.org

তখন থেকে পঞ্চাশ বছর আগে শায়েস্তা খানের আমলে লবনের মূল্য নিশ্চয়ই এর চেয়ে বেশী ছিল না। তাহলে শায়েস্তা খানের আমদানীকৃত ২৪ লাখ মণ লবণের পাইকারী বিক্রয় মূল্য ছিল ১ লাখ টাকারও কম। স্যার যদুনাথ বাবু জানিয়েছেন যে, লবণ ও সুপারীর ব্যবসা থেকে শায়েস্তা খান ১৯ বছরে ১৭ কোটি টাকা অর্থাৎ প্রতি বছর ৯০ লাখ টাকা মুনাফা করতেন।

বাংলার সব অঞ্চলে কম বেশী সুপারী গাছ ছিল বিধায় অভ্যন্তরীণ চাহিদা কম থাকলেও সুপারী সুবাহ বাংলার রফতানি পণ্য ছিল। বাবুরা বলেছেন যে, সুপারি জাহাজ ভরে আমদানি হতো। যদি আমদানী হতো এ কথা মেনে নেয়াও হয় তবু প্রশ্ন ওঠে সেই আমদানির পরিমাণ কতো ছিল? বাবু যদুনাথ কোন হিসাব দেয়ার প্রয়োজনীয়তা বোধ করেননি। লবনের তুলনায় সুপারীর মূল্য বেশী হলেও ব্যবহার এবং উৎপাদন উভয়ই অনেক কম। এ যুগে যেমন আছে সে যুগেও তেমনটিই ছিল। উপরে হিসাবকৃত লবণের মোট মূল্যের তুলনায় সুপারীর মোট মূল্য যদি ৫ গুণ ধরা হয়, তবু উভয়ের মোট মূল্যের পরিমাণ শায়েস্তা খানের বার্ষিক মুনাফা ১ কোটি টাকার ধারে কাছেও পৌছে না।

শায়েস্তা খানের আমলে ১ টাকার মুদ্রামাণ ১৯৮৮ সালের ২ হাজার টাকারও বেশী। সুতরাং বাংলা মুলুকের সব মানুষ খুব বেশী পরিমাণে শায়েস্তা খানের লবন খেলে লবণ আমদানি ও বিক্রি হতো সেকালের মুদ্রায় ১ লাখ এবং একালের ২০ কোটি টাকা এবং সুপারীর আমদানী ও বিক্রয় মূল্য তার পাঁচ গুণ ধরলে পরিমাণ দাঁড়ায় সেকালের ৫ (পাঁচ) লাখ একালের ১ (এক) শত কোটি টাকা। কিন্তু এতেও, সব দিকে বাড়িয়ে ধরেও, পরিমাণ দাঁড়ায় দুইটি পণ্যের মাত্র ৬ (ছয়) লাখ টাকা। এক চেটিয়া ব্যবসায়ের "অন্যান্য দ্রব্য সামগ্রী"র নাম বাবুরা উল্লেখ করেন নাই সুতরাং 'অন্যান্য', উক্তিটি নির্জলা মিথ্যা।

শায়েস্তা খানের ২৩ বছর ব্যাপী সুবাহদারী আমলে (১৬৬৪-৭৮, ১৬৭৯-৮৮) ১৭ কোটি টাকা মুনাফা সঞ্চয় করেন। প্রথম ৪ বছর শাহাবুদ্দিন তালিশের প্রামাণ্য সাক্ষ্য মতে তিনি ব্যবসা করেন নাই। অবশিষ্ট ১৯ বছরে তার বার্ষিক মুনাফার পরিমাণ দাঁড়ায় ৯০ লাখ টাকা। বার্ষিক মোট ৬ (ছয়) লাখ টাকার মাল বিক্রয় করে ৯০ লাখ টাকা লাভ সঞ্চিত হয় কিভাবে? ঈর্ষার আগুণে জ্বলা অন্তর আর গঞ্জিকা-কারণে ধূমাচ্ছন্ন মগজের অধিকারী না হলে কারো পক্ষেই তা কল্পনা করাও সম্ভব নয়। অবশ্য আমরা যারা বাবুদের বচনকে অমৃতজ্ঞানে আহরণ করি এবং বিচার বিবেচনা না করেই গিলে ফেলি তাদের কথা স্বতন্ত্র।

www.nagorikpathagar.org

মীর জাফর নয়, জগৎ শেঠ

১৭৫৭ সালের পলাশী যুদ্ধের পূর্ববর্তী কয়েক দশকের ঘটনাপ্রবাহ দক্ষিণ এশীয় উপমহাদেশের ইতিহাসে এক অতি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় অধিকার করে আছে। এ সময়ের ঘটনাবলীর পরিণতিতেই বাংলায় ইংরেজ রাজত্ব প্রতিষ্ঠার পথ ধরে শেষতক সারা উপমহাদেশে বৃটিশ সাম্রাজ্য কায়েম হয়। তাই ইংরেজদের হাতে দেশের স্বাধীনতা তুলে দেয়ার ব্যাপারে যাদের ভূমিকা যতটুকু গুরুত্বপূর্ণ ছিল, উপমহাদেশের ইতিহাসে তাদের ব্যক্তিগত গুরুত্বও তদনুপাতে প্রাধান্য পাওয়া উচিত। কিন্তু কার্যতঃ তা পায়নি। ইতিহাসের সাধারণ পাঠকদের কাছে একটি ধারণা অনেকটা বদ্ধমূল হয়ে আছে যে, 'চরিত্রহীন সিরাজ-উদ-দৌলার' 'লাম্পট্যবিলাস' ও 'বিশ্বাসঘাতক মীরজাফরের' ক্ষমাহীন বেঈমানির কারণেই পলাশীর আমবাগানে বাংলার স্বাধীনতা সূর্য অস্তমিত হয়। আপাতঃভাবে মনে হয় এরা দু'জনই তৎকালীন ঘটনার প্রধান নায়ক। অথচ একটু গভীরে নিরীক্ষণ করলে দেখা যায়, সিরাজ-উদ-দৌলা ও মীরজাফর দু'টি গুরুত্বপূর্ণ আসনের অধিকারী ছিলেন মাত্র। কিন্তু ব্যক্তিত্ব হিসেবে পলাশী ট্রাজেডির মূল নায়ক হিসাবে তাদের চেয়ে অনেক অনেক গুণ বড় মহা পুরুষেরাও তখন কর্মতৎপর ছিলেন। ব্যক্তিগত অবদানের মূল্যায়ন করা হলেই তাদেরকে প্রাধান্য দিতে হয়। তাদেরই একজন ছিলেন সতেরো শতকের চল্লিশ ও পঞ্চাশের দশকে বাংলার ধন সম্পদের প্রায় একচ্ছত্র নিয়ন্তা, অসাধারণ তীক্ষ্নধী রাজনৈতিক দাবাড়ু মহারাজা স্বরূপচাঁদ জগৎ শেঠ (বিশ্ব ব্যাংকার)। জগৎ শেঠের ভূমিকার গুরুত্ব অনুধাবন করতে হলে প্রথমেই প্রয়োজন তাঁর পরিবারের বিত্তসম্পত্তির পরিমাণ সম্পর্কে কিছু ধারণা অর্জন। ১৭৫০ সালের দিকে এক মণ চাউলের মূল্য ছিল তিন আনা বা বিশ পয়সা। -১৭৩৭ সালে ১ টাকায় ৩২ সেরী মণের ৮ মণ চাউল বিক্রি হতো। [আব্দুর রহীম, বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস, পৃঃ ৫১৩]। এবং লবণের মূল্য ছিল প্রতি মণ ৪ পয়সা-চার টাকায় এক শ' মণ হিসাবে [এন, কে, সিংহ, পৃঃ ২১৬, উদ্ধৃতি আবদুর রহীম, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৫০২]। 'তফেতা' বলে অভিহিত অতি উন্নত সার্টিন কাপড়ের ৫৬ ফুট দীর্ঘ ১ থানের মূল্য ছিল ৭০/৮০ পয়সা ও একখানা সাধারণ মানের শাড়ীর মূল্যছিল ১৮ কড়ি অর্থাৎ আধ পয়সারও কম। [ভি সি সেন, পৃঃ ২৩৩, উদ্ধৃতি আবদুর রহীম, পূর্বোক্ত পৃঃ ৫১৪]। বর্তমানে চাউল প্রতি মণ ৫শ' টাকা, লবণ প্রতি মণ ১২০ টাকা, উন্নত সার্টিন প্রতি গজ ৮০/৯০ টাকা এবং ১টি সাধারণ মানের শাড়ী ৮৫ টাকা ধরে হিসাব করলে দেখা যায় তৎকালীন ১

www.nagorikpathagar.org

টাকা বর্তমানে (১৯৮৮) কমপক্ষে ২ হাজার টাকার অধিক। তৎকালীন ইংরেজ সৈনিক কর্ণেল রবার্ট ওর্ম লিখে রেখে গেছেন যে, তিনি ব্যক্তিগতভাবে জানতেন, 'জগৎশেঠ পরিবারের বার্ষিক আয় ছিল ৪০ লাখ টাকা, অর্থাৎ বর্তমান মূদ্রামানে ৮ শত কোটি টাকা। [এস সি হীল, পৃঃ ২৫, উদ্ধৃতি আঃ রহীম, পূর্বোক্ত পৃঃ ১৮৭] মুর্শিদাবাদের টাকশাল ছিল জগৎশেঠের একক এখতিয়ারে; ইংরেজ ফরাসী ওলন্দাজ প্রভৃতি বণিকদের আনীত স্বর্ণ খন্ডগুলোকে এদেশে পণ্য ক্রয়ের উপযোগী স্বর্ণ মুদ্রায় পরিণত করার এবং বিনিময় মূল্য নির্ধারণের একচ্ছত্র অধিকারও ছিল তাঁরই। [রীয়াজুস সালাতীন, পৃঃ ২৪৭] সারা দেশের জমিদার, জায়গীরদার ও রাজস্ব আদায়কারীদের উপর ধার্য খাজনা, শুল্ক ও আবওয়াব (উপরাজস্ব) নিয়মিত পরিশোধের ব্যাপারে ব্যাংকার হিসাবে নবাব দরবারে তিনিই ছিলেন জামিন [রীয়াজুস সালাতীন, পৃঃ ২৯০]। রবার্ট ওর্মের ভাষায়, "সারা বাংলার রাজস্বের দুই-তৃতীয়াংশ তাঁর কাছেই জমা হয় এবং একজন ব্যবসায়ী যেভাবে ব্যাংকের উপর হুন্ডি দেয় ঠিক সেভাবেই সরকার তার উপর হুন্ডি দিয়ে টাকা গ্রহণ করেন" [এস সি হীল, পূর্বোক্ত, পৃঃ ২৫]। সুবা বাংলার বার্ষিক রাজস্বও দিল্লীতে মোতায়েন জগৎশেঠের প্রতিনিধির মাধ্যমে হুন্ডি মারফত প্রেরিত হতো। উপমহাদেশে সকল প্রধান প্রধান নগরীতে প্রতিনিধি রেখে কোটি কোটি টাকার বাণিজ্যে ব্যাংকারের ভূমিকা পালন করতেন তিনি। তা ছাড়া, বাংলার প্রত্যন্ত অঞ্চলে বাণিজ্যজাল বিস্তারে বিদেশী বণিকদেরকেও ঋণের যোগান দিতেন তিনি। ১৭৫৬ সালে ওলন্দাজ বণিকদেরকে একটি লেন-দেনেই তিনি বার্ষিক ৯% সুদে সাড়ে চার লাখ একালের মুদ্রামানে ৯০ কোটি টাকা ঋণ দিয়েছিলেন। [এস সি হীল, পৃঃ ১০৪, উদ্ধৃতি আবদুর রহীম, পূর্বোক্ত পৃঃ ৫০৯]। ওলন্দাজদের তুলনায় ইংরেজদের ব্যবসা ছিল অনেক বেশী বিস্তৃত এবং সেক্ষেত্রে জগৎশেঠের ঋণের পরিমাণও ছিল ব্যাপক।

বর্তমান যুগের রাষ্ট্র-ব্যবস্থাপনার নিরিখে দেখলে অর্থমন্ত্রী, স্টেট ব্যাংকের ব্যক্তিগত মালিক ও নিয়ন্তা,অংশতঃ বাণিজ্যমন্ত্রী ও পুরোপুরি বাণিজ্যিক ব্যাংকারের মিলিত সর্বগ্রাসী ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন মহারাজা স্বরূপচাঁদ জগৎশেঠ। পাঁচ পুরুষ ধরে নবাবদের সর্বাত্মক পৃষ্ঠপোষকতা এবং নিজেদের ক্রমবর্ধিষ্ণু বিশ্বাসঘাতকতায় চক্র বৃদ্ধিহারে বেড়ে অপরিমেয় বিত্তের অধিকারী এই জগৎশেঠই ইংরেজদেরকে বাংলার শাসন ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠার কাজে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।

www.nagorikpathagar.org

স্বরূপ চাঁদ জগৎশেঠের পিতামহ ফতেহ চাঁদ জগৎশেঠ নবাব মুর্শিদকুলী খান, নবাব শূজাউদ্দিন, নবাব সরফরাজ খান ও নবাব আলীবর্দি খানের অত্যন্ত আস্থাভাজন সভাসদ ছিলেন। ক্ষমতাসীন নবাবের "আস্থাভাজন" থেকেই তিনি নবাবের চরম শত্রুর প্রতিও "বিশ্বস্ততা" দেখিয়েছেন এবং প্রথম নবাবকে উৎখাত করে দ্বিতীয় নবাব বানিয়েছেন। একই ধারায় দ্বিতীয় নবাবের "আস্থাভাজন" থেকেই তিনি তাঁর শত্রুর প্রতি "বিশ্বস্ততা" দেখিয়েছেন এবং তাঁকেই তৃতীয় নবাব বানিয়েছিলেন।

স্বরূপ চাঁদ জগৎশেঠও পিতামহের নীতি ও আদর্শের অনুসারী ছিলেন। এবং জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত সিরাজ-উদ-দৌলা, মীরজাফর ও মীর কাসেমের সাথে বিশ্বাসঘাতকতার ধারা অব্যাহত রেখেছিলেন।

মৃত্যুর অল্প কিছুদিন পরেই তাঁর বিশ্বাসঘাতকতা ফলপ্রসূ হয়েছিল। বাংলায় মুসলিম শাসনের অবসান ঘটেছিল। নিরবচ্ছিন্ন অস্ত্রসাধনায় নিয়োজিত থেকে মারাঠা, রাজপুত, জাঠ ও শিখ বীর পুরুষেরা বহু রক্তপাতের মধ্য দিয়ে ১৮৫৭ সাল নাগাদ উপমহাদেশে মুসলিম শাসনের অবসান ঘটাতে সক্ষম হয়েছিল। কিন্তু তার এক শতাব্দী আগেই বাংলায় জগৎশেঠ বাবুদের বেঈমানী তাদের সাফল্যের শিরোপা এনে দিয়েছিল। বৃটিশ বর্ণহিন্দুর যোগসাজশে রচিত জাল দলিলের বস্তা বাংলার ইতিহাস পুনর্লিখনের জন্যে জগৎশেঠ পরিবারের প্রতিভা ও অবদান পুনর্মূল্যায়ন তাই অত্যাবশ্যক।

জগৎশেঠ পরিবারের প্রতিষ্ঠাতা হীরানন্দ সাহা মাড়ওয়ারের অন্তর্গত নাগোর থেকে ভাগ্যান্বেষণে এসে সম্রাট শাহজাহানের শাসনামলের শেষভাগে পাটনায় সুদের কারবার শুরু করেন। ১৭১১ সালে তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র মানিকচাঁদ সাহা ঢাকায় সুদের ব্যবসা আরম্ভ করেন। তিনি দাক্ষিণাত্যের ব্রাহ্মণ সন্তান সুবাহদার মুর্শিদকুলী খানের ঘনিষ্ঠ প্রিয়পাত্র হয়ে উঠেন এবং ১৭১২ সালে মুর্শিদকুলী খান দেওয়ানী দফতর মুকসুদাবাদ (মুর্শিদাবাদ) স্থানান্তরিত করলে মানিক চাঁদ তাঁর সাথে সেখানে চলে যান। ১৭১২ সালে উত্তরাধিকারের লড়াইয়ে বাদশাহ ফারুখশিয়ার মানিকচাঁদের অর্থসাহায্য লাভ করে উপকৃত হন এবং মানিকচাঁদকে 'নগর শেঠ' (নগর ব্যাংকার) উপাধিতে ভূষিত করেন। ১৭১৪ সালে নগর শেঠ অপুত্রক মানিকচাঁদের মৃত্যু হলে তাঁর ভাগিনা ফতেহচাঁদ সাহা তাঁর ব্যাংকিং ব্যবসায়ের উত্তরাধিকারী হন। ১৭২৩ সালে নবাব মুর্শিদকুলী খানের সুপারিশে বাদশাহ

www.nagorikpathagar.org

মুহাম্মদ শাহ ফতেহচাঁদকে জগৎশেঠ (বিশ্ব ব্যাংকার) উপাধি প্রদান করেন [J.H. Little, House of Jagat Seth] ১৭১৭ সালে নবাব হবার পর মুর্শিদকুলী খান তুর্ক-আফগান মুসলমান সামন্তদের সম্মিলিত বিরোধতিার কল্পিত আশংকায় বর্ণহিন্দু রাজা-মহারাজাদের আশাতিরিক্ত সুযোগ-সুবিধা প্রদানের যে নীতি অনুসরণ করেন তার ফলশ্রুতিতে জগৎশেঠ সারা বাংলায় বিদেশী বণিকদের সাথে মুদ্রা ভাংগানী ব্যবসায়ের একচেটিয়া অধিকার লাভ করেন। 'শররফ' বলে পরিচিত মুসলমান মুদ্রা ব্যবসায়ীদেরকে নবাব এ ব্যবসা ত্যাগ করতে বাধ্য করেন। [মোহর আলী, হিস্টোরী অব দি মুসলিমস্ অব বেংগল, ১ম খন্ড, পৃঃ ৫৭৬]। এর কিছুকাল পরেই সরকারী টাকশালে বিদেশী বণিকদের স্বর্ণতাল দ্বারা দেশীয় মুদ্রা তৈরীর একচ্ছত্র ক্ষমতাও জগৎশেঠকে প্রদান করা হয়। [মোহর আলী ঐ, পৃঃ ৫৭৬] এক কথায় বলা চলে, মুর্শিদকুলী খানই মাড়োয়ারী হিরানন্দ সাহার পরিবারকে অপরিচয়ের অন্ধকার থেকে উদ্ধার করে কোটিপতি বিশ্ব ব্যাংকারে পরিণত করেন। [জি এইচ লিটল, হাউস অব জগৎশেঠ, উদ্ধৃতি মোহর আলী, পূর্বোক্ত পৃঃ ৫৭৫-এর পাদটীকা]। সেই মুর্শিদকুলী খানের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেই জগৎশেঠ হাতে খড়ি দেন। অপুত্রক মুর্শিদকুলী খানের কন্যা জিনাত-উন-নিসার স্বামী, জামাতা শূজাউদ্দিন ছিলেন উড়িষ্যার নায়েব সুবাদার। মোগলাই মুসলমানের সব বৈশিষ্ট্যই তাঁর চরিত্রে ছিল। হেরেমের প্রতি বেশী আসক্তি ও অন্য এক স্ত্রীর প্রতি তাঁর আনুকূল্যে জিনাত-উন-নিসা পুত্র সরফরাজ খানকে নিয়ে বাপের কাছেই থাকতেন। মুর্শিদকুলী খান সরফরাজকে তাঁর উত্তরাধিকারী নবাব করার ইচ্ছা পোষণ করে সে ভাবেই গড়ে তুলেছিলেন। দিল্লী দরবারে নওয়াবের উকিল (প্রতিনিধি) ছিলেন বর্ণহিন্দু বাবু বালকিষেণ। মুর্শিদকুলী নাতিকে উত্তরাধিকারী মনোনীত করে সে মনোয়নে দিল্লীর বাদশার স্বীকৃতি আদায়ের দায়িত্ব অর্পণ করেন তাঁর 'বিশ্বস্ত' প্রতিনিধি বালকিষেণের উপর। নওয়াব দরবারের প্রভাবশালী সদস্য ও নবাবের ঘনিষ্ঠ আস্থাভাজন জগৎশেঠ এ বিষয়ে দৈনন্দিন সব কিছুই অবহিত থাকতেন। স্বাভাবিক ধারায় নবাবের মনোনীত ব্যক্তি পরবর্তী নবাব হলে তাঁর বাড়তি কিছু পাওয়ার সম্ভাবনা কম, অথচ নবাবের ইচ্ছার বিরুদ্ধে অন্য কারো পরবর্তী নবাব হওয়াও দুঃসাধ্য।

এ সময়ে মুর্শিদকুলীর জামাতা উড়িষ্যার নায়েব সুবাদার (ডেপুটি গভর্ণর) শূজাউদ্দিন নবাব হওয়ার ক্ষীণ আশা পোষণ করছিলেন। জগৎশেঠ ফতেহচাঁদ মনিব মুর্শিদকুলী খাঁর ঘোষিত ইচ্ছার বিরুদ্ধে অতি গোপনে শূজাউদ্দিনকে প্ররোচিত করে যাবতীয় প্রয়োজনীয় গোপন তথ্য সরবরাহ ও সমর্থন দান করতে

www.nagorikpathagar.org

থাকেন। বালকিষেণকে তিনি নিজের দলভুক্ত করে দিল্লীর দরবারকে প্রভাবিত করেন। ফলে নবাব মুর্শিদকুলীর নিজের উকিল বালকিষেণ বাবু তাঁর মনোয়ন সম্পর্কিত প্রস্তাব গোপন রেখে তাঁর প্রেরিত নজরানা–উপঢৌকন ব্যবহার করেই শূজাউদ্দিনের পক্ষে দিল্লীর দরবারে তদবির করেন এবং মুর্শিদকুলীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে শূজাউদ্দিনের নামে পরবর্তী নবাবীর সনদ সংগ্রহ করেন। [তারিখে বাংগালাহ, পৃঃ ১২৪, উদ্ধৃতি মোহর আলী, পূর্বোক্ত পৃঃ ৫৭৮]।

মুর্শিদকুলীর মৃত্যু শয্যার পার্শ্বে বসে থেকেই তিনিও তাঁর সংগীরা যাবতীয় খবর পাঠিয়ে শূজাউদ্দিনের দ্বারা মুর্শিদাবাদ আক্রমণ করান। শেষ পর্যন্ত মাতা জিনাত–উন–নিসা ও নানীর হস্তক্ষেপে সরফরাজ খান পিতাকে নবাব বলে মেনে নেন এবং ঘনায়মান যুদ্ধের অবসান ঘটে। কিন্তু–এর ফলে শূজাউদ্দিনের কাছে জগৎশেঠ অধিকতর আস্থাভাজন ও যোগ্য বলে বিবেচিত হন। ফলে, মসনদে আরোহণের পরই শূজাউদ্দিন চার সদস্য বিশিষ্ট যে প্রশাসনিক পরিষদ গঠন করেন, সেনাপতি আলীবর্দী খান, তাঁর বড় ভাই হাজী আহমেদ এবং প্রথমে উড়িষ্যায় পারিবারিক বাজারসরকার ও পরে বাংলার দীওয়ান পদে নিযুক্ত রায় রায়ান আলম চাঁদের সাথে জগৎশেঠকেও উহার সদস্য করে নেন। [সিয়ারুল মুতাখখেরীন, পৃঃ ২৮১]। এভাবে ১৭২৭ সালে প্রথম দফা বিশ্বাসঘাতকতার ফায়দা কুড়িয়ে জগৎশেঠ দরবারে তাঁর প্রভাব সুসংহত করেন। এর বিনিময়ে জগৎশেঠ শূজাউদ্দিনের প্রতিও পূর্বানুরূপ ভূমিকা পালন করেন।

শূজাউদ্দিন মৃত্যুর পূর্বে আলীবর্দী খানকে বিহারের নায়েব সুবাহদার (ডেপুটি গভর্ণর) পদে এবং পুত্র সরফরাজ খানকে সাহায্য করার জন্য হাজী আহমদ, রায় রায়ান আলমচাঁদ ও ফতেহচাঁদ জগৎশেঠকে নিয়ে গঠিত তিন–সদস্য প্রশাসনিক পরিষদ রেখে যান। [তারিখে বাংগালাহ, পৃঃ ১৩৩]। মৃত্যুকালে শূজাউদ্দিন পুত্র সরফরাজখানকে উত্তরাধিকারী ঘোষণা করে তাঁকে নসিহত করে যান শাসনকার্যে হাজী আহমদ, বাবু আলমচাঁদ ও বাবু জগৎশেঠের পরামর্শ মেনে চলতে। নবাব সরফরাজ পিতার নসিহত অনুসরণ করতে থাকেন। [তারিখে বাংগালাহ, পৃঃ ১৫২]।

শূজাউদ্দিনের মৃত্যুর প্রাক্কালেই ১৭৩৯ সালে জগৎশেঠ দেখতে পান যে, স্বাভাবিক ধারায় মসনদ প্রাপ্ত সরফরাজ খানের নিকট থেকে অতিরিক্ত কিছু আশা করা যায় না। এ কারণে তিনি আলমচাঁদ বাবুকে সাথে নিয়ে হাজী আহমদ

www.nagorikpathagar.org

ও আলীবর্দী খানের সাথে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হন সরফরাজ খানকে উৎখাত করে আলীবর্দী খানকে বাংলার নবাব করার লক্ষ্যে।

শুজাউদ্দিনের মৃত্যুর অল্প কিছুকাল আগে নাদির শাহ দিল্লী দখল করেন। তিনি সুবা বাংলার আনুগত্য ও রাজস্ব দাবী করে শুজাউদ্দিনকে যে চিঠি লিখেন, তা সরফরাজ খানের নিকট পৌঁছে। শুজাউদ্দিনের আমল থেকে বাংলার রাজস্ব দিল্লীতে প্রেরিত হতো ব্যাংকার জগৎশেঠের মাধ্যমে। এবারেও নাদির শাহের চিঠি প্রাপ্তির সাথে সাথে সরফরাজ খানের সম্মতি নিয়ে জগৎশেঠ তড়িঘড়ি রাজস্ব পরিশোধ করে দেন। হাজী আহমদ, বাবু আলমচাঁদ ও বাবু জগৎশেঠের পরামর্শে নাদির সাহের প্রতি আনুগত্য দেখিয়ে তাঁর নামে মুদ্রা প্রবর্তন এবং খুৎবা পাঠও করানো হয়। কিন্তু কয়েক মাসের মধ্যেই নাদির শাহ উপমহাদেশ ত্যাগ করে চলে গেলে বাদশাহ মুহাম্মদ শাহ শূন্য তখতে পুনরারোহন করেন। এই সুযোগে জগৎশেঠ হাজী আহমদের পক্ষে থেকে গোপনে দিল্লীর দরবারকে জানান যে, সরফরাজ খান রাষ্ট্রদ্রোহী [তারিখে বাংগালাহ, পৃঃ ১৫৫-৫৬] তারা সরফরাজ খানের বদলে আলীবর্দী খানকে বাংলার সুবাহদার করার জন্য দিল্লী দরবারের প্রভাবশালী আমীর ইসহাক খানের মাধ্যমে প্রস্তাব পাঠান এবং তদনুযায়ী সনদ সংগ্রহ করেন। [সিয়ারুল মুতাখখেরীন, ১ম খন্ড, পৃঃ ৩২৮-২৯]। তিন মুরুব্বী পরামর্শ দিয়ে সরফরাজ খানের সেনাবাহিনী অর্ধেক হ্রাস করান এবং আলীবর্দী খানকে গোপনে ২৫ লক্ষ টাকা (বর্তমান মুদ্রামানে ৫০০ কোটি টাকা) পাঠিয়ে বরখাস্তকৃত সৈন্যদেরকে তাঁর বাহিনীতে গ্রহণের ব্যবস্থা করে দেন। [সিয়ারুল মুতাখখেরীন, ১ম খন্ড, পৃঃ ৩২৭ এবং তারিখে বাংগালাহ, পৃঃ ১৫৭]। বাবু আলমচাঁদ ও জগৎশেঠ বিহারের হিন্দু জমিদারদেরকে আলীবর্দীর পক্ষে ভিড়িয়ে দিয়ে, বিপুল সংখ্যক হিন্দু সৈন্য দ্বারা তার বাহিনীকে শক্তিশালী করে এবং মুর্শিদাবাদের যাবতীয় গোপন তথ্য সরবরাহ করে আলীবর্দী খানকে মুর্শিদাবাদ আক্রমণের জন্য ডেকে নিয়ে আসেন। সামরিক গুরুত্বপূর্ণ গিরিপথ তেলিয়াগড়ি ও শকরগলি অতিক্রম করে সসৈন্য আলীবর্দী খান মুর্শিদাবাদের ২২ মাইলের মধ্যে উপস্থিত হবার পর জগৎশেঠ আতংকিত হবার নাটকীয় চেহারা নিয়ে আলীবর্দীর লেখা একখানা চিঠি সরফরাজ খানের হাতে দেন [সিয়ারুল মুতাখখেরীন পূর্বোক্ত, পৃঃ ৩৩২]।

প্রথমে হতভম্ব হবার পর সম্বিত ফিরে পেয়ে সরফরাজ খান হাজী আহমদকে কারারুদ্ধ করেন এবং আলীবর্দীর বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন-দুই মুরুব্বী বাবু আলম চাঁদ ও বাবু জগৎশেঠ তাঁর সহযাত্রী হন।

www.nagorikpathagar.org

www.nagorikpathagar.org

প্রথম দিনের যুদ্ধে আলীবর্দী খানের পরাজয় নিশ্চিত হয়ে উঠলে বাবু আলমচাঁদ সরফরাজ খানকে ইচ্ছাকৃত ভূল পরামর্শ দিয়ে যুদ্ধ মুলতুবী রাখেন এবং সারা রাত্রি যোগসাজশ চালিয়ে পরবর্তী দিন যুদ্ধের মোড় ফিরাবার ব্যবস্থা করেন [তারিখে বাংগালাহ, পৃঃ ১৭২ এবং রীয়াজুস সালাতীন, পৃঃ ৩২০] বাবু জগৎশেঠও সারারাত গোপনে সরফরাজ খানের সেনাপতিদেরকে নগদ অর্থবিত্ত এবং মুচলেকা (সেকালের ব্যাংক চেক বা ডি ডি) প্রদান করে পক্ষত্যাগে প্রলুব্ধ করেন [সীরার, ১ম খন্ড, পৃঃ ৩৩৬–এর অনুবাদকের টীকা এবং তারিখে বাংগালাহ, পৃঃ ১৬৬]।

তদসত্ত্বেও প্রভাতের প্রথম যুদ্ধে সরফরাজ খানের বিজয় দেখে নিজের বিশ্বাসঘাতকতা ধরা পড়ে গেছে মনে করে বাবু আলমচাঁদ আত্মহত্যা করেন [রিয়াজুস সালাতীন, পৃঃ ৩২০; তারিখে বাংগালাহ্, পৃঃ ১৭২]। কিন্তু দ্বিপ্রহর ও অপরাহ্নের যুদ্ধে শেষতক সরফরাজ খান নিহত হন। সংগে সংগে বাবু জগৎশেঠ বিজয়ী আলীবর্দী খানকে সাদর সম্বর্ধনা জানান।

এরপর থেকে নিজের মৃত্যু পর্যন্ত জগৎশেঠ মুর্শিদাবাদ নবাব দরবারে প্রচন্ড প্রতাপে কর্মকান্ড নিয়ন্ত্রণ করেছেন। দরবারে রাজস্ব পরিশোধের ব্যাপারে ব্যাংকার হিসেবে সারা দেশের জমিদারদের সাথে তাঁর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে ওঠে, মুদ্রা বিনিময়ের একচ্ছত্র ব্যবসায়ী ও টাকশালের মালিক হিসেবে বিদেশী বণিকদের সাথেও তাঁর সম্পর্ক ছিল প্রত্যক্ষ ও ঘনিষ্ঠ। মুর্শিদকুলী খানের আমল থেকে গড়ে উঠা নব্য হিন্দু বণিক শ্রেণীকে ও বিদেশী বণিকদেরকে পুঁজি সরবরাহ করে সারা দেশের ব্যবসা–বাণিজ্যে তাঁর তখন হিস্‌সা কায়েম হয়ে গেছে। দু'এক গন্ডা মন্ত্রী বা প্রধানমন্ত্রীর চেয়েও জগৎশেঠ তখন অনেক অধিক ক্ষমতার অধিকারী।

১৭৪০ সালে আলীবর্দী খান নবাব হন। ১৭০৭ সাল থেকে, সারা উপমহাদেশব্যাপী বৌদ্ধ–নিধনযজ্ঞের মতো, উত্তর মধ্য–পশ্চিম ও দক্ষিণ ভারত জুড়ে বর্ণহিন্দু, রাজপুত, জাঠ ও মারাঠা এবং শিখদের নেতৃত্বে মুসলিম–নিধনযজ্ঞ তখন প্রায় পূর্ণোদ্যমে চলছে। সুরা–নারী, শান–শওকত ও অলসতা–বিলাসিতার শিকার, মোগলাই সংস্কৃতির দাস মুসলিম শাসক ও অভিজাত শ্রেণীর আত্মঘাতী সংগাত–সংঘর্ষের সুযোগ নিয়ে নব–জাগ্রত ব্রাহ্মণ্য শক্তিগুলো তাদেরকে ধ্বংস করে চলছিল। সেখানে মুসলমানদের সাথে তাদের

www.nagorikpathagar.org

বিরোধিতা ছিল প্রত্যক্ষ। কিন্তু বাংলার পরিস্থিতি ছিল ভিন্নরূপ। এখানে প্রশাসন ছিল মিশ্র। নামে মুসলমানদের হাতে নবাবী থাকলেও সকল ক্ষেত্রেই প্রাধান্য ছিল হিন্দুদের। মোগলাই সংস্কৃতির সাধারণ বৈশিষ্ট্যের উত্তরাধিকারী বাংলার মুসলমান আমীর ওমরাহ ও উচ্চ শ্রেণীও যাবতীয় নৈতিকতা ও সততা বিসর্জন দিয়ে তখন ভাইয়ে-ভাইয়ে, পিতা-পুত্রে, খালা-ভাগিনা, চাচা-ভাতিজায় কাড়াকাড়ি, হানাহানি, সংঘাত-সংঘর্ষে লিপ্ত। তা সত্ত্বেও বাংলার জনসাধারণের সংখ্যাগুরু অংশ মুসলমান থাকায় এবং সারা বাংলায় বর্ণহিন্দুদের শাসনাধীনে কোন একক এলাকা না থাকায় নিজেরা সরাসরি সংঘবদ্ধ হয়ে মুসলমানদের উপর হামলা করার কোন সুযোগ তাদের ছিল না। এ কারণেই এ ব্যাপারে তারা বহিঃশক্তিকে কাজে লাগাবার কূটনীতি গ্রহণ করেন। আর মুর্শিদাবাদ দরবারে বেসরকারী ব্যক্তিত্ব হয়েও বিপুল ক্ষমতার অধিকারী জগৎশেঠ-প্রথমে পিতামহ ফতেহচাঁদ এবং ১৭৪৪-এর পরে তাঁর পৌত্র স্বরূপচাঁদ জগৎশেঠ এ ক্ষেত্রে দিতে থাকেন নেতৃত্ব। মুদ্রা ভাংগানী ব্যবসা সূত্রে ইংরেজদের সাথে তাঁর সম্পর্ক ক্রমশই ঘনিষ্ঠতর ও গভীরতর হয়ে উঠে। ১৭২৭ সালে মুর্শিদকুলী খাঁর সাথে প্রথম বিশ্বাসঘাতকতার আমল থেকে বন্ধু আলীবর্দী পার্শ্বে থেকে ঢাকায় ঘষেটি বেগমের 'বিশ্বস্ত' প্রাদেশিক দেওয়ান রাজবল্লভ এবং বিহারে নিযুক্ত প্রথম গভর্ণর জানকীরাম ও পরবর্তী গভর্ণর রামনারায়ণের সাথে, নবাবের দেওয়ান চিনু রায়, বাবু বীরুদত্ত, রায় রায়ান আলমচাঁদের পুত্র রায় রায়ান কিরাতচাঁদ ও উমিচাঁদের সহযোগিতায় রাজস্বের জামিন ব্যাংকার হিসাবে সারা বাংলার জামিদারদের সাথে ছিল স্বরূপচাঁদ জগৎশেঠের নিয়মিত যোগাযোগ। সেনাবাহিনীর প্রধান প্রধান সৈন্যাধ্যক্ষ রায় দুর্লভরাম, বাবু মানিকচাঁদ, রাজা নন্দকুমার, মোহনলাল প্রমুখও ছিলেন তাঁর ধরা-ছোঁয়ার মধ্যেই। ইংরেজরা কলকাতায় ৫২ জন, কাশিম বাজারে ২৫ জন ও ঢাকায় ১২ জন দেশী বণিকের মাধ্যমে মাল খরিদ করতেন। তাদের মধ্যে ঢাকার মাত্র ২ জন মুসলমান ছাড়া অবশিষ্ট ৮৫ জন হিন্দু প্রতিষ্ঠিত বণিকের সাথেও ব্যাংকার হিসাবে তাঁর সম্পর্ক ছিল। [এ আর মল্লিক, বৃটিশ পলিসি এন্ড দি মুসলিমস্ ইন বেংগল, পৃঃ ৬২]।

এসব সুযোগের তিনি সদ্ব্যবহার করেন। তাই দেখা যায়, বর্গী হামলার সময়ে রাঢ় অঞ্চলের হিন্দু জমিদারেরা লুন্ঠনের হাত থেকে রেহাই পায় এবং তিনিও বর্ধমানের মহারাজার সাথে মিলে যুদ্ধ চলাকালে কোটি কোটি টাকা আত্মসাৎ করেন। অবশ্য ধরা পড়ে তার মধ্যে এক কোটির কিছু বেশী-বতর্মান মুদ্রামানে কিঞ্চিতাধিক ২ হাজার কোটি টাকা নবাবকে ফেরত দিতে বাধ্য হন

www.nagorikpathagar.org

[সিয়ারুল মুতাখখেরীন, দ্বিতীয় খন্ড, পৃঃ ১১৪-১৫]। পক্ষান্তরে বর্গী হামলার হাত থেকে রক্ষার নামে, ইংরেজদের সাথে ব্যবসায়রত বর্ণহিন্দু বণিকদের চাঁদার টাকায় কোলকাতা নগরীকে ঘিরে মারাঠা রক্ষা-প্রাচীর ও পরিখা গড়ে তুলে সমগ্র দক্ষিণ-পশ্চিম বাংলার বিত্তশালী বর্ণ হিন্দু ব্যক্তিদেরকে এমনভাবে জমায়েত করা হয় যে, ১৬৯০ সালে প্রতিষ্ঠিত কলকাতার লোকসংখ্যা ১৭৫৭ সালের আগেই হয়ে দাঁড়ায় লক্ষাধিক। এবং সেই জনসংখ্যার এক শতাংশও মুসলমান ছিল না। শুধু তাই নয়, মারাঠা হামলার প্রক্ষিতে ইংরেজদের সামনে রেখে যে সুরক্ষিত বর্ণহিন্দু অধ্যুষিত কলকাতা নগরী গড়ে তোলা হলো, সেই নগরী থেকে ইংরেজরা বাবুদের মাধ্যমে মারাঠাদেরকে নবাবের বিরুদ্ধে সাহায্য করেছে বলেও আলীবর্দী খান অভিযোগ করেন [সীয়ারুল মুতাখখেরীন, দ্বিতীয় খন্ড, পৃঃ ১৬৩]। বাংলা মুলুকের মুসলিম কর্মকান্ডের একটি প্রধান ক্ষেত্র বর্ধমান বিভাগীয় অঞ্চল এ অধ্যায়ই বর্ণহিন্দু সমর্থিত বর্গী হামলার দরুন নিদারুনভাবে মুসলিমশূন্য হয়ে পড়ে।

ইংরেজদের দৌরাত্মে অতিষ্ঠ আলীবর্দী খান যতবারই ব্যবস্থা গ্রহণের উদ্যোগ নিয়েছেন,জগৎশেঠ মধ্যস্থতা করে তা মিটিয়ে দিয়ে ইংরেজদেরকে সুযোগ দিয়েছেন নবাবের কোলকাতাস্থ সেনাপতি মানিকচাঁদ ও চান্দেরনগরস্থ (চন্দন নগর) সেনাপতি রাজা নন্দকুমারের নিরাপদ আশ্রয়ে থেকে উত্তরোত্তর শক্তি সংগ্রহ করার [১৭৪৪ সাল ৮ নভেম্বর কোর্ট অব ডাইরেক্টরসে লিখিত চিঠি] নিজের দু'মুখী ঐতিহ্য রক্ষা করেই জগৎশেঠ একদিকে আলীবর্দীর দরবার অলংকৃত করেছেন, অন্যদিকে মারাঠা ও ইংরেজদেরকে সহযোগিতা দানকরেছেন।

আলীবর্দী খানের মৃত্যু ঘনিয়ে আসায় স্বরূপচাঁদ জগশেঠ ও তার ভাই মাহতাবচাঁদ জগৎশেঠ দেখতে পান যে, তরুণ তেজী সুশিক্ষিত ও দৃঢ় চরিত্রের সিরাজ-উদ-দৌলা নবাব হলে তাঁদের অবাধ অধিকার খর্ব হবার ও মুসলিম শাসন অবসানের সমন্বিত পরিকল্পনা ব্যর্থ হবার আশংকা রয়েছে। এ কারণে তাঁরা তাদের কর্মতৎপরতা আগের চেয়ে বহুগুণে বাড়িয়ে দেন।

কিন্তু তা সত্ত্বেও সিরাজ-উদ-দৌলার দরবারেও তারা আগের মতোই অনুগত ও আস্থাভাজন রয়ে যান। আর এরূপ থেকেই দ্বৈত ভূমিকা পালন করেন।

www.nagorikpathagar.org

স্বরূপচাঁদ জগৎশেঠ ও তাঁর সংগীরা এই মর্মে রাজধানী মুর্শিদাবাদে ব্যাপক ভীতি ছড়িয়ে দেন যে, "আহমদ শাহ আবদালী উত্তর ভারত জয় করে, দিল্লী দখল করেই বিহার সীমান্ত আক্রমণ করবেন।" "আবদালী ভীতি" এত ব্যাপক আকার ধারণ করে যে, পলাশী যুদ্ধের অল্প কিছুদিন আগেই সিরাজ-উদ-দৌলা তাঁর খাস সৈন্যদের নিয়ে গঠিত একটি শক্তিশালী বাহিনীকে বিহারের পশ্চিম সীমান্তে প্রেরণ করেন [হীল, সিরাজ-উদ-দৌলা টু ওয়াটসন, ২য় খন্ড, পৃঃ ২৪১]। এতে নবাবের সৈন্যবাহিনী দুর্বল হয়ে পড়ে এবং নবাবকে মহারাজা মনসবদার-জমিদারদের সরবরাহকৃত সৈন্যদের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়তে হয়। পরিস্থিতি এরূপ করে দিয়ে জগৎশেঠ একদিকে বর্ণহিন্দু জমিদার, মনসবদার ও সেনাপতিদেরকে পরিকল্পনা মাফিক সংঘবদ্ধ করেন, অন্যদিকে মোগলাই মুসলমান প্রভাবশালী ব্যক্তিদের মধ্যে ব্যাপকভাবে ঘুষ বন্টন করেন [মোহর আলী, হিস্টোরী অব দি মুসলিমস্ অব বেংগল, ১-ক, পৃঃ ৬৭৩]।

ইংরেজদের পক্ষে এটাও ছিল তাঁর সরফরাজ খানের সাথে আলীবর্দীর যুদ্ধকালে শিবিরে বসে ঘুষ বন্টনের মতোই রাজনৈতিক পুঁজি বিনিয়োগ। ১৭৫৭ সালের ২৩ এপ্রিল তারিখে ঈস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর কোলকাতা কাউন্সিল সিরাজ-উদ-দৌলাকে সিংহাসনচ্যুত করার সিদ্ধান্ত নিয়ে এক প্রস্তাব গ্রহণ করে উমিচাঁদকে তাদের পক্ষে কাজ করার দায়িত্ব প্রদান করার কয়েকদিন পরই মে মাসের প্রথম সপ্তাহে মুর্শিদাবাদে জগৎশেঠের বাড়িতেই উমিচাঁদ, রায়দুর্লভ, রাজবল্লভ, মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র, জগৎশেঠ, মীরজাফর প্রমুখ প্রভাবশালী ব্যক্তিদের সাথে ইংরেজ কোম্পানীর এজেন্ট ওয়াটস-এর এক গোপন বৈঠকে জগৎশেঠ ভ্রাতৃদ্বয়ের পরামর্শেই নবাব পরিবারের আত্মীয় হিসাবে মীরজাফরকে শিখন্ডীরূপে পরবর্তী নবাব করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। [মোহর আলী, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৬৭৪]।

তদনুযায়ী কোম্পানীর প্রধানগণ এক চুক্তিপত্র প্রণয়ন করে ১৯ মে তারিখে স্বাক্ষরদানের পর জগৎশেঠ বাবুরা স্বাক্ষরদান করেন এবং সর্ব শেষে ৪ জুন তারিখে মীরজাফর তাতে স্বাক্ষর দেন [এস সি হীল, উদ্ধৃতি আবদুর রহীম, বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস, পৃঃ ১১; কে কে দত্ত উদ্ধৃতি, ঐ]। এত সবের পরেও দরবারে জগৎশেঠ সিরাজ-উদ-দৌলার 'আস্থাভাজন' ছিলেন এবং তাঁর সাথে যুদ্ধযাত্রা করে পলাশীর মাঠে হাজির হযে সরেজমিনে পরিস্থিতি তদারক করেন, যাতে চুক্তিপত্রের শর্তানুযায়ী নবাবের পক্ষের সেনানায়কেরা সবাই পুতুলের ভূমিকা পালন করেন।

www.nagorikpathagar.org

নবাব শুজাউদ্দিন ও নবাব সরফরাজ খানের সাথে বিশ্বাসঘাতকতাকারী নবাব আলীবর্দীর সাথে তাঁর আত্মীয় ও সেনাপতি হয়েও মীরজাফর ক্ষমতার লোভে বিশ্বাসঘাতকতা করেন। মোগলাই ঐতিহ্যের অসহায় শিকার মুসলমান রাজপুরুষদের ক্ষেত্রে তখন এ কাজ স্বাভাবিক হলেও এ ব্যাপারে তিনি ও তার সহ-সেনাপতি খাদেম হোসেন, ইয়ার লতিফ ও রহীম খান বর্ণহিন্দু রাজা-মহারাজা ও ইংরেজদের সাথে হাত মিলিয়েছেন একথা প্রকাশ পাওয়ার পর মুর্শিদাবাদের আমীর ওমরাহগণ তাঁকে "ক্লাইভের গর্দভ" নামে অভিহিত করে ঘৃণা করতে থাকেন। ষড়যন্ত্র বৈঠকে মীরজাফর রাজী না হলে বাবুরা ইয়ার লতিফকে নবাব করতেন। মীরজাফর সম্ভবতঃ নিজের অপরাধ পরে উপলব্ধি করেন। এ কারণে তিনি ১৭৫৮ সালেই ওলন্দাজদের সাহায্য নিয়ে ইংরেজদের দেশছাড়া করার এক কর্মসূচী গ্রহণ করেন। কিন্তু তাঁর আস্থাভাজন এবং ইংরেজদের প্রতি বিশ্বস্ত প্রবীণ ও অমিত প্রভাবশালী জগৎশেঠের বদৌলতে ইংরেজরা শুরুতেই তা জানতে পেরে ১৭৫৯ সালের নভেম্বরে ওলন্দাজদেরকে আক্রমণ ও পরাভূত করেন। [মজুমদার, রায় চৌধুরী ও দত্ত, এ্যান এডভান্সড হিস্টোরী অব ইন্ডিয়া, পৃঃ ৬৬২]।

এর পরই নানা অজুহাতে মীরজাফরকে পদচ্যুত করে কলকাতায় নজরবন্দী করে রাখা হয় এবং তাঁর জামাতা মীর কাসিমকে ১৭৬০ সালের অক্টোবর মাসে নবাব করা হয়। কিন্তু জগৎশেঠ ভ্রাতৃদ্বয় তাদের নীতিতে তখনও অটল থাকেন। অর্থাৎ পুনরায় তারা নবাব দরবারের মহা প্রভাবশালী ব্যক্তিত্ব হিসাবে মীর কাসিমের "আস্থাভাজন" থেকে ইংরেজদের সাথে বিশ্বস্ততা বজায় রেখে চলতে থাকেন।

একবার নবাবী করায়ত্ত করার জন্য মীর কাসিম ইংরেজদেরকে বিপুল পরিমাণ নগদ অর্থ এবং বর্ধমান, মেদিনীপুর এবং চট্টগ্রাম জেলার রাজস্ব আদায়ের অধিকার ঘুষস্বরূপ প্রদান করলেও, ক্ষমতা হাতে পেয়েই তিনি ইংরেজদেরকে দেশছাড়া করার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ শুরু করেন। কিন্তু শুরুতেই সে খবর "আস্থাভাজন" জগৎশেঠদের মাধ্যমে ইংরেজদের গোচরীভূত হয়। ফলে প্রস্তুতি গ্রহণের আগেই তাঁকে যুদ্ধে নামতে হয়। মীর কাসিম তাঁর রাজধানী মুর্শিদাবাদ থেকে মুংগের সরিয়ে নেন। জগৎশেঠরাও সদলবলে সেখানে হাজির হন। তাঁদের ষড়যন্ত্রের টানে সারা বাংলার হিন্দু কর্মচারী, জমিদার ও ব্যবসায়ীরা সরাসরি নবাবের অবাধ্যতা দেখাতে আরম্ভ করে। ঘরে বাইরে এরূপ

www.nagorikpathagar.org

প্রতিকূলতার মধ্যেও মীর কাসিম পাটনা, কাটোয়া, মুর্শিদাবাদ, গিরিয়া, উধুয়ানালা ও মুংগেরে ৭টি যুদ্ধক্ষেত্রে ইংরেজদের মোকাবেলা করেন। কিন্তু প্রতি যুদ্ধের প্রাক্কালেই তাঁর শিবিরের সব গোপন তথ্য শত্রু শিবিরে পৌঁছে যায়।

প্রতিবারেই যুদ্ধে সমবেত সেনাপতিরাই তাঁর পক্ষ ত্যাগ করে পরাজয় ডেকে আনে। জগৎশেঠদের ঘুষের যাদুই এ অসম্ভবকে সম্ভব করে তোলে। পরিস্থিতির অস্বভাবিকতায় অনন্যোপায় মীর কাশিম তখন বিহারের গভর্ণর রাজা রামনারায়ণ, গোয়েন্দা পুলিশের প্রধান (এ যুগের আই.জিপি) রাজা মুরলী ধর, দেওয়ান রাজবল্লভ, দেওয়ান উমেদ রায়সহ বেশ কয়েকজন বিশ্বাসঘাতককে প্রাণদন্ডে দন্ডিত করেন। একই সাথে দন্ডিত স্বরপচাঁদ জগৎশেঠকেও বস্তায় ভরে মুংগের দুর্গের শীর্ষ থেকে গংগার বুকে নিক্ষেপ করা হয়।

জগৎশেঠরা ১৭৬৩ সালে 'মা গংগার' বুকে বিসর্জিত হলেও অচিরেই তাদের মিতামহ ফতেহচাঁদ জগৎশেঠের স্বপ্ন সফল হয়। ১৭৬৫ সালে ঈস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী কর্তৃক বাংলার রাজস্ব ও প্রশাসন ক্ষমতা স্বহস্তে গ্রহণের সাথে সাথেই দেশের বিভিন্ন উচ্চ মর্যাদায় অধিষ্ঠিত মোগলাই মুসলমানেরা ভারত মহাসাগরে নিক্ষিপ্ত হন এবং ১৭৭০ সালের পরিকল্পিত মহা মন্বন্তরে বাংলার ১ কোটি ৫৮ লাখ (সংখ্যাগুরু) মুসলমানদের মধ্য থেকে ৭৫ লাখকে মৃত্যুর গহ্বরে ঠেলে দিয়ে বাংলাকে যবনমযুক্ত করার ব্যবস্থা ফলপ্রসূ হয়। একটানা ৩৬ বছর (১৭২৭–৬৩) ধরে একে একে সাত জন শাসকের সাথে বিশ্বাসঘাতকতার এমন সফল নায়ক একমাত্র জগৎশেঠ গোষ্ঠী ছাড়া, শুধু বাংলায় নয়, সারা পৃথিবীতে আর কাউকে খুঁজে পাওয়া অসম্ভব। তবু তাঁদের উত্তরসূরী কোলকাতায়ী বাবু বুদ্ধিজীবীরা তাঁদেরকে বিশ্বাসঘাতকতার দায়ে কোথাও দায়ী করেননি।

পলাশী যুদ্ধের দেড় শতাব্দী পর, বৃটিশ ভারতে হিন্দু পূনর্জাগরণের পর্যায়ে, স্বাধীনতাকামী যুব সমাজের কাছে বিদেশী ইংরেজদের হাতে স্বাধীনতা তুলে দেয়ার কাজটি গর্হিত মনে হতে শুরু করে। তখন বাবু বুদ্ধিজীবীরা কল্পিত ইতিহাস, নাটক, প্রহসন ইত্যাদির মাধ্যমে, জগৎশেঠ বাবুদের বিশ্বাসঘাতকতার কাহিনী গুম করে দিয়ে এই মর্মে ব্যাপক প্রচার চালান যে, সেকালের প্রধান ও চরম ঘৃণ্য বিশ্বাসঘাতক ছিলেন মীরজাফর। ১৮৪৮ সালে প্রকাশিত ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগর রচিত "বাঙ্গালার ইতিহাস" নামক মুসলিম

www.nagorikpathagar.org

বিদ্বেষী বানোয়াট ইতিহাস দিয়ে তার শুরু। বর্ণহিন্দু 'প্রাতঃস্মরণীয় বাবুদে'র প্রচারণার ফলে মীরজাফর নামটাই বিশ্বাসঘাতকতার প্রতীক হয়ে দাঁড়ায়। মীরজাফর অবশ্যই বিশ্বাসঘাতক ছিলেন, কিন্তু ইতিহাস প্রমাণ করে তার চেয়ে বহু গুণে বড় ও সফল বিশ্বাঘাতক ছিলেন জগৎশেঠ। সে যুগ ছিল বিশ্বব্যাপী রাজতন্ত্রের যুগ। তখন পৃথিবীর সব দেশে সব সমাজেই ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তার করে বিদ্রোহের পতাকা উড়িয়ে নতুন রাজবংশ কায়েম হতো; প্রতিষ্ঠিত রাজবংশকে উৎখাতকারী ব্যক্তি প্রভু শাসকের প্রতি বিশ্বাসঘাতক থাকতেন। মীরজাফরও সেরূপ একজন বিশ্বাসঘাতক রাজদ্রোহী ছিলেন। কিন্তু জাতিদ্রোহী বা দেশদ্রোহী ছিলেন না। কারণ, বিজাতি, বিদেশী ইংরেজদেরকে তিনি আপন উদ্যোগে ডেকে আনেননি। সে কাজটি করেছিলেন জগৎশেঠ গোষ্ঠী ও তাদের সংগী-সাথীরা। তিনি ছিলেন শিখন্ডী মাত্র। তাই,কোন দেশদ্রোহী বিশ্বাসঘাতককে চিহ্নিত করার জন্য বাংলাদেশে বোধ হয় এখন "ব্যাটা বিশ্বাসঘাতক একেবারে মীরজাফর" না বলে সত্যের খাতিরে বলা উচিত, "বাটা বিশ্বাসঘাতক-একেবারে জগৎশেঠের বাচ্চা জগৎশেঠ।" কারণ দেশদ্রোহী হিসাবে জগৎশেঠের তুলনায় মীরজাফর তো একেবারেই নস্যি।

www.nagorikpathagar.org

'চরিত্রহীন' সিরাজউদ্দৌলা

মনে করুন আপনার প্রশংসা করে কোন বুদ্ধিমান লোক বললেন, "লোকটার শত্রুরা ওর সম্পর্কে অনেক বদনামই করছে। আমরা ততটা বিশ্বাস করি না। তবে লেখাপড়ার দিকে ও মোটেই মনোযোগী নয়, কুসংসর্গে পড়ে একটু মদ-গাঁজার অভ্যাস করে ফেলেছে, লাম্পট্য-লুচ্চামিতেও জড়িয়ে গেছে। আর সে কারণে পয়সা যোগাতে একটু আধটু চুরি-ডাকাতি হাইজ্যাকও করে। এছাড়া লোকটি ভালই। - যেমন স্বাস্থ্যবান তেমনি সাহসী"। এতে আপনি প্রশংসিত হলেন না নিন্দিত হলেন?

আমাদের কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ভারতীয় বাবু ঐতিহাসিকদের লেখা বই অথবা তারই চর্বিতচর্বণ পড়ানো হয়। তাতে সবাই বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজ উদ্দৌলার এমনিতরো প্রশংসা করেছেন। যেমন-আর, সি, মজুমদার, এইচ, সি, রায়চৌধুরী ও কালিকিংকর দত্ত লিখিত 'এ্যান এডভান্সড হিস্টরী অব ইন্ডিয়া' গ্রন্থে আছে-"সিরাজউদ্দৌলার বিরুদ্ধে তাঁর শত্রুরা যে নৃশংসতা ও স্বেচ্ছাচারী ভোগলিপ্সার অভিযোগ করে থাকে আমরা ততটা বিশ্বাস না করলেও অন্তত এতটুকু অস্বীকার করতে পারিনা যে, তিনি ছিলেন বিলাসী, আরামপ্রিয়, লাম্পট্যে লিপ্ত এক অপরিণত তরুণ-তাঁর পরিবেশই তাঁকে এরূপ হতে সহায়তা করেছিল।" অর্থাৎ সহজ বাংলায় তারা বলেছেন-সিরাজদ্দৌলা ছিলেন একটি দায়িত্ববোধহীন দুশ্চরিত্র তরুণ। কিন্তু সত্যি কি তাই?

বাবু ইতিহাসবিদদের মাঝে একমাত্র ব্যতিক্রম শ্রী অক্ষয় কুমার মৈত্রেয়। ১৯ শতকের ক্রান্তিলগ্নে সমকালীন রাজনৈতিক পেক্ষাপটে নব্য শিক্ষিত মুসলমানদের পিঠে হাত বুলানোর প্রয়োজনে তিনি প্রথম প্রচলিত ধারার প্রতিবাদ করে বলেন যে, সিরাজউদ্দৌলা মাত্র ১৪ মাস ১৪ দিন রাজত্ব করলেও শাসক হিসেবে তার যোগ্যতা কোন দিক দিয়ে কম ছিল না। একাধারে "তিনি ছিলেন নিখাঁদ দেশপ্রেমিক", "অসম সাহসী যোদ্ধা", "সকল বিপদে পরম ধৈর্যশীল", "কঠোর নীতিবাদী", "নিষ্ঠাবান", "ধার্মিক" এবং "যেকোন পরিণামের ঝুঁকি নিয়েও ওয়াদা রক্ষায় দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ ব্যক্তিত্ব।" "নবাব হবার পর তিনি কোন দিন মদ্য স্পর্শ করেন নাই।" "কিন্তু তার মন্ত্রীবর্গ, সেনাপতিমন্ডলী ও উচ্চপদস্থ কর্মচারীবৃন্দ সবাই ছিলেন তাঁর বিরুদ্ধে ইংরেজের সাথে ষড়যন্ত্রেলিপ্ত।"

উদ্ধৃত বাক্যগুলো দেখুন, অক্ষয় মৈত্রেয়, সিরাজউদ্দৌলা তাঁদের সবাই বিশ্বাসঘাতকতা করায় তাঁর পরাজয় ঘটে। তবু সেই অক্ষয় বাবুও সব সত্য খোলাখুলি বলতে পারেন নাই। কেননা তা হলে, তৎকালীন রাজা-মহারাজা বাবুদের

www.nagorikpathagar.org

কলঙ্ককাহিনী উৎকট দুর্গন্ধ নিয়ে আত্মপ্রকাশ করতো। কিন্তু বাবুরা সবাই দেশোদ্রোহিতার ও নবাবের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করার পেছনে সম্ভবমতো একটি যুক্তি খাড়া করা দরকার। এ কারণে, অক্ষয় বাবু সিরাজউদ্দৌলার বিরুদ্ধে প্রচারিত সর্বমুখী দুর্ণামের প্রভাব কাটিয়ে উঠতে না পেরে বলেছেন যে, প্রথম তারুণ্যে সিরাজ উচ্ছৃংখল ছিলেন এবং হিন্দু রাজা-মহারাজাদের কুলবালাদেরকেও উত্যক্ত করতেন। এ ব্যাপারে তিনি একটি মুখে মুখে চলে আসা গল্পের উল্লেখ করে বলেন যে, নাটোরের রাণী ভবানীর মুর্শিদাবাদস্থ বাড়ীর ছাদে তার একমাত্র বিধবা কন্যা তারাকে আলুলায়িত কেশে দেখতে পেয়ে সিরাজ তাকে লোপাট করার চেষ্টা করেন। সিরাজের হাত থেকে উদ্ধার পাবার জন্যে রাণী ভবানী তখন ভাগিরথী তীরে একটি বিরাট চিতা সাজিয়ে তাতে অগ্নিসংযোগ করে প্রচার করেন যে, তার কন্যা মারা গেছে এবং তাকে সে চিতায় দাহ করা হয়েছে। এভাবে সিরাজকে প্রতারিত করে তারা রক্ষা পান। কিন্তু এটা কি সম্ভব? সিরাজের মতো দুরন্ত তরুণ হবু নবাবের ইন্দ্রিয়লালসাকে (তা যদি সত্যি হতো) এভাবে বোকা বানিয়ে কি ঠেকানো সম্ভব ছিলো? তবু মহারাজাদের ক্ষুব্ধ হবার পক্ষে একটা যুক্তি দাঁড় করানো অত্যাবশ্যক ছিল। সে কারণেই এরূপ উড়ো গল্প ফেঁদে অক্ষয় বাবু সিরাজের কৈশোর-তারুণ্যের জীবনকে কালিমালিপ্ত করে তুলে ধরেছেন। [দেখুন, সিরাজউদ্দৌলা, অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় [পৃঃ ৮০, ৮৩] আরাম-আয়েশ, আমোদ-প্রমোদ, লাম্পট্য-লীলার জন্য একটি বিশেষ বয়স ও পরিমিত সময়ের প্রয়োজন হয়। আরো প্রয়োজন হয় একটি আয়েশী পরিবেশের। এর কোনটিই কি সিরাজের ছিল?

সিরাজের নানা নবাব আলীবর্দী খাঁ ইন্তেকাল করেন ১৭৫৬ সালের ৯ই এপ্রিল আর পলাশীর যুদ্ধে সিরাজ পরাভূত হন ১৭৫৭ সালের ২৩শে জুন তারিখে। তাঁর নবাবী আমলের সর্বমোট দৈর্ঘ্য ১৪ মাস ১৪ দিন। এ সময়ের মধ্যে তাঁকে চতুর্দিকে ষড়যন্ত্রের মোকাবেলা করতে হয়েছে আর কমপক্ষে পাঁচটি যুদ্ধ করতে হয়েছে।

ব্যাপারটা বুঝতে হলে একটু পেছনের দিকে তাকানো দরকার। উত্তর ও মধ্য ভারতের সমস্ত হিন্দু রাজা-মহারাজারা ১৫২৭ সালে ৮০ হাজার অশ্বারোহী সৈন্য ও ৫০০ রণহস্তী নিয়ে আগ্রার কাছে খানুয়ার ময়দানে বাবুবের সাথে যুদ্ধ করে তাঁর দশ হাজারেরও কম সৈন্যের কাছে নাস্তানাবুদ হবার পর [এ্যান এ্যাডভান্সড হিস্ট্রী অব ইন্ডিয়া, মজুমদার, দত্ত ও রায় চৌধুরী, পৃঃ ৪২১] এক নতুন কৌশল অবলম্বন করেন। হুমায়ুনের আমলে তারা মোগলদের বন্ধু হতে শুরু করেন। ইরানের অনুকরণে তারা হুমায়ুনকে ঝাঁকে ঝাঁকে বর্ণহিন্দু সুন্দরী নারী যোগান দিয়ে জমজমাট হেরেম গড়ে দেন। তাঁর মৃত্যুর পর ১৩ বছরের অশিক্ষিত বালক আকবরকে তারা সুরা ও

www.nagorikpathagar.org

নারীতে ষোলআনা তালিম দেন। বাদশাহ ও শাহজাদাদের সাথে ভগ্নি-কন্যাদের বিয়ে দিয়ে, তার সাথে দাসী-বাঁদী দিয়ে শাহীমহল দখল করে ফেলেন। এভাবে তাদেরকে হাত করে রাজপুতেরা মোগলশাহীর বড় বড় সামরিক ও প্রশাসনিক পদগুলো দখল করেন। তারপর মোগলদেরকে সাথে নিয়ে তারা সারা ভারতের তুর্ক আফগান মুসলমান শাহ-সুলতানদেরকে নৃশংসভাবে নির্বংশ করেন। মুসলমান সুলতানদের ধ্বংস করার পর সারা ভারতবর্ষে মোগল সুবাদার বা গবর্ণরেরা তাদেরকেই সংগে নিয়ে শাসন চালাতে থাকেন। শাহজাহান ও আওরঙ্গজেব হিন্দুদের এ ষড়যন্ত্র কিছুটা নিয়ন্ত্রণ করলেও তাঁদের পর দুর্বল বাদশাহ ও শাহজাদারা হিন্দুদের খেলার পুতুলে পরিণত হয়। তাদেরকে পরোয়া না করে মারাঠা ও জাঠ রাজপুত রাজারা তখন মধ্য ও উত্তর ভারতের সব এলাকার মুসলমানদের ধন-সম্পদ লুট করে তাদেরকে নৃশংসভাবে হত্যা করতে থাকে-এমন কি বাংলা, বিহার, উড়িষ্যাতেও বছর বছর তারা বর্গী নামে লুটেরা বাহিনী প্রেরণ করতে থাকে। তাদের লক্ষ্য ছিল ভারতব্যাপী হিন্দুরাজ কায়েম করা। তাই হিন্দুর সম্পত্তি তারা কখনো লুট করতো না-মুসলমানদেরকেই সর্বস্বান্ত করতো। এমনি পরিবেশেই ১৭৪০ সালে সিরাজউদ্দৌলার নানা আলীবর্দী খাঁ বাংলা, বিহার, উড়িষ্যার নবাবী লাভ করেন। মোগল শাসিত অন্য সব প্রদেশের মতো সুবা বাংলাতেও সামরিক ও প্রশাসনিক সব বড় বড় পদে তখন প্রতিষ্ঠিত ছিলেন রাজা-মহারাজা নামধারী বর্ণ-হিন্দু বাবুরা। রাজপুত জাঠ মারাঠাদের সাথে যোগাযোগ করে তারাও তখন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত মুসলমান শাসনের অবসান ঘটাতে। ১৭৪০ থেকে ১৭৬১ সালের মধ্যে আহমদ শাহ আবদালীর নয় দফা আক্রমণে জাঠ-রাজপুত-মারাঠা শক্তি বেদম মার খাওয়ার পর মুসলমানদেরে ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলার জন্য সুবা বাংলার বর্ণ-হিন্দুরা তখন নতুন মিতশক্তি হিসেবে বিদেশী ইংরেজদেরকে বেছে নেয়। তাদের ধারণা ছিল বিদেশী ইংরেজ আর কয়দিন থাকবে-মুসলমানরা ধ্বংস হলেই আবার হিন্দুরাজ কায়েম হবে। ঋষি বংকিমচন্দ্র আনন্দমঠ উপন্যাসে স্পষ্টভাবে একথা ঘোষণাও করেছেন।

এ কারণেই আলীবর্দীর মৃত্যুকালে বাংলা, বিহার, উড়িষ্যার সর্বত্রই চলছিল ইংরেজদের সাথে হিন্দু রাজা-মহারাজা সেনাপতি শেঠ সামন্তদের চক্রান্ত-ষড়যন্ত্র।

পুত্র-সন্তানহীন আলীবর্দীর বড় জামাতা নিঃসন্তান ঘষেটি বেগমের স্বামী ঢাকায়, মেঝো জামাতা, শওকত জংয়ের পিতা সাইয়েদ আহমেদ পূর্নিয়ায় ও ছোট জামাতা জয়নুদ্দীন পাটনায় গবর্ণর নিযুক্ত থাকেন। আলীবর্দীর জীবদ্দশায় তাদের সবারই মৃত্যু ঘটে। তাতেই ষড়যন্ত্রকারী রাজা-মহারাজাদের মিলে যায় মোক্ষম সুযোগ।

www.nagorikpathagar.org

আলীবর্দীকে মৃত্যুশয্যায় দেখেই ঘষেটি বেগমের দেওয়ান রাজা রাজবল্লভ তাঁকে বোঝালেন নবাবের জ্যেষ্ঠা কন্যা হিসেবে মসনদ তাঁরই প্রাপ্য। ঘষেটি বেগম ১৭৫৬ সালের মার্চ মাসেই দশ হাজার সৈন্য নিয়ে অবস্থান নিলেন মুর্শিদাবাদের উপকণ্ঠে। রাজবল্লভ নিজে এবং অন্যান্য বাবু শুভাকাঙ্খীরাও রইলেন তাঁর আশেপাশে।

মৃত্যুর আগেই আলীবর্দী সিরাজকে উত্তরাধিকারী মনোনীত করেছিলেন। সেই অধিকারে অবস্থা আঁচ করে সিরাজ উদ্দৌলা রাজবল্লভকে কারাবন্দী করলেন–আলীবর্দী তাঁকে মাফ করায় আবার ছেড়েও দিলেন।

আলীবর্দী ইন্তেকাল করলেন ৯ই এপ্রিল। সিরাজ বিচক্ষণতার সাথে খালার সাথে যুদ্ধ এড়িয়ে গেলেন। নিঃসন্তান খালাকে বোঝালেন 'আমিই তো আপনার সন্তান'। ভাগিনা–খালায় আপোষ হয়ে গেল। শংকিত হলেন রাজবল্লভ ও তাঁর সাথীরা। নিজের পরিবার আর নবাবের ঢাকাস্থ সম্পদসম্ভার নিয়ে তিনি পুত্র কৃষ্ণবল্লভকে পাঠালেন ইংরেজদের আশ্রয়ে কোলকাতায়।

এর পরই সব হিন্দু অমাত্যরা মেতে উঠলেন সর্বমুখী ষড়যন্ত্রে। ব্যাংকার কোটিপতি জগৎশেঠ, ঢাকার ধনকুবের ভিখনলাল পান্ডে, দীওয়ান রামজীবন, উপপ্রধান সেনাপতি রায় দুর্লভ, রাজা রাজবল্লভ, সেনাপতি মানিকচাঁদ, সেনাধ্যক্ষ মহারাজা নন্দকুমার, কাশিম বাজারের মহারাজা, ধনকুবের উমিচাঁদ, নদীয়ার জমিদার মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র দেব রায় চৌধুরী, নাটোরের রাণী ভবানী প্রমুখ যারা সেখানে ছিলেন অংশ নিলেন সে ষড়যন্ত্রে– সবাই বুঝলেন বিবাদ বাধাতে নবাব পরিবারের একজন লোক চাই। তাই তারা নবাবীর লোভ দেখিয়ে সামনে দাঁড় করালেন আলীবর্দী খাঁর ভগ্নিপতি বৃদ্ধ অপদার্থ মীর জাফরকে।

বাংলা, বিহার, উড়িষ্যার বিশাল জনপদ জুড়ে সর্বগ্রাসী এই ষড়যন্ত্রের আবর্তের মধ্যে একা দাঁড়িয়ে তখন ২০/২২ বছরের তরুণ নবাব সিরাজউদ্দৌলা। ৯ই এপ্রিল নানাজীর ইন্তেকালের পর ষড়যন্ত্রকারীদের বেষ্টনী ভেদ করে বড় খালা ঘষেটি বেগমের সস্নেহ সমর্থন আদায় করতেই সিরাজের কেটে গেল প্রায় পক্ষকাল। এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহেই খবর এলো মেঝো খালার বড় ছেলে পূর্ণিয়ার শওকত জঙ্গকেও তাঁর পরামর্শদাতা রাজা–মহারাজারা বুঝিয়েছেন, "সিরাজের মায়ের বড় বোন তোমার মা, আর তুমিও বয়সে সিরাজের বড়। তাই নানাজী সিরাজকে মসনদে বসিয়ে গেলেও সুবা বাংলার নবাবীর আসল দাবীদার তুমি"। আর সেই অনুসারেই শওকত জঙ্গ বিদ্রোহ ঘোষণা করেছেন। পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য মাত্র কয়েক দিনের প্রস্তুতি নিয়েই মে

www.nagorikpathagar.org

বাংলার শেষ স্বাধীন নওয়াব সিরাজ উদ্দৌলা

www.nagorikpathagar.org

মাসের মাঝামাঝি তিনি যুদ্ধযাত্রা করলেন পূর্ণিয়া অভিমুখে। মুর্শিদাবাদ থেকে প্রায় ৮০ মাইল এগিয়ে রাজমহলের কাছে গিয়ে তিনি ২২ শে মে তারিখে পত্র পেলেন শওকত জঙ্গয়ের কাছ থেকে, শওকত জঙ্গ তাকে মেনে নিয়েছেন।

কিন্তু একই সময়ে কোলকাতা থেকে খবর এলো, রাজা রাজবল্লভের ছেলে কৃষ্ণবল্লভের কাছ থেকে দেশের রাজা-মারাজাদের মনোবাঞ্ছা জানতে পেরে ইংরেজরা কোলকাতায় নতুন দুর্গ তৈরী করছে-নবাবের অনুমতি না নিয়েই। দ্রুত ফিরে এলেন সিরাজমুর্শিদাবাদে।

মুর্শিদাবাদে এক দুই দিনের বিরতি দিয়েই ৫ই জুন তারিখে সিরাজের নতুন যুদ্ধযাত্রা কোলকাতা অভিমুখে। অশ্বারোহী ও পদাতিক বাহিনীর সাথে দরকারী রসদ-খোরাক মাল-সামানের লটবহর নিয়ে মাত্র ১১ দিনে ১৫০ মাইল পথ পাড়ি দিয়ে ১৬ই জুন তারিখে কোলকাতায় হাজির হলেন। মনে রাখতে হবে, সেকালে বিমান-হেলিকপ্টার, ট্রেন-ট্রাক কিছুই ছিল না। নৌকা ও গরু-মহিষের গাড়ী অবলম্বন করে এত পথ অল্প সময়ে অতিক্রম করতে তাকে অবশ্যই দিন-রাত্রি বিরামহীন পথ চলতে হয়েছে। ১৮ই জুন তিনি কলকাতা আক্রমণ করলেন। নিজেই সেনাবাহিনীর সঙ্গে থেকে তিন দিনের যুদ্ধ শেষে ২০শে জুন বিজয়পতাকা উড়ালেন। কোলকাতায় নির্মীয়মাণ দুর্গ ভেংগে ফেলে মাত্র তিন দিনের মধ্যে ২৩শে জুন আবার তিনি রওয়ানা হলেন ১৫০ মাইল দূরের রাজধানী মুর্শিদাবাদ অভিমুখে। পথে হুগলী ও চন্দননগরে ফরাসী ও ওলন্দাজ বাণিজ্যকুঠি দুইটির নিরাপত্তাব্যবস্থা তদারক করে ১১ই জুলাই মুর্শিদাবাদ উপস্থিত হলেন। তখন একদিকে তাঁর সেনাবাহিনী শ্রান্ত-ক্লান্ত, অন্যদিকে কোষাগারে নগদ অর্থের অভাব-তার উপর বর্ষাকালের প্রতিকূল আবহাওয়া।

অর্থবিত্ত সংগ্রহ ও সেনাবাহিনী পুনর্গঠনে সিরাজ তখন পাগলপ্রায়। এর মধ্যেই খবর পেলেন, শওকত জঙ্গ তাকে শঠতামূলক শান্তির আশ্বাস দিয়ে দিল্লীর পুতুল সম্রাট দ্বিতীয় আলমগীরের প্রধানমন্ত্রী ইমাদ-উল-মূলকের নিকট থেকে বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার সুবাদারী ফরমান লাভ করে মুর্শিদাবাদের মসনদ দাবী করেছেন এবং তাকে নির্দেশ দিয়েছেন ঢাকায় গবর্ণরের পদে যোগদান করতে। খবর পেয়েই পুনরায় তিনি যুদ্ধযাত্রা করলেন ১৫০ মাইল দূরে অবস্থিত পূর্ণিয়া অভিমুখে ২৪শে সেপ্টেম্বর তারিখে। সসৈন্য এগিয়ে গিয়ে রাজমহলের ৩০ মাইল উত্তরে তিনি শওকত জঙ্গ-এর সেনাপতি শ্যামসুন্দর বাবুর নেতৃত্বে চালিত সেনাবাহিনীর মুখোমুখী হলেন ১২ই অক্টোবর, মনিহারি গ্রামের ময়দানে। যুদ্ধে শওকত জঙ্গ নিহত হলেন। সিরাজউদ্দৌলা পরাজিত সৈন্যদের পেছনে ধাওয়া না করে প্রত্যাবর্তন করলেন ষড়যন্ত্রের ঘাঁটি অরক্ষিত

www.nagorikpathagar.org

রাজধানী মুর্শিদাবাদে। ৩রা নভেম্বর মুর্শিদাবাদ ফিরলেন। রাজধানীতে ফিরে তিনি খবর পেলেন কোলকাতায় তাঁর সেনাপতি মানিক চাঁদ রাজা রাজবল্লভের ছেলে কৃষ্ণবল্লভের সাথে মিলে ইংরেজদের দোসর হয়ে গেছেন। তাদের উৎসাহে ও আশ্বাসে ইংরেজরা কর্ণাটক থেকে নতুন করে যুদ্ধজাহাজ ও সৈন্য আমদানি শুরু করেছেন। কোলকাতায় তারা আগের যুদ্ধে ধ্বংস করে দেয়া দুর্গ পুনঃনির্মাণ করেছে এবং নতুন দুর্গ নির্মাণ করছে, নবাবের দূতকে তারা অপনাম করেছে।

এরূপ অবস্থায় মাত্র একমাস-এর মধ্যে পূর্ণিয়া ফেরত রণক্লান্ত বাহিনীকে যতোটুকু সম্ভব সংগঠিত করে রসদ ও মাল-সামান সংগ্রহ করে ডিসেম্বরের মাঝামাঝি আবার যুদ্ধ যাত্রা করলেন ১৫০ মাইল দূরে কোলকাতা অভিমুখে।

নবাব কোলকাতা পৌঁছাবার পূর্বেই যুদ্ধের এক নাটক অভিনিত হয়ে গেল। কর্ণাটক থেকে কয়েকটি জাহাজে নতুন কিছু ইংরেজ সৈন্য নিয়ে ক্লাইভ এলেন কোলকাতা উদ্ধার করতে। কোলকাতার দক্ষিণে হুগলী নদীর মুখে তান্না, বজবজ, মাকবা ও আলিগড়ে নবাবের ৪টি সামরিক ঘাঁটি ছিল নদী পথ পাহারায় নিয়োজিত। কলকাতা থেকে সেনাপতি মানিকচাঁদ সসৈন্যে অগ্রসর হলেন নদী পথে ইংরেজদের বাধা দিতে। কিন্তু যুদ্ধ যখন পুরাদমে শুরু হলো ঘনিষ্ঠ পার্শ্বচরদের নিয়ে মানিক চাঁদ অন্তর্ধান করলেন-যুদ্ধক্ষেত্র থেকে সরে পড়েলেন। সেনাপতি পালিয়েছেন অথবা মারা গিয়েছেন মনে করে নবাবের সৈন্যরা ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল এবং ইংরেজ সৈন্যরা এগিয়ে এসে কোলকাতায় যুদ্ধের পুরাদস্তুর প্রস্তুতি গ্রহণ করলো।

৩রা ফেব্রুয়ারী সিরাজউদ্দৌলা কোলকাতার উপকণ্ঠে হাজির হলেন। যুদ্ধের আগেই তিনি জানতে পারলেন ইংরেজ সেনাবাহিনীতে এখন বিপুলসংখ্যক বাঙালী সৈন্যও জমায়েত হয়েছে নবাবের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে। এসব বাঙালী সৈন্যরা কাদের আমন্ত্রণে হাজীর হলো?

দীর্ঘ ১২৮ বছর পর সেই আমন্ত্রণকারীদের পরিচয় এদেশের সাধারণ মানুষের কাছে উন্মোচিত হয়। কোলকাতার ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গের রেকর্ডরুমে রক্ষিত 'প্রেসিডিংস অব দি গবর্ণর এন্ড ক্যালকাটা কাউন্সিল' নামে সংকলিত অবস্থায় রক্ষিত একটি ফাইল থেকে দলিল-দস্তাবেজ ও তথ্যাবলী সংগ্রহ করে সাবজজ শ্রী চন্ডী চরণ সেন উদীয়মান জাতীয়তাবাদী ভাবধারার পরিপোষণকল্পে "মহারাজা নন্দকুমার ও শতবর্ষ পূর্বে বংগে সামাজিক অবস্থা" নামে একখানি গ্রন্থ ১৮৮৫ সালে রচনা ও প্রকাশ করেন। গ্রন্থে চন্ডী বাবু প্রমাণ

www.nagorikpathagar.org

করেন যে, বাংলার শাসন ক্ষমতা দখলের ব্যাপারে ইংরেজরা রাজা-মহারাজাদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেন। চান্দেরনগর (চন্দননগর) ফরাসী কুঠি দখলের প্রাক্কালেই ঈস্ট ইন্ডিয়া কোম্পনীর বাণিজ্যিক স্বার্থে নবাবী শাসনের অবসান ঘটানোর লক্ষ্যে হুগলীর ফৌজদার মহারাজা নন্দকুমার, শিখ খালাসা ধর্মীয় উমিচাঁদ ও বর্ধমানের মহারাজা ত্রৈলোক্য চন্দ্রের সাথে ইংরেজদের চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। চুক্তির শর্তানুযায়ী মহারাজা ত্রৈলোক্য চন্দ্রকে বাংলার সিংহাসনে বসিয়ে, নন্দকুমারকে প্রধানমন্ত্রী পদে নিয়োগের এবং উমিচাঁদকে নগদ ৩০ (ত্রিশ) লাখ স্বর্ণমুদ্রা প্রদানের ওয়াদা ছিল। নন্দকুমারকে নগদ ঘুষও প্রদান করা হয় [অক্ষয় মৈত্রেয়,সিরাজউদ্দৌলা, পৃঃ ৩০৩] এসবের বিনিময়ে নন্দকুমার ইংরেজদের প্রধান যুদ্ধউপদেষ্টা হিসেবে কাজ করতে থাকেন, উমিচাঁদ ইংজেদের হয়ে দেশায় সৈন্য ও সমরসম্ভার সংগ্রহ করেন- মহারাজা ত্রৈলোক্যচন্দ্র সর্বাত্মক সহযোগিতা দান করেন। ইংরেজরা রাজপুত বংশীয় মহারাজা ত্রৈলোক্য চন্দ্র ও পাঞ্জাবী উমিচাঁদকে কিছুই দেন নাই। কুলীন মহারাজা নন্দকুমারকে দিয়েছিলেন-দলিল জালিয়াতির মিথ্যা অভিযোগে ১৭৭৫ সালের ১৮ই জুন কোলকাতা সুপ্রীম কোর্টের প্রদত্ত রায় অনুযায়ী শনের রশিতে বেঁধে শ্যাওড়া গাছে ফাঁসি দিয়েছিলেন। এ গ্রন্থে গোপন খবর ফাঁস করার দায়ে সাবজজ চন্ডীবাবু চাকরিচ্যুত ও কারাদন্ডে দন্ডিত হলেও বাংলার জনসাধারণকে কিছু গোপন তথ্য উপহার দিয়ে গেছেন।

পলাশী যুদ্ধের শতাব্দীকাল পরে বাবু রাজীব লোচন তাঁর রচিত "কৃষ্ণচন্দ্র চরিত" গ্রন্থে স্পষ্ট করে জানান যে, নদীয়ার মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র বাংলায় মুসলিম শাসন উৎখাতের ব্যাপারে বলিষ্ঠ ভূমিকা গ্রহণ করেন [কে, কে, দত্ত, আলীবর্দী এন্ড হিজ টাইমস, পৃঃ ১১৮]। ১৮৭২ সালে প্রকাশিত "দি টেরিটোরিয়াল এ্যারিস্টক্রেসী অব বেঙ্গল- দি নাদীয়া রাজ" গ্রন্থেও বলা হয় যে, নদীয়া, বর্ধমান, বিষ্ণুপুর, দিনাজপুর, বীরভূম ও মেদিনীপুরের জমিদারেরা মুর্শিদাবাদে উপস্থিত হয়ে দিওয়ানে সুবাহ মহারাজা মহেন্দ্রের মাধ্যমে নবাবের নিকট কতগুলো দাবী দাওয়া পেশ করে তা আদায়ে ব্যর্থ হন। তখন দিওয়ান নিজে জগৎ শেঠ ও অন্যান্য অমাত্যবর্গসহ জমিদারদের সাথে এক বৈঠকে মিলিত হয়ে নবাবকে উৎখাত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন এবং সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র কোলকাতায় গিয়ে মিঃ ড্রেকের সাথে সাক্ষাৎ করে তাকে এ মর্মে আশ্বাস দেন যে, নবাবকে উৎখাতের ব্যাপারে হিন্দু জমিদার শ্রেণী ও অমাত্যবর্গ সার্বিক সমর্থন দান করবেন [Imperial Gazetteer of India, Bangla, 11, P. 424]।

www.nagorikpathagar.org

যাহোক, এক সপ্তাহের মধ্যে কয়েক দফা খন্ডযুদ্ধ হওয়ার পর পরিস্থিতি প্রতিকূল দেখে কতিপয় অপমানজনক শর্ত মেনে নিয়ে ইংরেজদের সাথে নবাব আলীনগর চুক্তি স্বাক্ষর করতে বাধ্য হলেন। এটা ছিল ৯ই ফেব্রুয়ারী ১৭৫৭ সাল।

কোলকাতায় এ যুদ্ধে নবাবের পক্ষে ৪০ হাজার অশ্বারোহী, ৬০ হাজার পদাতিক ও ৩০টি কামান থাকা সত্ত্বেও ৮১১ জন ইউরোপীয় সৈন্য ও ১৪টি কামানের পেছনে মোতায়েন মাত্র ১৩ শত বাঙালী সৈনিকের কাছে নবাবের বিশাল আয়তন পুতুল বাহিনী পরাজিত হলো। তখনই নবাব বুঝতে পারলেন তাঁর বাহিনীর রাজা-মহারাজাদের মনসবদারীতে লালিত সৈন্য সামন্তরাও রাজা-মহারাজাদের ইংগিতেই অভিনয় করেছে। কিন্তু তিনি তখন অনন্যোপায়। ইংরেজদের সাথে আলীনগরের সন্ধি সম্পাদন করে নবাব মুর্শিদাবাদ যাত্রা করেন এবং মার্চ মাসের প্রথম সপ্তাহে রাজধানীতে পৌছেন। এদিকে মুর্শিদাবাদে জগৎশেঠের নেতৃত্বে মহারাজা অমাত্যবর্গ তখন ব্যাপক গুজব ছড়ান যে, আহমদ শাহ আবদালী দিল্লী দখল করে বিহার সীমান্ত আক্রমণ করতে আসছেন। নিজের শক্তিশালী খাস সেনাবাহিনীকে নবাব বিহার সীমান্তে পাঠিয়ে দিলেন। অবশিষ্ট সৈন্যরা রাজা-মহারাজাদের মনসবদারীর অধীনে। সেসব সৈন্যরা তাদেরই অনুগত। তদুপরি জগৎ শেঠের নেতৃত্বে মুর্শিদাবাদের, উমিচাঁদের নেতৃত্বে কোলকাতার এবং ভিখনলাল পান্ডের নেতৃত্বে ঢাকার শেঠজীরা সবাই তখন নবাবকে নগদ মুদ্রা সরবরাহ করতে নারাজ। বরং রাজা-মহারাজাদের সাথে মিলে তখন তারা ইংজেদেরই অর্থ যুগিয়ে যাচ্ছেন। সারা দেশের যাবতীয় রাজস্ব জমিদারেরা ব্যাংকার জগৎশেঠের মাধ্যমে পরিশোধ করতেন। নবাব তা একালের চেক বা ডিডির মতো হুন্ডিতে গ্রহণ করতেন। জগৎশেঠের সহযোগিতায় নগদ টাকা পাওয়া বন্ধ হয়ে গেল। ২০/২২ বছরের তরুণ সিরাজদ্দৌলা যেদিকে তাকাচ্ছেন সেদিকেই বিশ্বাসঘাতকদের চেহারা দেখছেন। দিনরাত্রি বিরামহীন চিন্তায় তখন তার উন্মাদ হয়ে যাবার কথা। কিন্তু অসাধারণ প্রতিভার অধিকারী সিরাজ তা হননি।

এক মাসের মধ্যেই নতুন খবর এলো শেঠজীদের অর্থবিত্তে বিশ্বাসঘাতক রাজা-মহারাজাদের আনুকূল্যে ও বাবু সৈন্যদের সমর্থনে ক্লাইভ তখন সার্বভৌমত্বের পতাকা উড়িয়ে মুর্শিদাবাদ অভিমুখে অগ্রসর হয়ে ২৩শে মার্চ তারিখে চান্দের নগর কূঠি আক্রমণ করেছেন এবং নবাবের হুগলী ঘাঁটির

www.nagorikpathagar.org

সেনাপতি ফৌজদার মহারাজ নন্দকুমার, উপ-প্রধান সেনাপতি রাজা রায়দুর্লভ ও রাজা মানিক চাঁদের বাবু সৈনিকেরা তাদের হয়েই কাজ করবেন। তাই তিন হাজার সৈন্যই ছিল যথেষ্ঠ।

দেশব্যাপী ষড়যন্ত্রে দিশেহারা অসহায় নবাব তখন জেনে শুনেই তাঁর অবিশ্বস্ত মনসবদারী সেনাবাহিনী সাথে নিয়ে আত্মরক্ষার প্রয়োজনে উপস্থিত হন পলাশীর আমবাগানে। পরিণতি যা হবার তাই হলো। পলাশীর আমবাগানে যুদ্ধের এক মহানাটক অনুষ্ঠিত হলো। নবাব সিরাজউদ্দৌলা পরাজিত হলেন। বাংলার স্বাধীনতা সূর্য অস্তমিত হলো।

সিরাজউদ্দৌলার এ পরাজয়ের পেছনের পূর্নাঙ্গ ইতিহাস আজও আমাদের হস্তগত হয়নি। পলাশীর পরে রাজনৈতিক দাবার ঘুটি চেলে আট বছরের মধ্যেই মুসলমান শাসনের অবসান ঘটিয়ে রাজা-মহারাজারা নতুন প্রিয় প্রভু ইংরেজদের হাতে বাংলার শাসনভার তুলে দেন। এর পরেই শুরু হয় মুসলিম নিধনের ইঙ্গ-বর্ণহিন্দু যৌথ অভিযান। ১৮৭২ সালের "বেঙগল আর্মস রেগুলেশন এ্যাক্ট" কার্যকরী করার মধ্য দিয়ে বাংলায় মুসলমানদেরকে সামাজিক, শৈক্ষিক, আর্থিক, নৈতিক ভাবে সম্পূর্ণ ধ্বংস করে দিয়ে পলাশীর ইতিহাস লিখতে শুরু করেন কোলকাতার বাবু বুদ্ধিজীবীরা। তারা পলাশীর মাঠে বাংলার স্বাধীনতার জন্যে দেশপ্রেমিক দুই জন সৈনিকই খুঁজে পান। একজন মোহন লাল অন্যজন মদন লাল- অর্থাৎ মীর মর্দান মোহন লালকে যুদ্ধে আহত বলে বাবু বুদ্ধিজীবিরা উল্লেখ করলেও, পরবর্তীতে তিনি ইংরেজদের অধীনে উচ্চপদস্থ খাদেম ছিলেন] রাজা-মহারাজা সেনাপতিরা কেউ ইংরেজকে বাধা দেননি বরং দাঁড়িয়ে থেকে তাদেকে সহযোগিতা করেছেন এবং নবাবের যাবতীয় গুপ্ত তথ্য সরবরাহ করেছেন। চন্দেরনগর দখলের পর আসলে সেখান থেকে দক্ষিণে সমুদ্র পর্যন্ত ইংরেজের রাজত্ব কায়েম হয়ে যায়। সারাদেশের রাজা-মহারাজারা তখন বিপুল উৎসাহে ইংরেজদের সাথে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়ে যান। সংগে রাখেন শিখণ্ডী মীর জফরকে। এবং নবাব বিরোধী ষড়যন্ত্রে যোগাযোগ রক্ষার দায়িত্ব দেয়া হয় রাজা উমিচাঁদকে। এপ্রিল মাসের শেষ সপ্তাহে মুর্শিদাবাদে জগৎ শেঠের বাড়ীতে জগৎ শেঠ, উমিচাঁদ, রাজবল্লভ, রায়দুর্লভ, মীর জাফরসহ আরও অনেক বিশিষ্ট বিশ্বাসঘাতকেরা এক বৈঠকে মিলিত হন। ইংরেজ কোম্পানীর এজেন্ট ওয়াটস সাহেব বোরকা পরে পালকী চড়ে এসে জগৎশেঠের বাড়ীতে ষড়যন্ত্র বৈঠকে যোগ দেয়। এখানেই প্রস্তুত হয় ইংরেজ ও দেশী বিশ্বাসঘাতক রাজা-মহারাজা সামন্ত সেনাপতিদের মাঝে চূড়ান্ত চুক্তি। ১৯শে মে তারিখে কোলকাতায় ইংরেজ

www.nagorikpathagar.org

কোম্পনীর লোকেরা এবং তার আগেই রাজা মহারাজারা এই সর্বনাশা চুক্তিতে স্বাক্ষর দেন। হতভাগা মীর জাফর ছিলেন সর্বশেষ স্বাক্ষরদাতা (৪ঠা জুন, ১৭৫৭ সালে)। চুক্তিতে স্বাক্ষর করেই ক্লাইভের নেতৃত্বে ইংরেজ সৈন্যরা বাবু সেনা–সামন্তদের সমবায়ে গঠিত তিন হাজার সৈন্যের বাহিনী নিয়ে রওয়ানা হন মুর্শিদাবাদ দখল করতে। তারা জানতেন নবাব বাহিনীর রাজা মহারাজারা এবং সেনা সামন্তও বিশ্বাসঘাতক। তবু মাত্র একজন মুসলমানই খুঁজে পান তারা, পরিবেশের শিকার হতভাগ্য প্রধান সেনাপতি মীর জাফর আলী খান ওরফে মীর জাফরকে। পাশে দাঁড়ানো উপ–প্রধান সেনাপতি রাজা রায়দুর্লভকেও তারা কেউ কোন দিন দেখেননি।

কোলকাতার বাবু বুদ্ধিজীবীরা পলাশী যুদ্ধের এক শত বছর পর পলাশী যুদ্ধের কাল্পনিক ইতিহাস খাড়া করতে শুরু করলেন। মাঠে নামলেন সিরাজউদ্দৌলাকে কেন্দ্র করে নাটক লিখতে। 'জালিম' সিরাজের বিরুদ্ধে তারা অভিযোগ আনলেন কোলকাতার অন্ধকূপ হত্যার। আর নাটকে সিরাজের মুখে ডায়লগ দিলেন, "যৌবনের প্রথম উন্মাদনায় চেয়েছিলেম নারী, পেয়েছিও নারী, তখন নারীকে মনে হতো ভোগের সামগ্রীর মতো।"

অন্ধকূপ হত্যার অভিযোগে তারা লিখলেন, কোলকাতার প্রথম যুদ্ধে বিজয়ী সিরাজ উদ্দৌলা ১৩ x ১৪·১০´ আয়তনের একটি জানালাহীন ছোট কামরায় ১৪৬ জন ইংরেজকে আটক করে কারারুদ্ধ অবস্থায় কয়েদ করে রাখেন এবং এক রাত্রেই শ্বাসরুদ্ধ হয়ে তাদের ১২৩ জনের মৃত্যু ঘটে। এত ছোট আয়তনের একটি কামরায় ১৪৬ জন লোককে দুরমুজ মেরে জুট বেলিং–এর মতো ঠেসে–গাদায়ে ভরলেও যে আঁটানো সম্ভব নয় তা বোঝার মতো বালকসুলভ বুদ্ধিও বাবু বুদ্ধিজীবীদের মগজে তখন ঠাঁই পায়নি। তারা সবাই ব্যস্ত ছিলেন 'জালিম' সিরাজের 'জুলুমকে' অকল্পনীয়ভাবে বড় করে দেখাতে। ইংরেজদের বানানো গল্পকে মূলধন করে মিথ্যা দুর্নাম রটনা করা হলোঃ 'সিরাজ এত বড় লম্পট ও জালিম ছিলেন যে, দিল্লী থেকে তৎকালীন ১ লক্ষ টাকা (বর্তমান মুদ্রামানে ২০ কোটি টাকা) ব্যয়ে ফৈজুবালা নাম্নী এক সুন্দরী বায়জীকে মুর্শিদাবাদ এনে রক্ষিতা রাখেন। কিন্তু ফৈজুবালা অন্যের প্রতি প্রণয়াসক্ত হওয়ায় তাকে একটি ঘরে আটক করে দরজা জানালা ইটের দেয়াল গেঁথে বন্ধ করে দেন এবং ৬ মাস পর ঘরের দেয়াল ভেঙ্গে তার মৃতদেহের কংকাল দেখে উল্লাস–নৃত্য করেন।' একবারও তারা ভাবলেন না যে, এ বানোয়াট গলপ কিভাবে বিশ্বাসযোগ্য হবে। নানা আলীবর্দী ব্যক্তিগত তত্ত্বাবধানে রেখে নাতিকে গড়ে তুলে ১৯ বছর বয়সে

www.nagorikpathagar.org

বিয়ে দিলেন নিজের পরিবারে আশৈশব পালিতা সুশিক্ষিতা পরমাসুন্দরী লুৎফুন্নেছার সাথে, কয়েক কোটি টাকা ব্যয়ে বিপুল উৎসব আয়োজন করে। নবাব আলীবর্দীর জীবদ্দশায় সেই তরুণ এরূপ করার সুযোগ পেলেন কিভাবে? স্বামীর শাহাদাতের পর সিরাজের তরুণী বিধবা স্ত্রী মীরণের বিবাহ-প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে, সারা জীবন, দীর্ঘ অর্ধ শতাব্দী স্বামীর কবরে কোরআন শরীফ পড়ে কাটিয়ে দিলেন। কোন দুঃশ্চরিত্র স্বামীর অসতী স্ত্রী এমন করে কিনা তাও তারা ভাবলেন না।

কিন্তু ১৯৩০ এর দশকে বাংলার মুসলমানরা কিছু শিক্ষিত হবার পর সত্য ঘটনা আবিষ্কৃত হলো। অন্ধকূপের কক্ষে ঠাঁই নিয়েছিলেন এমন একজন সৈনিকের ডায়রী ও বক্তব্য থেকে প্রমাণ মিললো যে, কামরাটি ছিল ১৮ফুট x ১৫ফুট ১০ইঞ্চি সাইজের। যুদ্ধ শেষে সন্ধ্যাবেলায় সুস্থ ও আহত মিলে মাত্র ৩৯ জন ইংরেজ সৈনিককে সেখানে আটক রাখা হয়েছিল। দ্বার রুদ্ধ ছিল না, প্রহরী মোতায়েন ছিল। চিকিৎসার অভাবে রাত্রে মাত্র ১৮ জন সৈনিকের মৃত্যু হয়েছিল। আলীবর্দী খান বাংলার নবাব হন ১৭৪০ সাল। তখন তাঁর বয়স ৬৬ বৎসর এবং সিরাজদ্দৌলা ৪/৫ বছরের শিশু। ৬৬ বৎসরের বৃদ্ধের জন্য হেরেমের প্রয়োজন ছিল না। আলীবর্দী খাঁর হেরেম ছিল তাঁর পরিবার পরিজন নিয়ে গঠিত অন্দর মহল। সেখানে বায়জী বা বারবণিতা হেরেমবালা ছিল না। [সীয়ারুল মুতাখখেরীন, ১ম অধ্যায়, পৃঃ ৫৮-৫৯] সুতরাং সিরাজউদ্দৌলা তাঁর শৈশব ও কৈশোরে লাম্পট্যের ট্রেনিং নেবার মতো, রাজা-মহারাজাদের গড়ে দেওয়া, আর্য সুন্দরী বাইজীদের নিয়ে গঠিত হেরেমের সংস্পর্শ পাননি। তবে রাজা মোহনলালরা তাদের বোন আলোয়াদেরকে দিয়ে তরুণ সিরাজকে সে-পথে প্রলুব্ধ করার চেষ্টায় যে ব্যস্ত ছিলেন একথা বাবু বুদ্ধিজীবীরাই তাদের নাটকে নিজেদের অজ্ঞাতেই ফাঁস করে দিয়েছেন। কিন্তু দেশব্যাপী ষড়যন্ত্রের আবর্তের মধ্যে প্রায়-কিশোর যে সিরাজউদ্দৌলাকে মাত্র ১৪ মাস ১৪ দিনের মধ্যে পূর্ণিয়া থেকে কোলকাতা হয়ে পলাশী পর্যন্ত ১১০০ মাইল পথ চলতে হয়েছে, পাঁচ পাঁচটি রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ করতে হয়েছে, তাকে তো আলেকজান্ডারের চেয়েও দ্রুত গতিতে পথ চলতে হয়েছে। দিন কাটাতে হয়েছে ব্যক্তিগতভাবে যুদ্ধ অশ্বপৃষ্ঠে, রাত কাটাতে হয়েছে, ষড়যন্ত্রের মোকাবিলা করে। নানাজীর উদ্যোগে সেই অল্প বয়সে বিবাহিত সিরাজের তখন আপন স্ত্রী লুৎফা ও শিশু কন্যার প্রতি ফিরে তাকাবারও ফুরসৎ ছিল না। আলেয়া নাম্নী আর্য সুন্দরীদের দিকে মোহাবিষ্ট হয়ে লাম্পট্যলীলায় সময় কাটাবার অবসর তাঁর মিললো

www.nagorikpathagar.org

কিভাবে? তবুও পণ্ডিত ঈশ্বর চন্দ্র বাবুরা বলেছেন, সিরাজউদ্দৌলা ছিলেন উচ্ছৃংখল, দুশ্চরিত্র। [বিদ্যাসাগর, বাংলার ইতিহাস, ১৮৪৮]।

বাবুরা নিজেদের কলঙ্কের বোঝা অন্যের মাথায় চাপিয়ে দেবার জন্য ঠিকই বলেছেন, কিন্তু আমরা নেড়ের বাচ্চারা সঠিক তথ্য উদ্ধারের জন্য ইতিহাসের পাতা কতটা উল্‌টিয়েছি? এখনও তো আমরা বাবু বুদ্ধিজীবীদের লেখা ইতিহাস পড়ছি বা তারই চর্বিত চর্বণ করছি স্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে।

সিরাজ উদ্দৌলার উচ্ছৃংখল চরিত্র দেখাতে গিয়ে স্যার যদুনাথ সরকার বাবু একেবারে জলজ্যান্ত দৃষ্টান্ত পেশ করেছেনঃ লিখেছেন, সিরাজের বাবা পাটনার গর্বনর নিহত হবার পর তরুণ সিরাজ নানার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে পাটনায় ক্ষমতা দখল করেন। আসলে ঘটনাটা কি?

সিরাজের বাবা পাটনার গবর্ণন জয়নুদ্দিন এক রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রের ফলেই ১৭৫০ সালে পাটনায় নিহত হন। তখন সিরাজের বয়স অনধিক ১৫ বৎসর। তার নানা নবাব আলীবর্দী তখন মেদিনীপুরে মারাঠা বর্গী বাবুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত। সে যুগে অয়ারলেস, টেলিফোন, টেলিগ্রাফ ছিল না। পাটনার গবর্ণর জামাতার মৃত্যুর প্রেক্ষিতে মেদিনীপুরে বসে ব্যবস্থা গ্রহণের কোন সুযোগই তাঁর ছিল না। ১৫ বৎসরের কিশোর সিরাজ নবাবের তরফ থেকে নিজেই গবর্ণরের স্থলাভিষিক্ত হয়ে পরিস্থিতি আয়ত্তে আনেন। ১৭৫১ সালে মেদিনীপুর থেকে পাটনায় পৌছে আলীবর্দী নাতীর যোগ্যতায় মুগ্ধ হন। পাটনায় প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণের পর নাতীকে নিয়েই তিনি মুর্শিদাবাদ ফেরেন। তখনই আলীবর্দী উপলব্ধি করেন, একমাত্র সিরাজউদ্দৌলাই হতে পারেন তাঁর যোগ্য উত্তরাধিকারী।

তিনি ঢাকায় নবাবের নৌবাহিনীর প্রধান সেনাপতি পদে সিরাজকে নিযুক্তি দেন।

মৃত্যুর পূর্বে ৬ বৎসর ধরে সে লক্ষ্যেই আলীবর্দী নাতী সিরাজকে কোলের কাছে রেখে যুদ্ধবিদ্যা, অশ্বচালনা ও প্রশাসনিক কাজে প্রশিক্ষণ দান করেন। মৃত্যুর আগেই তিনি সিরাজকে মসনদের উত্তরাধিকারী মনোনীত করে যান। নাতী উচ্ছৃংখল বিদ্রোহী হলে নানা তার প্রতি "স্নেহান্ধ" হলেন কেন? এর তাৎপর্য বাবু বুদ্ধিজীবীরা ছাড়া আর কারও পক্ষে বোঝা অসম্ভব।

www.nagorikpathagar.org

এমন কি, সিরাজউদ্দৌলার মৃত্যু সম্পর্কেও বাবুরা গল্প ফেঁদেছেন। প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে, চরিত্রহীন সিরাজের দুর্ব্যবহারে মুসলমান ফকির দরবেশেরা পর্যন্ত অতিষ্ঠ হয়ে পড়েন। গল্পে বলা হয়েছে, মুর্শিদাবাদ থেকে সিরাজ স্ত্রী লুৎফা ও কন্যাকে নিয়ে পালিয়ে একখানি নৌকাযোগে উজানের পথে রওয়ানা হন। ২৫/৩০ মাইল অতিক্রমের পর ক্ষুৎপিপাসায় কাতর কন্যার কান্না সহ্য করতে না পেরে তিনি নদীতীরবর্তী একগ্রামে ফকির দান শাহের খানকায় খাদ্য সংগ্রহের জন্য হাজির হন। খানকায় তখন ওরস উপলক্ষে কয়েক হাজার লোকের ভোজের তোড়জোড় চলছিল। খাদ্যের আশায় স্ত্রী কন্যাকে নিয়ে সিরাজউদ্দৌলা সেখানে প্রতীক্ষা করতে থাকেন। ইত্যবসরে, একদা সিরাজের হাতে লাঞ্ছিত পানুশাহ লোক পাঠিয়ে মীরণের লোকদেরকে খবর দেন। তারা এসে সিরাজউদ্দৌলাকে সপরিবারে বন্দী করে মুর্শিদাবাদ নিয়ে যায়। গল্প হিসেবে চকৎকার বটে। কিন্তু এর প্রনেতারা একবারও চিন্তা করলেন না যে, লক্ষ-কোটি টাকার সম্পত্তি পিছে ফেলে যে লোকটি স্ত্রী-কন্যা নিয়ে গোপনে পালিয়ে যাচ্ছেন ধরা পড়ে প্রাণে মারা যাবার ভয়ে, যার মনে সতত শংকা এই বুঝি শত্রুপক্ষের লোকেরা তাঁকে চিনে ফেলে বা ধরে ফেলে, তিনি ক্ষুধাতুরা কন্যার খাদ্য সংগ্রহের জন্যে দীর্ঘ নদীপথের পার্শ্ববর্তী কোন নিভৃত পল্লীর কোন বাড়ী খুঁজে পেলেননা সরাসরি মাজারের ওরসে হাজির হলেন এবং হাজার লোকের সামনে খাদ্যের আশায় আসন গেড়ে বসে রইলেন। তাও আবার এক-আধ-ঘন্টা নয়। অন্ততঃ এতোটা দীর্ঘ সময় যাতে ফকির লোক পাঠিয়ে মীরণের মানুষদেরকে ডেকে এনে তাঁকে বন্দী করাতে সক্ষম হলেন। সিরাজউদ্দৌলা যে এতো বড় আহম্মক ছিলেন একথা বাবুবুদ্ধিজীবীরা বুঝাতে চাইলেও কোন বেকুবও বিশ্বাস করবে না। আরো মজার ব্যাপার, সিরাজের জন্মের অনেক আগেই দান শাহ ইন্তেকাল করেন।[অক্ষয় কুমার মৈত্রেয়, সিরাজউদ্দৌলা, পৃঃ ৩৮৬]

www.nagorikpathagar.org

ইতিহাসে জালিয়াতির ফসল বাংলার সন্ন্যাসী বিদ্রোহ

বাংলার "সন্ন্যাসী বিদ্রোহ' ইতিহাসের এক রোমাঞ্চকর কাহিনী। 'সন্ন্যাসী বিদ্রোহ' নামে বর্ণিত ঘটনাবলী বাংলাদেশের মাটিতে কখনো আদৌ ঘটেছে কি–না এ বিষয়ে প্রশ্নের অবকাশ থাকলেও ইতিহাস গ্রন্থের পাতায় 'সন্ন্যাসী বিদ্রোহে'র আবির্ভাব, প্রসার, বিবর্তন ও সর্বশেষে সমুজ্জ্বলভাবে স্থায়ী আসন করে নেবার কাহিনী সত্যিই রোমাঞ্চকর। পলাশীর আমবাগানে যুদ্ধ যুদ্ধ নাটক মঞ্চায়নের ভেতর দিয়ে বাংলায় ইংরেজ শাসন কায়েমের শুরু থেকে ১৮ শতকের সমাপ্তি পর্যন্ত অর্ধ শতাব্দীকাল বাংলায় 'সন্ন্যাসী বিদ্রোহে'র যুগ।

উপমহাদেশে অনার্য বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী মৌর্য যুগের ইতিহাস যেমন বর্ণহিন্দু গুপ্ত যুগের নীচে চাপা পড়ে হারিয়ে গেছে, বাংলাদেশে অনার্য পাল সম্রাটদের ৪ শত বছরের স্বর্ণযুগের কীর্তিরাজি যেমন বর্ণহিন্দু সেন রাজাদের পাদুকাপিষ্ট হয়ে ভূগর্ভে বিলীন হয়ে গেছে, তেমনই সুবে বাংলায় ১৮ ও ১৯ শতকে বৃটিশ বর্ণহিন্দু যৌথ অভিযানে মুসলমানদেরকে সর্বস্বান্ত করার ঘটনাবলীও ইতিহাস থেকে মুছে ফেলা হয়েছে। আর্থ–সামাজিক রাজনৈতিক জীবনে পর্যুদস্ত অশিক্ষার অন্ধকারে হারিয়ে যাওয়া মুসলমানরা নিজেদের সেই আঁধার যুগের ঘটনাবলীর প্রমাণপঞ্জী ধরে রাখতে পারেনি। সেই সুযোগে ইংরেজরা তাদের সর্বমুখী জুলুমকে জাস্টিফাই করার প্রয়োজনে আত্মপক্ষ সমর্থনে যে গ্রন্থাবলী রচনা করেছেন তাকে ভিত্তি করে বাবু বুদ্ধিজীবীরা রচনা করেছেন নিজেদের কল্পিত কীর্তি–কাহিনীর ইতিহাস। সেই ধারায়ই তারা ইংরেজ কর্মচারীদের সংগ্রহ করে দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে বাংলায় 'সন্ন্যাসী বিদ্রোহে'র ইতিহাসও দাঁড় করিয়েছেন। বৃটিশ–বর্ণহিন্দু এ যৌথ কার্যক্রমের মোকাবেলায় বাংলার মুসলমান সমাজ ছিল একেবারে অসহায়। ১৯২০ সাল পর্যন্ত অবিভক্ত বৃহৎ বাংলার ৮৪টি মহকুমায় শ' সাতেক মুসলমান সন্তান মাত্র ছিলেন কলেজ পাশ। ১৯১৫ সালে বাংলার গবর্ণরের শিক্ষা উপদেষ্টা হিসেবে নবাব সৈয়দ শামসুল হুদা কর্তৃক গৃহীত কতিপয় উদ্যোগের ফলশ্রুতিতে এবং ১৯২২ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হওয়ার পরও ১৯২৪ সালে শিক্ষামন্ত্রী মওলবী ফজলুল হকের উদ্যোগে আইন পাসের মাধ্যমে মুসলমানেরা কিছু কিছু শিক্ষার সুযোগ প্রাপ্তির পর ১৯২৮ সালের দ্বিতীয় প্রজাস্বত্ব আইন, ১৯৩০ সালের স্যার নাজিমুদ্দীনের উদ্যোগে মহাজনী বর্ণ নিয়ন্ত্রণ আইন, ১৯৩৩ সালে স্যার আজিজুল

www.nagorikpathagar.org

হকের উদ্যোগে বেংগল মানি লেন্ডার্স এ্যাক্ট ১৯৩৮ সালের ঋণ সালিশী বোর্ড ও প্রজাস্বত্ব আইনের সুযোগ নিয়ে ২০ ও ৩০–এর দশকেই বাংলার সাধারণ মুসলমানেরা শিক্ষার আলো পেতে শুরু করেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে বাবুরা যদিও 'মক্কা বিশ্ববিদ্যালয়' বলে উপহাস করতেন, তবু সেখানেও কয়েকজন ছাড়া ২০, ৩০ ও ৪০–এর দশকে প্রায় সব অধ্যাপকই ছিলেন বর্ণহিন্দু। ইতিহাস ঐতিহ্য নিয়ে আলোচনা, গ্রন্থ রচনা এবং তার ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ দাঁড় করানোর দায়িত্ব ও কর্তৃত্ব ছিল তাঁদের হাতেই। মুসলমান ছাত্ররা কলেজ অবধি শিক্ষা প্রাপ্তির পরই দারিদ্র্যের চাপে সরকারী চাকুরীতে নাম লেখাতো। ১৯৩৯ সালে বাংলার প্রধানমন্ত্রী মওলবী ফজলুল হক কর্তৃক যাবতীয় সরকারী চাকুরীর ক্ষেত্রে মুসলমানদের জন্য শতকরা ৫০টি আসন রিজার্ভ করে দেওয়ার পর এবং ইতিপূর্বে লোকাল বোর্ড, জেলা বোর্ড, পৌরসভা এবং প্রাদেশিক ও ভারতীয় কেন্দ্রীয় আইন পরিষদে মুসলমানদের সংখ্যানুপাতিক আসন নির্ধারিত হয়ে যাওয়ায় নব্য শিক্ষিত মুসলমান তরুণেরা সেসব ক্ষেত্রেই কর্মব্যস্ত থাকেন। বর্ণহিন্দু শিক্ষকদের হাত থেকে পাওয়া প্রায়শঃই তৃতীয় শ্রেণীর উচ্চ ডিগ্রী নিয়ে তারা প্রায় কেউই কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতার অথবা বুদ্ধিজীবী সমাজে আসন লাভের সুযোগও পাননি, চেষ্টাও করেননি। বাবু অধ্যাপকদের রচিত বানোয়াট ও বিকৃত ইতিহাস নির্দ্বিধায় গলধঃকরণ করে পরীক্ষার খাতায় উদগীরণ করলেই কেবল, আনুগত্যের অনুপাতে তখন ১ম বা দ্বিতীয় বিভাগের ফল লাভ করা সম্ভব হতো। ১৯৪৭ সালের ১৪ই আগস্টের পর পূর্ব পাকিসতানের স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্ণহিন্দু শিক্ষক, অধ্যাপকেরা অপশান দিয়ে হিন্দুস্থানে চলে যাবার পরই সেকালের পরিবেশে বেড়ে ওঠা আমরা যারা সিভিলসার্ভিস বা অন্যান্য ভাল চাকুরীতে স্থান করে নিতে অপারগ ছিলাম, তারাই সর্বত্র শিক্ষকতার আসন গুলজার করে বসি। শৈশবে ও কৈশোরে দারিদ্রের মাঝে বেড়ে ওঠা এসব বুদ্ধিজীবীরা কয়েক পুরুষের অনাস্বাদিত ভোগ–বিলাসিতার উপকরণ আহরণে তখন এতই ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলাম যে, নিজেদের ইতিহাস ঐতিহ্য সম্পর্কে চিন্তা–ভাবনা, আলোচনা, গবেষণা করার সময় ও সুযোগ আমরা করে উঠতে পারিনি। বৃটিশ বর্ণহিন্দু বাবুদের লেখা ইতিহাস গ্রন্থের বাক্য ও ক্রিয়াপদ বদল করে আমরা বিশাল কলেবরে স্কুল ও কলেজ পাঠ্য ইতিহাস গ্রন্থ রচনা করে রয়্যালটি উপার্জনের রাস্তা করেছি ঠিকই, কিন্তু বাবুরা বানোয়াট ইতিহাস দিয়ে আমাদের ইতিহাস–ঐতিহ্যকে যেভাবে বিকৃত ও মসিলিপ্ত করেছেন তা সংশোধনের জন্য অপরিহার্য কঠিন পরিশ্রমের পথ আমরা পরিহার করে চলেছি। অল্প কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া প্রায় সকলেই বাবু বুদ্ধিজীবীদের কল্পকাহিনীর চর্বিত চর্বণ

www.nagorikpathagar.org

করেছি। বাংলার 'সন্ন্যাসী বিদ্রোহ' সম্পর্কিত ইতিহাসেও সেই একই ধারাই বহালরয়েছে।

এ পর্যন্ত বর্ণ হিন্দু বাবুদের লেখা চারখানি গ্রন্থে আমরা 'সন্ন্যাসী বিদ্রোহে'র 'পূর্ণাঙ্গ বিবরণ' পেয়েছি। প্রথম গ্রন্থখানি Sannassi and Fakir Raiders in Bengal'-এর রচয়িতা যামিনী মোহন ঘোষ ছিলেন বৃটিশ সরকারের একান্ত অনুগত আমলা। ১৯২১-২৩ সালে উপমহাদেশব্যাপী উত্তাল খেলাফত ও অসহযোগ আন্দোলনের সমাপ্তিপর্বে লিখিত এ বইখানিতে ব্যবহৃত রেফারেন্সগুলো তিনি লাভ করেন তাঁর "পরম কৃতজ্ঞতাভাজন" ইংরেজ আই, সি, এস, Mr. Cassel এর কাছ থেকে [The Sannassi and Fakir Raiders in Bengal, ভূমিকা দ্রষ্টব্য]। বৃটিশ সরকারের কোলকাতাস্থ সচিবালয় রাইটার্স বিল্ডিংয়ের রেকর্ড রুমে রক্ষিত ১৮ শতকের শেষভাগে ইংরেজ কর্মচারীদের লিখিত চিঠি-পত্রাদি থেকে বাছাই করা এই রেফারেন্সগুলো সংগ্রহ করিয়ে তিনি যামিনী বাবুকে সরবরাহ করেন। যামিনী বাবু সেই তথ্যাবলী তার গ্রন্থে ব্যবহার করে প্রমাণের চেষ্টা করেন যে, ১৭৫৭ সালের পর "সদাশয়" ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী কর্তৃপক্ষ বাংলার প্রজাসাধারণের কল্যাণে নিবেদিত হয়ে যখন সারাদেশে শান্তি প্রতিষ্ঠায় ব্যস্ত, তখন মধ্য ভারত থেকে আগত মজনু শাহের নেতৃত্বে পরিচালিত ফকির নামধারী ডাকাতেরা এবং নাগা সন্ন্যাসীরা দস্যুবৃত্তি ও লুটতরাজ চালিয়ে বাংলার জনজীবনকে দুর্বিসহ করে তোলে। প্রভুভক্ত কর্মচারী যামিনী বাবু এ বইতে তৎকালীন ইংরেজ কোম্পানী সরকারের যে সাফাই গেয়েছেন তাতে তাঁর চাকুরীতে পদোন্নতি এবং রায় সাহেব খেতাব মিলেছিল। সুতরাং ইংরেজ আই সি এস আফিসারের সরবরাহকৃত তথ্যের ভিত্তিতে ইংরেজ কোম্পানী সরকারের সাফাই গেয়ে রচিত প্রভুভক্ত কর্মচারীর লেখা এ বই যে কতখানি সত্যনিষ্ঠ হতে পারে তা সহজেইঅনুমেয়।

দ্বিতীয় গ্রন্থখানি 'বাংলার সন্ন্যাসী ও ফকির বিদ্রোহ'এর রচয়িতা ডক্টর উপেন্দ্রনাথ দত্ত এম এ, পি এইচ ডি। কলকাতার বিখ্যাত দৈনিক পত্রিকা "যুগান্তর" এর ত্রিশের দশকের মালিক ও সম্পাদক, (পলাশী যুদ্ধোত্তর আযাদী সংগ্রামের পাদপীঠ, হায়দার আলী চৌধুরী পৃঃ ৪) স্বামী বিবেকানন্দের কনিষ্ঠ ভ্রাতা উপেন্দ্রনাথ দত্ত বাবু ছিলেন মুসলিম বিদ্বেষী যুগান্তর সন্ত্রাসবাদী দলের অন্যতম সংগঠক এবং হিন্দু জাতীয়তাবাদী পুনর্জাগরণের অন্যতম পুরোধা। বাংলা ও ভারতের যাবতীয় ঐতিহাসিক ঘটনাবলীকে দরকার মতো ঢালাই

www.nagorikpathagar.org

করে হিন্দু জাতীয়তাবাদ উজ্জীবনের উৎসরূপে উপস্থাপন করাই ছিল তাঁর সাধনা। যামিনী বাবুর পরিবেশিত রেফারেন্সগুলিকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে পরিবেশন করে তাতে কল্পনার রং তুলির আঁচড় লাগিয়ে তিনি দেখাতে চেয়েছেন যে, ইংরেজরা যাদেরকে সন্ন্যাসী ও ফকির দস্যুদল বলে অভিহিত করেছে তারা ছিল আসলে এ দেশের দেশপ্রেমিক জাতীয়তাবাদী দৃষ্টিভঙ্গির অধিকারী বিদ্রোহী বাহিনী। কোম্পানী শাসনের প্রথম তিন দশক ধরে তারা সশস্ত্র প্রতিরোধ আন্দোলন করেছেন। এ আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছেন নাগা সন্ন্যাসীরা। ফকিরেরাও তাদের সাথে ছিলেন।

তৃতীয় গ্রন্থ 'ভারতের কৃষক বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম'–এর লেখক প্রখ্যাত মার্কসবাদী বুদ্ধিজীবী মিঃ সুপ্রকাশ রায়। মার্কসবাদী বুদ্ধিজীবীদের একটি বহুঅনুসৃত মূলনীতি হচ্ছে, থিওরীর সাথে ঘটনা যদি কোথাও না মেলে, থিওরীকে নির্ভুল ধরে নিয়ে ঘটনাকে একটু ঘুরিয়ে ফিরিয়ে সাজিয়ে নিঁতে হবে–সুপ্রকাশ বাবুও সে–নীতি অনুসরণ করে যামিনী বাবু ও দত্ত বাবুর রেফারেন্সের ভিত্তির সাথে সংশ্লিষ্ট যুগের বিপর্যস্ত অর্থনৈতিক অবস্থার ব্যখ্যা মিলিয়ে দেখাতে প্রয়াস পেয়েছেন যে, ১৮ শতকের শেষার্ধের বাংলাদেশে ইংরেজ–বিরোধী আন্দোলন ও যুদ্ধ–বিগ্রহগুলো ছিল শোষিত–নির্যাতিত কৃষক, কারিগর, মজুর, শ্রমিকদের বিদ্রোহ। শুরু থেকেই সন্ন্যাসীরাই এ বিদ্রোহে নেতৃত্ব দিতে থাকেন। মজনু শাহের নেতৃত্বে একদল মুসলমান ফকিরও তাদের সহযোগী ছিলেন।

আমাদের হাতে পাওয়া এ বিষয়ক সর্বশেষ লিখিত গ্রন্থটি "The Sannyasi Rebellion" লিখেছেন মিঃ এ, এন, চন্দ্র। মিঃ এ, এন, চন্দ্রের ইতিহাস রচনার একটি সুখ্যাতি আছে। কল্পকাহিনীর সমাহার, মহাকাব্য মহাভারতের ঘটনাবলীকে তিনি প্রায় প্রত্যক্ষদর্শীর সাক্ষ্যরূপে দাঁড় করিয়ে হিন্দু সমাজের প্রশংসা কুড়িয়েছেন। [The Sannyasi Rebellion, গ্রন্থকার পরিচিতি দ্রষ্টব্য]। এক্ষেত্রেও বইয়ের নামকরণেই তিনি ফকিরদের উল্লেখনা বাদ দিয়েছেন এবং বই–এর আলোচনায় প্রমাণের প্রয়াস পেয়েছেন যে, সেকালে মানবপ্রেমিক নাগা সন্ন্যাসীরা বাংলার নির্যাতিত প্রজাসাধারণকে রক্ষার জন্যে ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে সশস্ত্র যুদ্ধ পরিচালনা করেছেন। মধ্য ভারত থেকে আগত ফকিরেরা বাংলার প্রজাসাধারণের উপর লুটতরাজ চালিয়েছে। এ কারণে ফকিরদের বিরুদ্ধেও তারা যুদ্ধ করেছে। বই–এর বিভিন্ন অধ্যায়ে একই কুমীরের বাচ্চা বার বার দেখিয়ে তিনি এমন একটি পরিমন্ডল সৃষ্টি করেছেন

www.nagorikpathagar.org

যে, মনে হয় সেকালে বাংলার সর্বত্রই ঝাঁকে ঝাঁকে কেবল সন্ন্যাসীরাই ঘুরে বেড়াচ্ছিল।

'সন্ন্যাসী বিদ্রোহকালীন ঘটনাবলীর ঐতিহাসিক দলিল হিসেবে যে তথ্য-সূত্র পাওয়া যায় তার মধ্যে গোলাম হোসেন রচিত সীয়ারুল মুতাখখেরীন গ্রন্থের Mr. Raymond কর্তৃক হাজী মুস্তফা ছদ্মনামে কৃত বিকৃত অনুবাদ, মোহাম্মদ হোসেন ফাহমী লিখিত 'দাবিস্তান'-এর জি,এইচ, খানকৃত ইংরেজী অনুবাদ ও জি, এইচ, খানের "ক্যালেন্ডার অব পার্সীয়ান করেসপন্ডেস" এই তিনখানি গ্রন্থের বরাত দিয়েছেন বৃটিশ পন্ডিত ও বাবু বুদ্ধিজীবীরা সবাই। এ গ্রন্থগুলিতে ১৮ শতকের এ উপমহাদেশের আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক, ধর্মীয় কর্মকান্ড ও ভাবধারার বর্ণনা রয়েছে। দুষ্প্রাপ্য বা নিখোঁজ এই দাবিস্তান গ্রন্থখানির উপর আলোচনা করেছেন ইংরেজ পন্ডিত মিঃ ট্রয়ার [এ, এন, চন্দ্র, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৬] । আর তাঁর তফসীরকে তর্কাতীতভাবে গ্রহণ করে নিয়েছেন বাবু বুদ্ধিজীবীরা। কিন্তু তারা কেউ-ই এ বই থেকে সন্ন্যাসীদের বিদ্রোহ সম্পর্কে সরাসরি কোন তথ্য পেশ করতে পারেননি। সিয়ারুল মুতাখখেরিনের লেখক ছিলেন নবাব মীর জাফরের ছায়াসঙ্গী সৈয়দ গোলাম হোসেন। তার পিতা সৈয়দ হেদায়েত আলী বাদশাহ দ্বিতীয় আলমগীর ও দ্বিতীয় শাহ আলমের বিশ্বস্ত পদস্থ কর্মচারী হওয়া সত্ত্বেও তিনি আলীবর্দী খাঁ, মীর জাফর ও ইংরেজদের পক্ষাবলম্বী হয়েছিলেন নিছক ব্যক্তিস্বার্থ হাসিলের প্রয়োজনে। আলীবর্দীর মৃত্যুর পর তিনি প্রথমে সিরাজউদ্দৌলার ও পরে মীর জাফরের সংগী হন। মীর কাসেম নবাব হলে তিনি মীর জাফরকে ত্যাগ করে মীর কাসেমের পক্ষে যান। মীর কাসেমের দূত হিসেবে ইংরেজ শিবিরে গিয়ে তিনি মীর কাসেমের সকল গোপন তথ্য ফাঁস করে দেন। মীর কাসেমের পরাজয়ের পর পুনরায় মীর জাফর ও ইংরেজ মহলের খয়ের খাঁ হিসেবে কাজ করেন এবং মীর জাফরের বংশধরদের সাথে সুসম্পর্ক রেখে ও ইংরেজদের অনুগত থেকে ১৭৮১ সালে সিয়ারুল মুতাখখেরীন গ্রন্থ সমাপ্ত করেন। স্বভাবতই তাঁর এ গ্রন্থে ইংরেজ পক্ষীয় সকল মহলের সুন্দর সাফাই গাওয়া হয়।

আর এ কারণেই ইংরেজরা উৎসাহের সাথে এর একাংশ অনুবাদ করান Mr. Raymond কে দিয়ে এবং অপরাংশ কোন এক জি এইচ খানকে দিয়ে। মি, রেমন্ড অনুবাদক হিসেবে নিজের নাম হাজী মুস্তাফা বলে প্রকাশ করেন মুসলমানদেরকে বিভ্রান্ত করার উদ্দেশ্যে [মোহর আলী, History of Muslims of Bengal, P-৬২০]। ইংরেজের মনোনীত গ্রন্থ 'দাবিস্তান'

www.nagorikpathagar.org

গ্রন্থের অনুবাদক সেকালে জি,এইচ, খান নামক ইংরেজের বিশ্বস্ত ব্যক্তিটি ইংরেজদেরকে আরো বেশী খুশী করার জন্য রচনা করেছিলেন 'ক্যালেন্ডার অব পার্সীয়ান করেসপন্ডেস'। সুতরাং এ বই দু'টিতেও ইংরেজদের মুসলিম বিরোধী কলঙ্কময় কীর্তিরাজি খুঁজে পাওয়ার আশা করা বাতুলতা মাত্র। এর বাইরে তৎকালীন ঘটনাবলী সম্পর্কে যেসব তথ্য পাওয়া গেছে তার সবগুলোর উৎস ইংরেজ জেলা কালেক্টর, ইংরেজ রেভিন্যু সুপারভাইজার, বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে সামরিক প্রতিরোধের মোকাবেলায় যুদ্ধরত ইংরেজ কর্ণেল, ক্যাপ্টেন ও অন্যান্য অফিসারদের রিপোর্ট ও চিঠিপত্র। মুর্শিদাবাদস্থ রেভিন্যু কাউন্সিল ও কলকাতাস্থ গভর্ণরের কাউন্সিলের কাছে তাদের দেওয়া রিপোর্ট এবং সেসব রিপোর্টের জবাবে প্রাপ্ত নির্দেশাবলী। ওয়ারেন হেষ্টিংস নিজে কোম্পানী সরকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত ও চোরাগোপ্তা হামলাকারীদেরকে বর্ণনা করেছেন 'Nomadic marauders' যাযাবর দস্যুদল রূপে [সন্ন্যাসী রিবেলিয়ন, চন্দ্র, পৃঃ১০,১২]।

ইংরেজ সুপারভাইজারেরা তাদেরকে উল্লেখ করেছেন কখনো ফকির কখনো সন্ন্যাসীরূপে; কখনো চিঠিতে দু'টি শব্দ ব্যবহার করেছেন ভিন্ন ভিন্ন অর্থে, আবার কখনোবা একই অর্থে। সে সময়ে সুমলমান ফকির এবং হিন্দু সন্ন্যাসীদের ভিন্নধর্মী ভূমিকা তাঁদের প্রদত্ত রিপোর্ট ও চিঠি পত্র ভিন্ন ভিন্ন অর্থেই পরিবেশিত হযেছে [চন্দ্র, ঐ, পৃঃ ১৬]। তারা রাষ্ট্রভাষা ফার্সীর সাথে সুপরিচিত ছিলেন, বাংলাভাষা বুঝে নিতেন বর্ণহিন্দু দোষাভীর দ্বারা। ফার্সী 'ফকির' আর বাংলা 'সন্ন্যাসী' তাদের কারো কারো কাছে ক্ষেত্রবিশেষে কোন কোন সময় একার্থবোধকও ছিল। তাঁরা অনেকে শব্দ দু'টির ব্যবধান বুঝতেন না [চন্দ্র, ঐ, পৃঃ ৩৩]। তাই তারা একই অর্থে দু'টি শব্দ ব্যবহার করেছেন। ইংরেজ অফিসারদের বর্ণনা থেকে ঐতিহাসিক সূত্র সংগ্রহ করে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর আনন্দমঠ উপন্যাস রচনা করেন। বঙ্কিম চন্দ্র ছিলেন হিন্দু পুনর্জাগরণের অকপট প্রবক্তা এবং ইংরেজের অনুগত আমলা। তাই তৎকালীন সন্ন্যাসীদের কর্মকান্ডকে সঠিকভাবে তিনি মুসলিম বিরোধী ও ইংরেজ সমর্থকরূপেই সরাসরি চিত্রিত করেছেন। কিন্তু পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে ইংরেজের অনুগত আমলা রায়সাহেব যামিনী মোহন ঘোষ তার 'Sannasi and Fakir Raiders in Bengal' গ্রন্থে ফকির ও সন্ন্যাসীদেরকে একই কর্মকান্ডের শরীক করে বর্ণনা করেছেন। ইংরেজরা যে বিদ্রোহাত্মক কর্মকান্ডকে সারা বাংলাব্যাপী মজনুশাহের নেতৃত্বে চালিত ফকির ও সন্ন্যাসীদের লুন্ঠন বলে উল্লেখ করেছেন, ফকিরদের বিরুদ্ধে কর্মরত এবং কোন কোন ক্ষেত্রে তাঁদের বিরুদ্ধে

www.nagorikpathagar.org

যুদ্ধরত সন্ন্যাসীদেরকেও তিনি সেই ফকিরদের কাতারে শামিল করে দিয়েছেন। ইংরেজদের চিঠি–পত্রে খোলাখুলিভাবেই বলা হযেছে যে, মজনু ফকিরের অনুসারী সৈন্যসংখ্যা প্রায় প্রতি যুদ্ধেই পাঁচ/দশ হাজারের অধিক এবং কোন কোন যুদ্ধে ৫০ হাজার পর্যন্ত [ঢাকার কালেক্টরের ২৯শে জুন, ১৭৭৩ এর চিঠি, রাজশাহী কালেক্টরের ১৮ ডিসেম্বর, ১৭৭৩ এর চিঠি, ক্যাপ্টেন রেনেলের চিঠি, ৩০ অক্টোবর, ১৭৫৬ ইত্যাদি বহুসংখ্যক চিঠি দ্রষ্টব্য] ছিল। সেক্ষেত্রে কোন বর্ণনাতেই সন্ন্যাসীদের এরূপ সংখ্যার উল্লেখ নেই। তবু যামিনী বাবু, উপেন্দ্রনাথ বাবু, সুপ্রকাশ বাবু নিজেদের বর্ণনা পেশের সময়ে "সন্ন্যাসী ও ফকির" লিখেছেন, লিখে সন্ন্যাসীদের অগ্রাধিকার ও বর্ধিত গুরুত্ব দিয়েছেন; কোথাও ভুল করেও "ফকির ও সন্ন্যাসী" লিখেননি। মিঃ এ, এন, চন্দ্র বাবু আরো একধাপ অগ্রসর হযে ফকির শব্দটা ঝেড়ে ফেলে দিয়ে সোজাসুজি সে বিদ্রোহের নাম দিয়েছেন "সন্ন্যাসী বিদ্রোহ"। কিন্তু উপরোক্ত দলিল দস্তাবেজগুলোতে সর্বত্রই ফকির মজনু শাহের নাম উল্লেখ থাকায় বইয়ের অভ্যন্তরে মজনু শাহের কর্মকান্ডকেও স্থান দিতে বাধ্য হয়েছেন। তবে ফকির বিদ্রোহীদের কর্মকান্ডের স্বপক্ষে চিঠিপত্রের বরাত দিয়ে অকাট্য দলিল পেশ করেই পরক্ষণে বিনা দলিলে গেয়ে গেছেন যে, 'সন্ন্যাসী'দের ভূমিকাও অনুরূপ ছিল। এই 'অনুরূপ"–এর কোন প্রমাণ পেশ করার পরেয়োজন মনে করেননি তিনি। [শাহ শূজার নিকট থেকে বুরহানা ফকিরের সনদ প্রাপ্তির প্রসংগ দ্রষ্টব্য,

লেখকদের সবাই একই সূত্রে লব্ধ দলিল–দস্তাবেজের বরাত দিয়েছেন। কিন্তু যেহেতু সেগুলোর পূর্ণাঙ্গ বর্ণনা পেশ করেননি। তাই আপন আপন বক্তব্যের স্বপক্ষে যুক্তি দাঁড় করাবার জন্য কে কতটুকু গ্রহণ বা বর্জন করেছেন, কোন্ অংশ গুরুত্বসহকারে তুলে ধরেছেন, আর কোন্ অংশ সাবধানে এড়িয়ে গেছেন, বইগুলো পড়ে তা বোঝা যায় না।

ভূ–সম্পত্তির দলিল জালিয়াতির একটা প্রচলিত পন্থা আছে। গত দু' দশক ধরে ঢাকায় ভূ–সম্পত্তির ক্রয়–বিক্রয়ে এ পন্থাটি অনুসৃত হয়ে আসছে। এতে এক জালিয়াত সাজানো–দাতা সনাক্তকারী ও সাক্ষী দাঁড় করিয়ে সম্পত্তিটির নিখুঁত জাল দলিল কোন এক কল্পিত ক্রেতার নামে রেজিষ্ট্রি করে নেয়। ৬ মাস পরে সেই রেজিষ্ট্রি দলিলকে বায়া দলিল হিসেবে পেশ করে ভুয়া দাতা, সনাক্তকারী ও সাক্ষী দিয়ে একই পন্থায় অন্য এক কল্পিত ব্যক্তির নামে সেই সম্পত্তি কবলা দলিল করে দেয়। অতঃপর কিছুদিন পরে এই দ্বিতীয় ভুয়া গ্রহীতার বায়া দলিল মূলে ঐ সম্পত্তি মূল জালিয়াত নিজের নামে রেজিষ্ট্রি করে

www.nagorikpathagar.org

নেয়। এরপর সে নিজেকে নিষ্কণ্টক সম্পত্তির মালিক ঘোষণা করে তা অন্যের কাছে বিক্রির প্রস্তাব দেয়। এবারের আসল গ্রহীতা দেখতে পায় বিক্রির বায়া দলিলেরও বায়া দিলল রয়েছে। সুতরাং তার সম্পত্তি আইনতঃ নিষ্কণ্টক। কিন্তু মূল বায়া দলিলই যে বানোয়াট সর্বশেষ গ্রহীতা তা আর খুঁজে দেখেন না। এভাবে ৫/১০ বছরের মধ্যে সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির মূল মালিক মারা গেলে দেখা যায়, বাস্তবে মূল মালিকের উত্তরধিকারী হয়ত জমির উপর বসবাস করছে ঠিকই, কিন্তু দলিল-দস্তাবেজমূলে সম্পত্তির মালিক অন্য ব্যক্তি। জাল দলিলের বরকতে বাস্তবতাই বিলুপ্ত হয়ে গেছে। উপমহাদেশের বাবু বুদ্ধিজীবীরা এ ধারায়ই কুতুবমিনার, বাবর মসজিদ, এমনকি তাজমহলেরও মালিকানা আত্মসাত করে বসেছেন। এগুলো যে মুসলমান সুলতান ও বাদশাহদের নির্মিত তার ভূরি ভূরি প্রমাণ ইতিহাসে রয়েছে। তাজমহল নির্মাণের ঘটনাটি তো মাত্র সেদিনের। তখন শাহজাহানের দরবারে নানান দেশের, এমনকি ইউরোপের ওলন্দাজ, পর্তুগীজ, ফরাসী ও ইংরেজ বাণিজ্য কোম্পানীগুলোর প্রতিনিধিরাও হাজির থাকতেন। সবার সামনেই বিশবছর ধরে লাগাতার পরিশ্রমে তাজমহল নির্মিতহয়। অথচ বাবু বুদ্ধিজীবীরা বানোয়াট দলিল মূলে প্রমাণ করে ফেলেছেন যে, কুতুবমিনার মুসলমানেরা ভারতে আসার আগেই হিন্দু রাজাদের নির্মিত, বাবুর মসজিদের তলদেশের জমিনে কল্পিত মহাকাব্য রামায়ণের নায়ক রাম জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং তাজমহল শাহজাহানের নয়। এক রাজপুত সামন্তরাজের অবিস্মরণীয় কীর্তি; সম্রাট শাহজাহান তা জবর দখল করে নিয়েছিলেন। এরূপ জাল বায়া দলিলের একটি গাঁজাখোরী গল্পের নমুনা পেশ করছি। "এমনকি মোগলশাহীর গৌরবোজ্জ্বল যুগেও নিজেকে---- বলে দাবীকারিণী কোন এক নারীর নেতৃত্বাধীন একটি সন্ন্যাসী বাহিনী আওরঙ্গজেবের বাহিনীকে পরাজিত করে এবং তার ভয়ে আলমগীর ময়ুর সিংহাসনের উপর বসে থর থর করে কাঁপতেন। একথা জেমস গ্রান্টের রেকর্ড থেকে জানা যায়" [চন্দ্র, ঐ, পৃঃ ২২]। উপমহাদেশের বাবু বৃদ্ধিজীবীরা এই পন্থাই অনুসরণ করেছেন। গুটিকয়েক বিক্ষিপ্ত তথ্য ও দলিল-দস্তাবেজকে ভিত্তি করে প্রথম লেখক কল্পনায় ঐতিহাসিক কাহিনী রচনা করেন। এ কাহিনীতে তিনি প্রয়োজন মতো 'যদি' 'কিন্তু' 'না-কি' 'সম্ভবত' 'মনে হয়' 'হয়ত বা' 'বোধ হয়' 'এরূপ বিশ্বাস করা হয়' -ইত্যাদি শব্দের ছড়াছড়ি ঘটিয়ে কাহিনীর বুনট মজবুত করেন। অথচ ইতিহাস প্রণয়নে এই জাতীয় না-কি ফাঁকির কোন জায়গা থাকতে পারে না। পরবর্তী লেখক এসে এই না কি ফাঁকির বস্তাকেই বরাত দিয়ে তার কাহিনী দাঁড় করান। তার বক্তব্যকে রেফারেন্সরূপে বর্ণনা করেন তার উত্তরসূরী লেখক। এভাবে পূর্বমুখী বক্তব্যকে লেখক পরম্পরায়

www.nagorikpathagar.org

কিছুটা বাঁকাতে বাঁকাতে তিন/চার জন লেখকের হাত বদল হবার পর সম্পূর্ণ পশ্চিমমুখী করে তুলে ধরা হয়। তখন শেষ বক্তব্যের সারা গায়েই থাকে Reference এর গিঁঠ। তাকে চ্যালেঞ্জ করার ক্ষমতা সাধারণ পাঠকের থাকে না। ফলে নির্ভেজাল মিথ্যা অকাট্য সত্যের রূপ লাভ করে।

'সন্যাসী বিদ্রোহের' বেলাতেও ঠিক এমনটিই হয়েছে। বরাতের বস্তা খুললে সবাই যা পেয়েছেন আমরাও তাই পাবো। কিন্তু ঘটনাবলীর ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে ব্যাপার অন্যরকম। সুবে বাংলায় তখন মুসলমান নবাবের স্বাধীন শাসন ব্যবস্থা চালু থাকলেও আসলে সেটা ছিল হিন্দু রাজা-মহারাজাদের সাথে মুসলমান নবাবদের পার্টনারশীপ প্রশাসনের যুগ। বাংলার মোট এলাকার প্রায় অর্ধেক ৬১৫টি পরগনা ছিল ১৫টি জমিদারীর অন্তর্ভুক্ত। এসব জমিদারীর মালিক ছিলেন মহারাজ মানসিংহের নেতৃত্বে ও পরবর্তীকালে আগত রাজা-মহারাজা খেতাবধারী রাজপুত ও পশ্চিমা 'কুলীন' বর্ণহিন্দু বাবুরা। বাংলার মোট রাজস্বের প্রায় অর্ধেক ৬৫ লক্ষ টাকা আসতো তাদের কাছ থেকে। এ ১৫টির বাইরেও বহু ছোট-খাটো জমিদারী, তালুকদারী তাদের আত্মীয়-স্বজনদের হাতে ছিল। উচ্চ রাজপদে নিযুক্তির বিনিময়ে প্রাপ্ত জায়গীরও তাঁরা অনেকে ভোগ করতেন। সাকুল্যে বাংলার মোট রাজস্বের অন্ততঃ ৬৫% ভাগ নিয়ন্ত্রণ করতেন তাঁরা। স্বাভাবিকভাবেই নবাবের দরবারে তাঁদের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাব ছিল অপ্রতিরোধ্য। প্রশাসনে প্রধানমন্ত্রী, নায়েব-নাজিম ও দেওয়ানের মতো উচ্চপদে এবং সেনাবাহিনীতে উপ-প্রধান সেনাপতিসহ বহুসংখ্যক সেনাপতি, ফৌজদার, মনসবদারের পদ ছিল তাদের হাতে। তাদের হাতে ঋণের রজ্জুতে বেঁধে রাখা মোগলাই আমীর-ওমরাহদেরকে সূরা ও নারীর লাম্পট্যলীলায় নিমগ্ন রেখে তারা বাংলার, বলা চলে, বারো আনা ক্ষমতাই নিয়ন্ত্রণ করতেন। দেশের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমান ও দ্বিতীয় বৃহৎ সমপ্রদায় অনার্য্য বাংগালী হিন্দু (শূদ্রসহ অন্যান্য তফশিলীরা) ক্ষমতার ভাগাভাগিতে অংশীদার ছিলেন না। তারা ছিলেন কৃষক-কারিগর, বণিক-সওদাগরের পেশায় নিয়োজিত সুশিক্ষিত দক্ষ জনশক্তি। তাদের উৎপাদিত পণ্যসম্ভার উপমহাদেশের নানা অঞ্চল ছাড়াও দূরপ্রাচ্য, মধ্যপ্রাচ্য ও ইউরোপের কাড়াকাড়ির বস্তুতে পরিণত হয়েছিল। এ কারণেই সাত সমুদ্র পারের ওলন্দাজ, পর্তুগীজ, ফরাসী, ইংরেজ বণিকদের শত শত বাণিজ্যতরী বাংলার নদীতে নদীতে, গঞ্জে-মোকামে ঘোরাফেরা করতো। কর্মতৎপর সেই বাংগালী মুসলমান ও বাংগালী হিন্দুদের জীবন ছিল স্বাচ্ছন্দ্যে সুন্দর ও আনন্দে উচ্চকিত। কিন্তু জনসাধারণের কাছ থকে উৎপন্ন ফসলের

www.nagorikpathagar.org

অর্ধেক পরিমাণ খাজনা এবং শিল্পজাতপণ্য ও বাণিজ্যে বিপুল পরিমাণ শুল্ক আদায় করে মোগলোত্তর যুগের মোগলাই মুসলমানদের সাথে ক্ষমতা ও ভোগ বিলাসিতায় দশ আনা আন্দাজ শরীক হয়েও পশ্চিমা "কুলীন" বর্ণহিন্দু রাজা-মহারাজারা সন্তুষ্ট থাকতে পারেন নাই। 'নীচু জাতের' (ধমনীতে রাজপুত রক্তবর্জিত) যবন মুসলমান ও অস্পৃশ্য (অনার্যহেতু) শূদ্রাদি সম্প্রদায়ের সব স্বাচ্ছন্দ্যের ফায়দা একারা লুটবার লক্ষ্যে তারা মোগলাই মুসলমানদের হাত থেকে ষোলআনা শাসন ক্ষমতা দখলের কর্মসূচী গ্রহণ করেন। এ কর্মসূচী বাস্তবায়নের জন্যে তারা ইংরেজদের "আপাতঃ পর্যায়ে" সর্বমুখী সহযোগিতা দিয়ে ডেকে আনেন। কিন্তু অদৃষ্টের পরিহাস, গোলামদেরকে গোলামের আসনে বসিয়ে ইংরেজরাই শাসকের আসন অধিকার করে নেন। ইঙ্গ-বর্ণহিন্দু যৌথ প্রয়াসে মোগলাই মুসলমান এবং বাংগালী 'যবন' মুসলমান ও 'অস্পৃশ্য' অনার্য্য হিন্দুর সর্বস্ব অপহরণের সংঘাত-সংঘর্ষ, যুদ্ধ বিগ্রহের ইতিহাসই সুবে বাংলার আঠারো শতকের শেষার্ধের ইতিহাস। ইতিহাসের এই অধ্যায়ে ইংরেজ কোম্পনী ও এদেশীয় "কুলীন" রাজা-মহারাজাদের উপর প্রতিরোধ সংগ্রামের অংশ হিসেবে দেশপ্রেমিক বিভিন্ন মহল থেকে যেসব হামলা এসেছে তাতে মুসলমান ফকির, দরবেশ এবং বাংগালী সন্ন্যাসীরাও অংশগ্রহণ করেন। ইংরেজরা তাদের চিঠিপত্রে এসব দেশপ্রেমিক মুক্তিযোদ্ধাদেরকে 'ফকির-সন্ন্যাসী' নামে লুটতরাজকারী বলেছেন। কিন্তু যেহেতু জাতীয় ইতিহাসে বিরাট অধ্যায় জুড়ে আছে এসব যুদ্ধ-বিগ্রহ, তাই পরবর্তীকালে কেউ চেয়েছেন তাকে জাতীয়তাবাদী রূপ দিতে, কেউ চেয়েছেন শ্রেণীসংগ্রাম বলে চিত্রিত করতে।

এই প্রেক্ষিতে বাবুদের লেখা সর্বশেষ দুইখানি গ্রন্থ "দি সন্ন্যাসী রিবেলিয়ন" এবং "ভারতের কৃষক বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রামে" তাদের দাঁড় করানো ইতিহাসকে আমরা পর্যালোচনা করে দেখতে পারি।

এ, এন, চন্দ্র বাবুর "দি সন্ন্যাসী রিবেলিয়ন" গ্রন্থে আমরা পাই যে, ইংরেজদের চিঠিপত্রে তারা "নোম্যডিক ম্যারোডার্স" ও "মেডিক্যান্টস" শব্দদ্বয়ের অর্থের সাথে ফকির ও সন্ন্যাসী শব্দ দু'টিকে কখনো ভিন্ন অর্থে আবার কখনো একার্থকভাবে ব্যবহার করেছে-এই অজুহাতে ইংরেজদের চিঠির রেফারেন্সে লিখিত নিজের বাক্যগুলোকে চন্দ্র বাবু, যেসব ক্ষেত্রে সরাসরি মজনু শাহের বা তার দলের নাম উল্লেখ করা হয়েছে সেসব ক্ষেত্র ছাড়া, সর্বত্রই পাইকারীভাবে সন্ন্যাসী শব্দ ব্যবহার করেছেন। তাতে পাঠকের মনে ধারণা জন্মে যে, সর্বত্রই কেবল সন্ন্যাসীরাই ছিল এ বিদ্রোহের প্রধান শক্তি।

www.nagorikpathagar.org

অথচ ঘটনাতো একেবারেই অন্যরূপ। নাগা সন্ন্যাসীরা ছিল সমসাময়িককালে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত রাজপুত শক্তির ভাড়াটিয়া বাহিনী। জয়পুরের মহারাজার বাহিনীতেই কর্মরত ছিল ১০ হাজার নাগা সন্ন্যাসী (চন্দ্র, ঐ, পৃঃ ২১)

মারাঠা বর্গীরা বাংলার প্রধান প্রধান রাজা–মহারাজা, জমিদারদের কারো বাড়ী লুট করেছে এমন কোন প্রমাণ নেই–কিন্তু তারা সুবে বাংলায় লুণ্ঠন অভিযান চালিয়েছে। তবে কি সেটা চলেছিল মুসলমান ও শূদ্র বিত্তশালী প্রজাসাধারণের উপর? মারাঠী ব্রাহ্মণ ভাস্কর পন্ডিতের বর্গী বাহিনীও গঠিত ছিল ভাড়াটিয়া নাগা সন্ন্যাসীদের নিয়ে (চন্দ্র, ঐ, পৃঃ ৫৭)। ১৭৬৫ সালে কোচবিহার রাজ পরিবারে উত্তরাধিকারিত্বের প্রশ্নে দাবীদারদের মধ্যে সংঘটিত যুদ্ধে উভয়পক্ষেই ভাড়াটিয়া সৈন্য হিসাবে অংশ নেয় নাগা সন্ন্যাসীরা (চন্দ্র,ঐ, পৃঃ ৪৬)। ১৭৬৭ সালে হালপুরের হাটওয়ার হিন্দু জমিদার নাগা সন্ন্যাসীদের ভাড়া করেন (চন্দ্র, ঐ, পৃঃ ৪৭)। বগুড়া শহর থেকে কয়েক মাইল দূরে চম্পাপুরে "ফকিরকাটা খালের" তীরবর্তী প্রান্তরে "সুসজ্জিত অশ্বে আরোহিত উন্নত অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত একদল দীর্ঘকায় (নাগা!) সন্ন্যাসী মজনুপন্থী ফকিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে বহুসংখ্যক ফকিরকে হত্যা করে" (চন্দ্র, ঐ, পৃঃ ৯০)। এ, এন, চন্দ্র বাবু ইংরেজ কর্মচারীদের লিখিত চিঠির ভিত্তিতে দাবী করেছেন যে, সন্ন্যাসীরা দু'টি এলাকায় ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছেন। প্রথমটি ১৭৭৩ সালের জানুয়ারী মাসে রংপুরের শ্যামগঞ্জে ক্যাপ্টেন থমাসের বাহিনীর বিরুদ্ধে এবং দ্বিতীয়টিও ১৭৭৩ সালের ১লা মার্চ রংপুরের বড়রাজু পরগনায় ক্যাপ্টেন এডওয়ার্ডসের সৈন্যদের মোকাবিলায়; উভয়যুদ্ধেই সন্ন্যাসীরাই জয়ী হয়। এ সন্ন্যাসী কারা ছিল? ভাড়াটিয়া নাগা সন্ন্যাসী? এদেশীয় কোন অনার্য্য হিন্দু সম্প্রদায়ভুক্ত সন্ন্যাসী? অথবা একার্থক অর্থে সন্ন্যাসী বলে উল্লেখিত কোন ফকির বাহিনী? চন্দ্র বাবু নিজেই এ প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন একটি বেফাঁস তথ্য পেশ করে। এক ইংরেজ কর্মচারীর লেখা চিঠির বরাত দিয়ে তিনি বলে ফেলেছেন যে, "ইংরেজ কর্মচারীরা অনেক সময়ে মুসলমান ফকির ও হিন্দু সন্ন্যাসীদেরকে সনাক্ত করতে পারতো না–এমনকি, বগুড়ার ভবানীপুরের ভবানী মন্দির লুণ্ঠনের ক্ষেত্রে সন্ন্যাসীদেরকে দায়ী করে তারা চিঠি লিখেছেন" (চন্দ্র, ঐ, পৃঃ ৩৩)। তবে কি উপরোক্ত দুই যুদ্ধে বিজয়ী সন্ন্যসীরা পূর্বোক্ত একার্থবোধক অর্থে ফকির–সন্ন্যাসী–অর্থাৎ মুসলমান ফকির বাহিনী ছিলেন? কোন কোন চিঠিতে ইংরেজরা হামলাকারীদেরকে ফকির সন্ন্যাসী বলেও উল্লেখ

www.nagorikpathagar.org

করেছেন। উপরোক্ত "সন্নাসী" দল দু'টির প্রথমোক্তটি যুদ্ধের আগে রংপুরের ভবানীগঞ্জস্থ হিন্দু জমিদারের কাচারি লুট করে এবং লুন্ঠন ও যুদ্ধকালে প্রজাসাধারণ তাদেরকে সমর্থন ও সহযোগিতা দান করে (চন্দ্র, ঐ, পৃঃ ৬৯)। শেষোক্ত দলের "সন্ন্যাসীরা" যুদ্ধের মাসাধিককাল পূর্বে বগুড়ার হিন্দু জমিদারের চৌগং পরগনার নায়েবকে বন্দী করে রংপুরের চিলমারী নিয়ে যায় এবং টাকা আদায়ের পর ছেড়ে দিয়ে (চন্দ্র,ঐ,পৃঃ ৭৪–৭৫) নিজেরা টাংগাইল অঞ্চলে হাজির হয়। সেখানে থাকাকালে তারা মুক্তগাছার মহারাজার বাড়ী ও কাচারী লুঠ করে। ইরেজদের রিপোর্টে তাদের দুই দলপতির নাম উল্লেখ হরা হয় Dareangheer ও Motigheer বলে।

বাবুরা এ নাম দু'টিকে 'ধর্মগিরী' ও 'মোতিগিরী' বুঝে নিয়ে গিরীপন্থী হিন্দু সন্ন্যাসী বলে উল্লেখ করেছেন (চন্দ্র,ঐ, পৃঃ ৭৫)। অথচ যে কেউ শব্দ দু'টিকে জাহাঙ্গীর, আলমগীর শব্দের মতো "দরিয়াগীর" ও "মোতিগীর" এই অবিকৃত উচ্চারণে মুসলমান ফকিরের নাম বলে দাবী করতে পারেন। দরিয়াগীর ও মোতিগীর যদি হিন্দু হবেন তবে তারা বেছে বেছে বড় বড় "কুলীন" হিন্দু মহারাজাদের কাচারি বাড়ি লুট করে নায়েব–গোমস্তাদের পাকড়াও করতেন না। এছাড়া ১৭৬৩ সালের গোড়ার দিকে ঢাকার এবং শেষের দিকে রাজশাহীর ইংরেজ কুঠিদ্বয় "সন্ন্যাসী ও ফকির" বিদ্রোহীরা যুদ্ধ করে দখল করেন। (পরে এ যুদ্ধ দু'টির পর্যালোচনা করা হবে) উপরোক্ত যুদ্ধগুলো ছাড়া ইংরেজদের সাথে সংঘটিত অন্য কোন যুদ্ধের তথ্য রেফারেন্স হিসেবে উদ্ধৃত ইংরেজ কর্মচারীদের কোন চিঠিতে নেই। (কারণ, ইংরেজ আই, সি, এস, মিঃ ক্যাসেল ইংরেজের ইজ্জতের দিকে চেয়ে তেমন কোন তথ্য ভক্ত কর্মচারী রায় সাহেব যামিনী বাবুকে দেন নাই)। তবে জমিদারদের উপর হামলার আরো কিছু ঘটনা সেসব চিঠিতে উল্লিখিত হয়েছে। তাতে দেখা যায়, বাংলার যে ১৫টি বড় জমিদারীর রাজা–মহারাজারা ইংরেজদের নিত্য সহযোগী ছিলেন বিদ্রোহীরা কেবল তাদের কাচারি লুট করেছেন, কর্মচারীদের ধরে নিয়ে টাকা আদায় করেছেন। সেগুলোর মধ্যে দিনাজপুর জমিদারী ও ঘোড়াঘাট জমিদারী (চন্দ্র, ঐ, পৃঃ ৫৩–৬২), নাটোর জমিদারী, দিঘাপাতিয়া জমিদারী (সুপ্রকাশ রায়, ভারতের কৃষক বিদ্রোহ, পৃঃ ৩৫), মোমেনশাহী জমিদারী, মুক্তাগাছা জমিদারীর (চন্দ্র, ঐ, পৃঃ ৭৫) উল্লেখ চিঠিগুলোতে সরাসরিভাবে রয়েছে। রাজপুত বংশীয় এবং পশ্চিম থেকে আমদানীকৃত "কুলীন" বর্ণহিন্দু, ইংরেজ কোম্পানীর জুনিয়র পার্টনার এসব রাজা–মহারাজার জমিদারীর বাইরে বিদ্যমান শত শত ছোট–খাটো জমিদার–যারা সবাই ছিলেন হাজার বছরে গড়ে ওঠা

www.nagorikpathagar.org

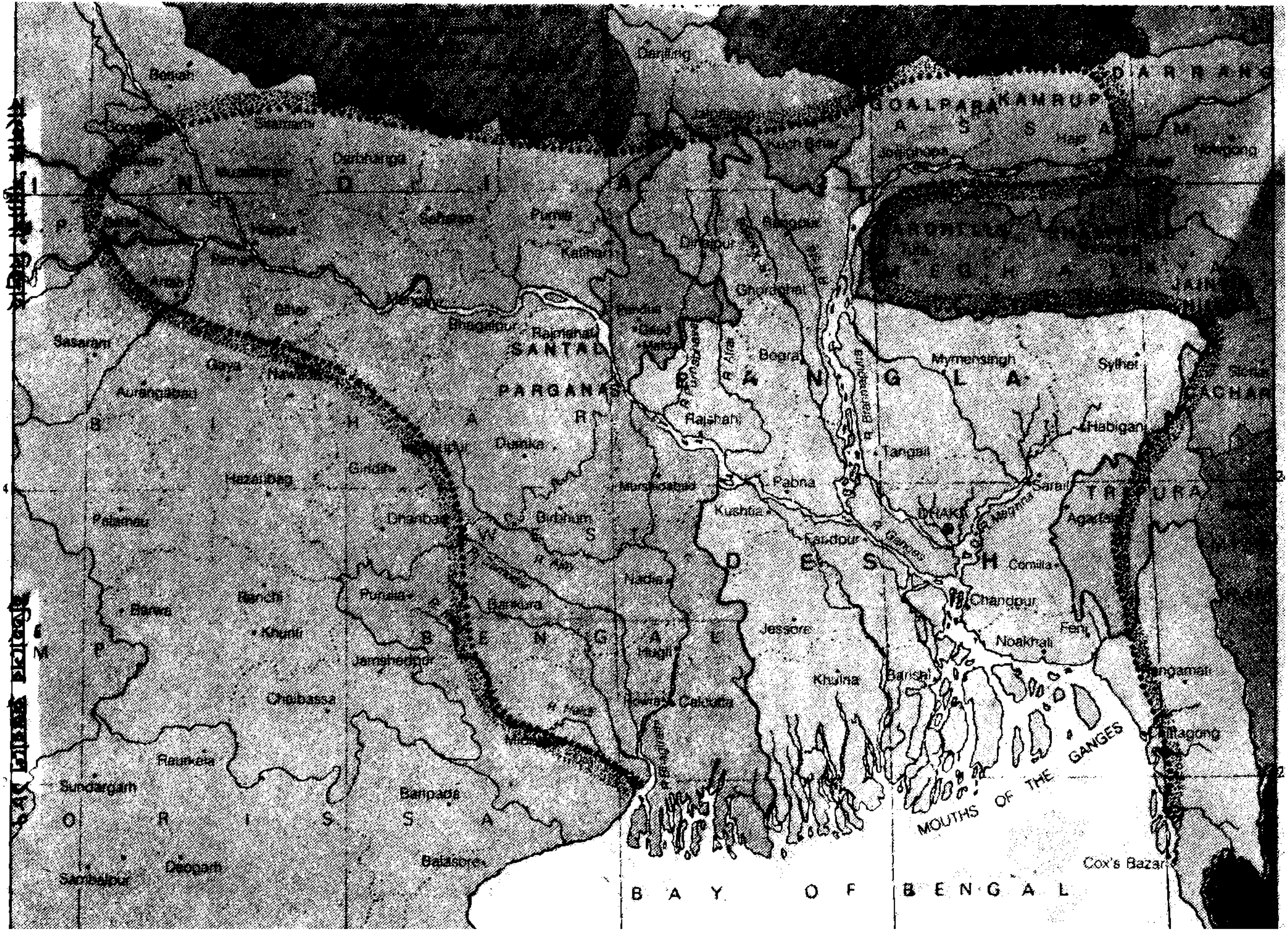

www.nagorikpathagar.org

অনার্য্য বাংগালী হিন্দু-তাদের কারো উপরেই এসব "হামলাকারীরা" কখনো চড়াও হন নাই। আর জনসাধারণতো সর্বত্রই তাদেরকে সহযোগিতাই দিয়েছে। বরং এই প্রতিরোধ বাহিনী বা "হামলাকারীদের" নেতা বলে উল্লিখিত ফকির মজনু শাহের যে একটি সার্কুলারের উল্লেখ মেলে তার পংক্তিমালা পড়লে রীতিমতো বিস্ময়াবিষ্ট হতে হয়। (চন্দ্র, ঐ, পৃঃ ১৯) । কোলকাতা রেভেনিউ কাউন্সিলের কাছে নাটোরের ইংরেজ সুপারভাইজার কর্তৃক ২৫শে জানুয়ারী ১৭৭২ তারিখে লেখা রিপোর্টে বলা হয়ঃ

"আমার হরকরা (খবর আদান-প্রদানকারী) খবর লইয়া আসিয়াছে যে, গতকাল ফকিরদের একটা প্রকান্ড দল সিলবেরীর (বগুড়া জেলায়) একটি গ্রামে আসিয়া সমবেত হইয়াছে। তাহাদের নায়ক মজনু তাঁহার অনুচরদের উপর কঠোর নির্দেশ দিয়েছেন যে, তাহারা যেন জনসাধারণের উপর কোন প্রকার অত্যাচার বা বল প্রয়োগ না করে এবং জনসাধারণের স্বেচ্ছার দান ব্যতীত কোন কিছুই গ্রহণ না করে-।" একই সুপারভাইজার ২৯ জানুয়ারীর রিপোর্টে জানান যে, "গ্রামবাসীরা নিজেরাই উদ্যোগী হইয়া বিদ্রোহীদের আহারের ব্যবস্থা করিয়াছে-বহু কৃষক বিদ্রোহী বাহিনীতে যোগদান করিয়াছে। অন্যেরা ইংরেজ সরাকরকে জমিদারদের মাধ্যমে কর দেওয়া বন্ধ করিয়া সেই কর বিদ্রোহীদেরকেদিয়াছে।"

এ, এন, চন্দ্র বাবু ইংরেজ বিরোধী সন্ন্যাসীদের ভূমিকার স্বপক্ষে অকাট্য দৃষ্টান্ত পেশ করেছেন। রংপুরের দেবী চৌধুরানী ও ভবানী পাঠকের সাথে ইংরেজ সেনাপতি লেফটেন্যান্ট ব্রেনানের ১৭৮৭ সালে সংঘটিত যুদ্ধের উল্লেখ করে। কিন্তু রংপুর জেলার উলিপুরের পাঠকপাড়ায় এখনো জীবিত ফনীন্দ্র নাথ পাঠকের উর্ধ্বতন ষষ্ঠ পুরুষ ভবানন্দ পাঠক ছিলেন অনার্য্য বাংগালী গোসাই সন্ন্যাসী-সারা উপমহাদেশ চষে-বেড়ানো ভাড়াটিয়া লুন্ঠনকারী নাগা সন্ন্যাসীদের সাথে তাঁর দলের কোন সম্পর্ক ছিল না। দেবী চৌধুরানীও বৃটিশ পোষ্য বংকিম বাবুর কল্পিত ডাকাত সর্দারণী ছিলেন না-ছিলেন কুড়িগ্রাম-রংপুর রেলপথে মীরবাগ ষ্টেশনের কাছে কুরশা গ্রামের মেয়ে এবং পীরগাছা মন্থনার প্রজাবৎসল জমিদার জয়দুর্গা দেবী চৌধুরাণী। ভবানী পাঠক ও দেবী চৌধুরানী দু'জনই ছিলেন ছোট-খাটো জমিদার, বাংলার মাটি ও মানুষের আপনজন। বিদেশী ইংরেজ এবং তাদের এদেশী দোসর পশ্চিমা "কুলীন" রাজা-মহারাজা, জমিদারদের সাথে তাদের সম্পর্ক ছিল বিরোধিতার

www.nagorikpathagar.org

প্রত্যক্ষ সংগ্রামের [পলাশী যুদ্ধোত্তর আযাদী সংগ্রামের পাদপীঠ, হায়দার আলী চৌধুরী, পৃঃ ২৬৮, ২৭৩–এ বিস্তারিত দলিল দস্তাবেজ দ্রষ্টব্য]।

বাংলার বৃটিশবিরোধী প্রথম প্রতিরোধ সংগ্রামে সন্ন্যাসী নেতৃত্ব প্রমাণের জন্য চন্দ্র বাবু সন্ন্যাসীদের আরো অনেক স্থানে উপস্থিত ও আগমন–নির্গমনের বর্ণনা পেশ করেছেন। তিনি লিখেছেন যে, ১৭৬৩ হতে ৭১ সাল পর্যন্ত ঢাকা থেকে পূর্ণিয়া এবং বরিশাল থেকে নেপাল সীমান্ত পর্যন্ত বাংলার সর্বত্র "সন্ন্যাসী–ফকিরদের" হামলায় অতিষ্ঠ কালেক্টর ও অনুগত রাজা–মহারাজাদের অনুরোধে গভর্ণর জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংস একার্থবোধক অর্থে "যাযাবর ফকির–সন্ন্যাসী"দের গতিবিধি সম্পর্কে সরকারকে অবহিত রাখার এবং বর্ণহিন্দু বড় জমিদারদের প্রযত্নে রক্ষিত দেশী সিপাহী ও ইংরেজ সৈন্যদের সাহায্যে তাদের মোকাবেলা করার কড়া নির্দেশ জারি করার পর ফকির–সন্ন্যাসী ফোবিয়ায় আক্রান্ত নায়েব–গোমস্তা, সুপারভাইজারেরা কোন স্থানে কিছু সংখ্যক সন্ন্যাসী–বৈরাগীর সমাবেশ দেখলেও তা রিপোর্ট করতেন। এরূপ একটি রিপোর্টে মেদিনীপুরের খিরপালের ইংরেজ রেসিডেন্ট ১৭৭৩ সালে সে–অঞ্চলে ৭ হাজার পদাতিক ও ৫ শত অশ্বারোহী বর্গী বাহিনীর নাগা সন্ন্যাসীর উপস্থিতির খবর জানান। এ সন্ন্যাসীরা পরে কটকের দিকে চলে যায় (চন্দ্র, ঐ, পৃঃ ৭৮)। এ সময়ে ৩ হাজার হিন্দু সন্ন্যাসী বিষ্ণুপুরের পথে মেদিনীপুরের জংগলের মধ্য দিয়ে অতিক্রম করে–তারা ছিল পুরীর তীর্থযাত্রী (চন্দ্র,ঐ, পৃঃ ৭৮)। ১৭৭৩ সালের ফেব্রুয়ারী–মার্চ মাসে নদীয়ার কালেক্টর অগ্রদ্বীপে একদল সন্ন্যাসীর উপস্থিতি সম্পর্কে রিপোর্ট করলেও পরে দেখা যায়, তার রিপোর্ট মিথ্যা গুজবভিত্তিক (এ, এন, চন্দ্র, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৭৯)। ১৭৭৩ সালের ১০ই মে সিলেটের কালেক্টর একদল সন্ন্যাসীর উপস্থিতি রিপোর্ট করেন। পরে দেখা যায়, কালেক্টরের গুপ্তচরেরা তাকে মিথ্যা রিপোর্ট দিয়েছিল। ১৭৭৩ সালের ১৫ই মার্চ ত্রিহুতের ইংরেজ সুপারভাইজার ২০/২৫ হাজার সন্ন্যাসীর এক সমাবেশের সম্ভাবনা সম্পর্কে রিপোর্ট পাঠান–পরে দেখা যায়, সেটা ছিল নেপাল সীমান্তে সীতাদেবীর জন্মস্থান বলে কথিত জনকপুর তীর্থে আগত সন্ন্যাসীদের সমাবেশ (এ, এন, চন্দ্র, ঐ, পৃঃ ৭৯) । ১৭৭৩ এর ২০শে অক্টোবর কটকের কালেক্টর, কয়েকদিন পর মুর্শিদাবাদের কালেক্টর এবং তারও কিছু পরে রাজশাহীর কালেক্টর রিপোর্ট করেন যে, সেসব অঞ্চলে ২/৩ হাজার সন্ন্যাসীকে দেখা গেছে –শেষতক দেখা যায়, তারা সবাই ছিল তীর্থযাত্রী (চন্দ্র, ঐ, পৃঃ ৮০)। কটকের কালেক্টরের রিপোর্টে জানানো হয় যে, ১ হাজার ৭শত সন্ন্যাসী ও ৩ শত ফকির সে অঞ্চল দিয়ে বাংলা অভিমুখে রওয়ানা হয়েছে (এ, এন, চন্দ্র, ঐ, পৃঃ ৮১–

www.nagorikpathagar.org

৮২) –কিন্তু তারা একদলভুক্ত না পৃথক বা পরস্পর বিরোধী দল একথা তাতে বলাহয়নি।

অথবা দুই দল দুই চিঠিতে একার্থবোধক অর্থে একবার সন্ন্যানী ও অন্যবার ফকির বলে উল্লেখিত হয়েছে–তাও স্পষ্ট নয়। এভাবে ওয়ারেন হেস্টিংসের 'Nomadic Marauders' ও 'পশ্চিমা দস্যু–ডাকাত' এবং যামিনী বাবুর ফকির ও সন্ন্যাসী লুটেরা বাহিনীর কার্যকলাপ উপেন্দ্রনাথ বাবুর হাতে ইংরেজ বিরোধী সন্ন্যাসী ও ফকিরদের জাতীয়তাবাদী প্রতিরোধ সংগ্রাম হবার পর, চন্দ্র বাবু অর্ধ–শতাব্দীব্যাপী সেই সংগ্রামকে পুরাপুরি সন্ন্যাসীদের বিজয়গাঁথারূপে চিত্রিত করার কোশেশ করেও নিদারুণভাবে ব্যর্থ হয়েছেন। তাঁর গ্রন্থের পর্যালোচনায় দেখা যায়, ১৭৬৩ থেকে ৭৩ সাল পর্যন্ত ভাগীরথির পশ্চিমপাড়ে বর্গী বাহিনীভুক্ত নাগা সন্ন্যাসী দলের লুট–পাট ছাড়া উত্তর–দক্ষিণ ও পূর্ব বাংলার কোথাও সন্ন্যাসীরা বৃটিশ বিরোধী কোন তৎপরতায় অংশ নেয়নি। ১৭৭১ সালের মহামন্বন্তরে বাংলার ৩ কোটি অধিবাসীর ১ কোটি অনাহারে মারা যাবার পর অবশিষ্ট জীবন্মৃত জনসাধারণ মরিয়া হয়ে ইংরেজের তল্পিবাহক বর্ণহিন্দু জমিদার ও নব্য কোটিপতিদের উপর হামলা চালায়। এতে ইংরেজদের দ্বারা 'ফকির' বলে চিহ্নিত ব্যক্তিরা নেতৃত্ব দেয়ায় ওয়ারেন হেস্টিংসের নির্দেশে রাজা–মহারাজা, জমিদারেরা নাগা সন্ন্যাসীদের ভাড়া করে এনে প্রতিরোধ সংগ্রামকে প্রতিরোধ করে। চন্দ্র বাবু নিজেই স্বীকার করেছেন যে, ফকির ও সন্ন্যাসীদের মধ্যে উস্কে দেয়া এ ধরনের সংঘাত–সংঘর্ষ ১৮ শতকের সমাপ্তি অবধি অব্যাহত থাকে (চন্দ্র, ঐ, পৃঃ ৫৪, ৯০)।

সুতরাং ১৮ শতকের শেষার্ধে ইংরেজ বিরোধী প্রতিরোধ সংগ্রাম তথা বাংলার প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রামে নেতৃত্ব আর যারাই দেন না কেন, নাগা সন্ন্যাসীরা দেয় নাই। তাদের ভূমিকা ছিল সুযোগ–সুবিধা মতো লুটতরাজ চালানো এবং বৃটিশপক্ষীয় রাজা–মহারাজা, জমিদারদের ভাড়াটিয়া হিসাবে কাজ করা। একথা চন্দ্র বাবুর "বায়া দলিলে" ভরপুর গ্রন্থের বানোয়াট ব্যাখ্যা থেকেই স্বতঃ প্রমাণিত হয়।

আলোচ্য অধ্যায়ের বৃটিশ বিরোধী প্রতিরোধ সংগ্রামের প্রগতিশীল "অসাম্প্রদায়িক ও বিপ্লবী" ব্যাখ্যা দিয়েছেন প্রখ্যাত কম্যুনিস্ট বুদ্ধিজীবী সুপ্রকাশ রায়। তিনি পুরো ব্যাপারটিকে প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ ও তাদের আশ্রিত জমিদার, মহাজন, বিত্তশালী শোষকদের বিরুদ্ধে

www.nagorikpathagar.org

শোষিত নির্যাতিত প্রজাসাধারণের শ্রেণী-সংগ্রাম বলে। তাঁর মতে, পলাশী যুদ্ধের পর বাংলার প্রকৃত শাসন ক্ষমতা ইংরেজদের হাতে চলে যাবার শুরু থেকে সুবে বাংলায় ভূমিরাজস্ব উত্তরোত্তর বাড়তে থাকে। খাজনার সাথে নানামুখী উপ-খাজনায় প্রজাদের জীবন অতিষ্ঠ হয়ে উঠে। ফসল দ্বারা খাজনা পরিশোধের নিয়ম পরিবর্তিত হয়ে নগদ টাকায় খাজনা পরিশোধের নিয়ম চালু হওয়াতে ইংরেজদের নিযুক্ত এজেন্ট বেনিয়ান সুবর্ণ বণিকদের ছলনা-প্রবঞ্চনায় প্রজাদের জীবন কণ্ঠাগত হয়ে আসে। তদুপরি ধান, চাউল, মিহি ও মোটা যাবতীয় বস্ত্র, লবণ ও সুপারীসহ বাংলার মৌলিক বানিজ্যগুলোর সবই ইংরেজরা দখল করে নিয়ে সেগুলো পরিচালনার জন্যই নিয়োগ করেন বশংবদ বেনিয়ান এজেন্ট-ফড়িয়া দালালদেরকে। তাঁতী, কারিগর ও লবণ চাষীদেরকে বলপূর্বক দাদন প্রদান করে বিনিময়ে উৎপাদন ব্যয়ের চেয়েও কম মূল্যে কাপড় ও লবণ সরবরাহে তারা বাধ্য করতো। অপারগ হলে অন্ধকার কামরায় কয়েদ করে রাখা হতো। শূন্যে ঝুলিয়ে রেখে চাবুক মারা হতো। চিৎ করে শুইয়ে রেখে বাঁশডলা দিতো। তাদের নারীদেরকে জোরপূর্বক কেড়ে নিয়ে ইংরেজ মনিবদেরকে উপঢৌকন দিতো এবং নিজেরাও পাশবিক অত্যাচার চালাতো। এরূপ জবরদস্তি কাপড় বোনার হাত থেকে রেহাই পাবার জন্য তাঁতীরা নিজেরাই নিজেদের বৃদ্ধাঙ্গুলি কেটে ফেলেছিলেন। লবণ চাষীরা নিজেদের বসতি এলাকা ছেড়ে দূরবর্তী এলাকায় হিজরত করতেন। চাষীরা প্রাকৃতিক কারণে খাজনার তুলনায় ফসল কম হচ্ছে দেখে বিবি বাচ্চাদের নিয়ে আপন এলাকা ছেড়ে অন্যত্র পালিয়ে গিয়ে জান বাঁচাবার চেষ্টা করতেন। সারাদেশে এরূপ ছিন্নমূল নির্বিত্ত জনসাধারণ জমিদার ও বিত্তশালীদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রামে সংঘবদ্ধ হয়। ধর্মপ্রাণ সন্ন্যাসীরা তাদের এ সংগ্রামে নেতৃত্ব দেন; 'মজনু ফকিরের দলও সাথে ছিলেন।' শাস্ত্রীয় ব্যাখ্যা অনুযায়ী ধর্ম 'জনগণের আফিম' তাই পাকা আফিমখোর সন্ন্যাসী ও ফকিরেরা শোষকশ্রেণীর পক্ষে না থেকে কেন নিপীড়িতদের নেতৃত্ব দিলেন- সুপ্রকাশ বাবু তার কোন ব্যাখ্যাই দেন নাই। হয়ত বা তেমন ব্যাখ্যা দিতে গেলে সন্নস্যাসীদেরকে সেই সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলনের পুরোভাগে আনা যেতো না। যামিনী বাবু, উপেন্দ্রনাথ বাবু ও চন্দ্র বাবুর সব 'বায়া দলিল' সুপ্রকাশ বাবুও পেশ করেছেন। সাথে আরও কিছু দলিল-দস্তাবেজও যোগ করেছেন। শোষণ-পীড়ন,তার প্রতিবাদ, প্রতিকার, আন্দোলন, সংগ্রাম সবকিছুই তিনি কুশলী দক্ষতার সাথে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করেছেন। বহু তথ্যই তিনি উপস্থাপন করেছেন, কেবল দু'টি তথ্য পেশ করা থেকে সাবধানতার সাথে বিরত রয়েছেন। তাহলো, নির্যাতিত-নিপীড়িত মানুষগুলোর পরিচয় এবং শোষক-পীড়ক জমিদার-মহাজনদের নামধাম ইত্যাদি। অবশ্য তা পেশ করায় তার একটু অসুবিধাও হত।

www.nagorikpathagar.org

কেননা, জমিদার বিত্তশালী ইংরেজ–পোষ্য শোষক নির্যাতকেরা সবাই ছিলেন তাঁর স্বধর্মীয় স্বগোত্রীয় বর্ণহিন্দু'কুলীন' রাজা–মহারাজা, সুবর্ণবণিক ও তাদের আত্মীয়–স্বজনেরা। নির্যাতীতের কাতারে ছিলেন বাংলার বাংগালী মুসলমান এবং অনার্য্য নিম্নবর্ণের শূদ্রাদি হিন্দুকুল–সোজা কথায় যবন ও ম্লেচ্ছের দল। এ কারণেই ভূরি ভূরি তথ্য সংগ্রহ করতে পারলেও এই 'অসাম্প্রদায়িক' বুদ্ধিজীবী দু'এক ডজন জমিদার ও বিত্তবান ব্যক্তির নামও পেশ করতে পারেননি। অথচ কে না জানে যে, এই জমিদার শ্রেণীর নেতৃত্ব দিয়েছেন বাংলার অর্ধেক সম্পত্তির মালিক ১৫টি বর্ণ হিন্দু জমিদার। আর নব্য ক্রোড়পতিদের পুরোধা ছিলেন কবি রবী ঠাকুরের প্রপিতামহ লবণের উৎপাদন এজেন্ট দর্পনারায়ণ ঠাকুর, মাইকেল মধুসূদনের পিতা রাজ নারায়ণ দত্তের বাবা এবং "প্রাতঃস্মরণীয়"রাজা রামমোহন রায়ের পিতা (বর্ধমান মহারাজার নায়েব) এবং তাদের স্বগোত্রীয় বাবুরা। তৎকালীন সমাজের উপর গবেষণালব্ধ বহু বই পুস্তক এ যাবত প্রকাশিত হয়েছে এবং তাতে এসব শোষক–পীড়কদের নামের দীর্ঘ তালিকাও রয়েছে। কিন্তু আপন সম্প্রদায়ের প্রতি কর্তব্য সচেতন অসাম্প্রদায়িক বুদ্ধিজীবী তা দেখেও দেখেননি। এখানেই শেষ নয়। নিজ সম্প্রদায়ের ঐতিহ্য গৌরবোজ্জ্বল করার প্রয়োজনে নতুন ব্যাখ্যার সাথে নতুন তথ্যও তিনি তৈরী করেছেন। যেমন, তিনি বিদ্রোহের কাহিনীর প্রথমপর্বের বর্ণনা (১৭৬৩–৬৯) দিতে গিয়ে (পৃঃ ২৯–৩০) লিখেছেন, "সন্ন্যাসী বিদ্রোহের প্রথম আঘাত আসে ১৭৬৩ খৃষ্টাব্দে ঢাকার ইংরেজ কুঠির উপর। সেই সময় কোলকাতার পরেই ছিল ঢাকার কুঠির স্থান-------সম্ভবতঃ কোন সন্ন্যাসী বা ফকির নায়কএর নেতৃত্বে------" বিদ্রোহীরা রাত্রির অন্ধকারে কুঠির চতুর্দিকে নিঃশব্দে সমবেত হয়ে, রমনার কালীবাড়ীর মহারাষ্ট্রীয় স্বামীজীর মতে, "ওঁ বন্দে মাতরম" এই রণধ্বনি করিতে করিতে কুঠি আক্রমণ করে। এই আকস্মিক আক্রমণে কুঠির ইংরেজ বণিকগণ ভয়ে এরূপ অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিল যে, আক্রমণকারীদের বাধা দিবার কিছুমাত্র চেষ্টা না করিয়া তাহারা নিজেদের প্রাণ বাঁচাইবার জন্য সমস্ত ধন–সম্পদ ফেলিয়া কুঠির পিছন দরজা দিয়া অন্ধকারে নৌকাযোগে পলায়ন করে। কুঠির সিপাহী–শান্ত্রীরা সাহেবদের পূর্বেই পলায়ন করিয়াছিল,তখন ক্লাইভ ছিলেন 'ইষ্ট ইন্ডিয়া' কোম্পানীর বড় কর্তা। তিনি কুঠির সাহেবদের এই কাপুরুষতায় ক্রুদ্ধ হইয়া কুঠির পরিচালক রালফ লিষ্টারকে পদচ্যুত করেন। বিদ্রোহীরা ১৭৬৩ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত কুঠি অধিকার করিয়া থকে।---- "বিদ্রোহীদের দ্বিতীয় আক্রমণ হয় রাজশাহী জেলায় রামপুর বোয়ালিয়ার ইংরেজ কুঠির উপর। ১৭৬৩ খৃষ্টাব্দের মার্চ মাসে তাহারা কুটির সমস্ত ধন–সম্পদ লুন্ঠন করিয়া চলিয়া যায়। কুঠির

www.nagorikpathagar.org

বেনেট সাহেব বিদ্রোহীদের হস্তে বন্দী হন। বিদ্রোহীরা তাঁকে পাটনার কেন্দ্রে প্রেরণ করে। সেখানে তিনি বিদ্রোহীদের হস্তে নিহত হন।"

সন্ন্যাসীদের এরূপ বিদ্রোহের কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে সুপ্রকাশ বাবু লিখেছেন, "ইংরেজ শাসকগণ নানাবিধ কর বসাইয়া তাহাদের তীর্থভ্রমণকে মুনাফার শিকারে পরিণত করিয়াছিল। এবং তীর্থ ভ্রমণ ও ধর্মানুষ্ঠান অসম্ভব করিয়া তুলিয়াছিল। সুতরাং বিদেশী শাসকগণের কবল হইতে জীবিকা ও ধর্ম রক্ষার জন্য তাহারা বিদ্রোহী কৃষক ও কারিগরগণের সহিত যোগদান করিল। ধ্বংসপ্রাপ্ত মোগল সাম্রাজ্যের বেকার ও বুভুক্ষু সৈন্যগণও জীবিকার অন্য কোন উপায় খুঁজিয়া না পাইয়া কৃষক–কারিগরগণের এই সংগ্রামে যোগদান করিল।" নিজের কথার স্বপক্ষে আর একজন স্বাক্ষী দাঁড় করিয়ে তিনি লিখেছেন, "ডাক্তার ভূপেন্দ্র নাথ দত্ত মহাশয় লিখিয়াছেন; ঢাকার রমনার কালিবাড়ীর মহারাষ্ট্রীয় স্বামীজি "না–কি" বলিতেন, সন্ন্যাসী যোদ্ধারা 'ওঁ বন্দে মাতরম' এই ধ্বনি করিত।" ইতিহাসে 'না–কি' ফাঁকির জায়গা নেই। অকাট্য যুক্তি ও বাস্তব প্রমাণে সবকিছু প্রমাণ করতে হয়। কিন্তু বাবুদের লেখা ইতিহাস গ্রন্থের সর্বত্রই এসব শব্দের ছড়াছড়ি। সুপ্রকাশ বাবুও এটাই করেছেন। এবারে তাঁর বক্তব্যকে ব্যাখ্যা করে দেখা যাক। ১৭৬৩ সালে কুঠি আক্রমণের সময়ে যে মহারাষ্ট্রীয় স্বামীজি মহারাষ্ট্র থেকে ঢাকায রমনা কালীবাড়ির পুরোহিত হলেন, প্রসিদ্ধি পেতে তাঁর বয়স অন্ততঃ ৫০ বছর হয়েছিল। সুতরাং তিনি যত দীর্ঘজীবীই হোন না কেন উনিশ শতকের গোড়াতে অবশ্যই মারা গেছেন। ১শ' বছর পর বিশ শতকের লেখক ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের সাথে নিশ্চয়ই তার দেখা হয়নি। সাক্ষ্যটা তিনি পেলেন কোথায়? দ্বিতীয়ঃ ১৭৬৩ সালে দৈশিক জাতীয়তাবাদের ধারণাই সৃষ্টি হয়নি। তখন যুদ্ধ হতো রাজায় রাজায়, শাহ সুলতানে। দেশমাতৃকার সেবা ও যুদ্ধে দেশের বন্দনা–সঙ্গীতের ধারণা তখন ছিল না। ঢাকা কুঠি লুন্ঠনের প্রায় ১ শত বছর পর ১৮৮০'র দশকে বঙ্কিম চন্দ্র "বন্দে মাতরম" সঙ্গীত রচনা করেন–বিলেতে শিক্ষিত বাবুরা ইউরোপ থেকে জাতীয়তাবাদী ধারণা আমদানী করার পরবর্তী পর্যায়ে। তার পরেই সারা ভারতে হিন্দুদের কাছে বন্দে মাতরম জাতীয় শ্লোগানে রূপ লাভ করে। পলাশী যুদ্ধের আগে–পরে সেকালে ভারতীয় হিন্দু রাজাদের যুদ্ধের শ্লোগান ছিল 'হর হর' 'ব্যোম ব্যোম' ইত্যাদি। বন্দে মাতরমের ধারণা তখন জন্মও নেয়নি। সুপ্রকাশ বাবু বিশ শতকের ৭০–এর দশকে এসে ১শ' বছর আগে লেখা বন্দে মাতরম শ্লোগানকে সোয়া ২ শত বছর আগের যুদ্ধে ব্যবহার করে ইতিহাসকে প্রয়োজন মতো সাজিয়ে নেবার দক্ষতা দেখিয়েছেন।

www.nagorikpathagar.org

ঢাকা ও রাজশাহীর ইংরেজ কুঠি দু'টি আক্রমণ ও দখল করা হলো ১৭৬৩ খৃষ্টাব্দের মার্চ থেকে ডিসেম্বরের মধ্যে। আক্রমণকারী "সন্ন্যাসী" বিদ্রোহীরা ইংরেজের বিরুদ্ধে ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন, তার মতে, তীর্থ-যাত্রার উপর পীড়নমূলক কর আরোপের কারণে। তাহলে এই পীড়নমূলক কর নিশ্চয়ই ১৭৬৩ সালের মার্চ মাসের অন্ততঃ দু'চার বছর পূর্বে আরোপিত হয়েছিল। কেননা, পীড়নমূলক করের প্রতিক্রিয়ায় ক্ষিপ্ত সন্ন্যাসীদের, সেকালের অনুন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থায়, আন্দোলনের মাধ্যমে সংঘবদ্ধ হয়ে যুদ্ধের প্রস্তুতি নিতে অন্ততঃ দু'চার বছর সময় তো লেগেছিল। সুতরাং সন্ন্যাসীদের উপর ইংরেজদের কর আরোপের ঘটনাটা অবশ্যই ১৭৫৭ সালের আগেই ঘটেছে। অথচ মজার ব্যাপার, সে সময়ে ইংরেজদের কর আরোপের ক্ষমতাই ছিল না। দিল্লীর সম্রাট দ্বিতীয় শাহ আলমের নিকট থেকে বাংলার দেওয়ানী অর্থাৎ কর আরোপের ক্ষমতা লর্ড ক্লাইভ লাভ করেন ১৭৬৫ সালের ১২ই আগস্ট তারিখে।

১৭৬৫ সালের ১২ আগস্ট তারিখে কর আরোপের ক্ষমতা পেলেন ইংরেজরা। আর তাদের পীড়নমূলক করের দরুন অতিষ্ঠ হয়ে সন্ন্যাসীরা দেশব্যাপী আন্দোলন করে সংঘবদ্ধ হয়ে বিদ্রোহ শুরু করলেন ১৭৬৩ সালের জানুয়ারী-মার্চ মাসে। কি উদ্ভট কল্পনা। এমন কল্পনা বাবু বুদ্ধিজীবীদের মাথায়ই গজায়। অন্যান্য বহু তথ্যপ্রমাণে আজ এটা প্রমাণিত সত্য যে,ঢাকা ও রাজশাহীর ইংরেজ কুঠি দু'টি আক্রমণে আগ্নেয়াস্ত্রের মোকাবেলায় আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহৃত হয়েছিল। সুপ্রকাশ বাবুও তা স্বীকার করেছেন। সন্ন্যাসীরা এসব আগ্নেয়াস্ত্র পেলেন কোথায়? আর বাংলার হিন্দু সন্ন্যাসীদেরকে সেগুলো চালনার প্রশিক্ষণই বা কে দিল?

ইংরেজদের ষড়যন্ত্রের সাথী রাজা-মহারাজাদের অন্নে পালিত সন্ন্যাসীরা যে ঢাকা ও রাজশাহীর ইংরেজ কুঠি আক্রমণ করেন নি, করতে পারেন না-একথা অন্য যে কারোর চাইতে বাবু বুদ্ধিজীবীরাই ভাল বোঝেন্য তবু বানোয়াট বায়া দলিলের বদৌলতে আমাদের মতো পর্ণগ্রাহী জাবরকাটা বুদ্ধিজীবীদেরকে মোহাবিষ্ট করে আমাদের তরুণ প্রজন্মের মনে হীনমন্যতাবোধ জন্মিয়ে ভাবীকালীন বংশধরদের মাথায় যদি কাঁঠাল ভাংগা যায়, তারা সে চেষ্টা কেন করবেন না। অবশ্যই করবেন এবং করবেন আমাদেরকে পিতৃ-পরিচয় ভোলাবার সবক দিয়ে অসাম্প্রদায়িকতার শ্লোগান শিখিয়ে। মরহুম কবি আবদুল কাদিরের কাছে শুনেছিলাম, তাঁর শ্বশুর সর্বভারতীয় কম্যুনিষ্ট পার্টির মূল

www.nagorikpathagar.org

প্রতিষ্ঠাতা (১৯২২) কমরেড মুজাফফর আহমদ মৃত্যুর অল্প আগে দুঃখ করে বলেছিলেনঃ একজন খৃষ্টান যখন কম্যুনিষ্ট হয়, সে কম্যুনিষ্ট হয়; একজন মুসলমান যখন কম্যুনিষ্ট সে-ও কমুনিষ্ট হয়- কিন্তু একজন হিন্দু যখন কম্যুনিষ্ট হয়, সে হিন্দু-কম্যুনিষ্ট হয়-হিন্দুত্বকে সে বর্জন করতে পারে না। আঠারো শতকের বাংলায় ইংরেজবিরোধী সংগ্রামে হিন্দু সন্ন্যাসীদেরকে নায়ক বানাতে গিয়ে মিঃ সুপ্রকাশ রায়ও প্রমাণ করেছেন যে, কম্যুনিষ্ট হলেও তিনি হিন্দু-কম্যুনিষ্ট, বাবু কম্যুনিষ্ট।।

www.nagorikpathagar.org

পলাশীর আগের বাঁকে

৭১১ সালে সিন্ধুর উপকূলে মুহম্মদ বিন কাসিম বিজয় পতাকা উড়াবার পর উপ-মহাদেশে মুসলমানদের প্রথম পরাজয় ঘটে পলাশীর প্রান্তরে। আপাতঃদৃষ্টিতে এটা মুসলমানদের ওপর ইংরেজ বণিকদের বিজয় হলেও মূলতঃ এটা ছিলো মুসলমানদের ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে পরিচালিত সর্বভারতীয় বর্ণহিন্দু রাজা-মহারাজাদের দু'শত বছরব্যাপী নিরবচ্ছিন্ন প্রয়াসের পরিণতি। ১১৯৭ সাল থেকে ১৫২৬ সাল পর্যন্ত সোয়া তিনশত বছরব্যাপী শাসনের শেষ পর্যায়ে ভারতের তুর্ক-আফগান শাহ-সুলতানেরা ভোগ-বিলাসিতায় মগ্ন ও ভ্রাতৃঘাতী সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। তখনই মধ্য ও উত্তর ভারতের হিন্দু রাজা-মহারাজারা তাদের বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ হতে শুরু করে। এ সময় ১৫২৬ সালে পানিপথের প্রথম যুদ্ধে ইব্রাহিম লোদীকে পরাজিত করে জহির উদ্দিন মুহম্মদ বাবুর দিল্লী দখল করেন। এর এক বছর পরই ১৫২৭ সালে ১৬ মার্চ রাজপুতনা, মালব ও মধ্য ভারতের ১২০ জন রাজা-মহারাজা বাবুরকে ভারতছাড়া করার উদ্দেশ্যে সম্মিলিতভাবে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। ৮০ হাজার অশ্বারোহী সৈন্য ও ৫ শত রণ-হস্তী নিয়ে তারা আগ্রার কাছে খানুয়া প্রান্তরে বাবুরের মোকাবেলা করেন এবং ১০ হাজার মুসলমান সৈন্যের হাতে নিদারুণভাবে নাস্তানাবুদ হন। [An Advanced History of India, R.C. Majumdar, H.C. Ray Choudhuri & Kalikinkar Datta, P-421] তখনই তারা বুঝে নেন, সম্মুখ সমরে মুসলমানদের সাথে পেরে ওঠা যাবে না। তাদেরকে ঘায়েল করতে হবে পেছন দরজা দিয়ে-অন্দর মহল হয়ে। এর পর শের খাঁ সম্রাট হন। হুমায়ুন ইরানে আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং শের খাঁর মৃত্যুর পর ১৫৫৬ সালে পুনরায় দিল্লী দখল করেন। সম্রাট বাবুর ও তাঁর আমির ওমরাহদের কোনো লাম্পট্যলীলার হেরেম ছিলো না। হুমায়ুন ইরান থেকে হেরেম-জীবনে অভ্যস্ত হয়ে আসেন। রাজপুত রাজা-মহারাজারা হেরেমের উপাচার সুরা ও সুন্দরী সরবরাহের মাধ্যমে তাঁর সাথে সখ্যতা গড়ে তোলেন। অল্প কিছুদিন পর হুমায়ুনের মৃত্যু হলে ১৩ বছরের কিশোর আকবর সিংহাসনে আরোহণ করেন। নাবালক অশিক্ষিত সম্রাটকে রাজা-মহারাজারা রাজপুতানী হেরেম-বালাদের মাধ্যমে ত্বরিৎ তালিম দিয়ে উঠতি যৌবনেই আষ্টে-পৃষ্ঠে বেঁধে ফেলেন। তারা প্রাচীন ভারতে শক-হুন শাসনামলে আর্য ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ের দ্বারা অনুসৃত "তিন-প্রজন্ম-প্রকল্প" পুনর্বাস্তবায়নের কর্মসূচী হাতে নেন। এ প্রকল্পটি ছিলো নিম্নরূপঃ প্রথম প্রজন্মে একজন ১০০% মুসলমান পুরুষের সাথে একজন ১০০% হিন্দু নারীর

www.nagorikpathagar.org

বিয়ে দিতে হবে–তাদের মিলনে যে শংকর সন্তান জন্মাবে সে হবে সামাজিক সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় জীবনে ৫০% মুসলমান ও ৫০% হিন্দু। দ্বিতীয় প্রজন্মে সেই ৫০% মুসলমানের সাথে কোন ১০০% হিন্দু নারীর বিয়ে দিলে যে শংকর জন্মাবে সে হবে ১৭% মুসলমান ও ৮৩% হিন্দু। এবং তৃতীয় প্রজন্মে সেই ১৭% মুসলমানের সাথে কোন ১০০% হিন্দু নারীর বিয়ে দিলে পরবর্তী প্রজন্মের সন্তানটি সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় জীবনে হবে ৯৩% হিন্দু ও ৭% মুসলমান। অর্থাৎ তিন প্রজন্ম শেষ হতে হতে মুসলমানত্বও শেষ হয়ে যাবে। আর এর সাথে সূরা ও নারীর প্রাচুর্য যুক্ত হয়ে যদি ক্যাটালেটিক এজেন্টের কাজ করে তবে ফারমেন্টেশনের প্রবৃদ্ধি আনুপাতিক হারের চেয়েও অনেক দ্রুত সাধিত হবে। এ নীতি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে একে একে রাজা–মহারাজারা অনেকেই তরুণ আকবরের হাতে ভগ্নী ও কন্যা সম্প্রদান করেন। গড়ে তোলেন নিকটাত্মীয়ের সম্পর্ক।

মুসলমান ফৈজি, আবুল ফজল প্রমুখ আমির ওমরাহের প্রতিপক্ষে বীরবল, টোডরমল প্রমুখ হিন্দু সভাসদবর্গও আসন গ্রহণ করেন শাহী দরবারে। শুরু হয় কূটনীতির লড়াই। জয়পুরের রাজা বিহারীমল (মানসিংহের পিতামহ) মহারাজা মানসিংহের ফুফু জয়পুরী বেগমকে বিয়ে দেন ১৯ বছরের তরুণ সম্রাট আকবরের সাথে। বিনিময়ে পিতা, পুত্র, পৌত্র তিনজন আকরের সেনাপতি পদে যোগদান করেন। বিকানীর ও জয়সলমীরের রাজারাও আকবরকে কন্যা দান করে তাঁর অনুসরণ করেন [An Advanced History, ঐ, পৃঃ ৪৪১–৪৩]। মানসিংহ বোন রেবা রাণীকে বিয়ে দেন আকবরের জ্যোষ্ঠ পুত্র ভাবী সম্রাট জাহাঙ্গীরের সাথে। [নূরজাহান, দ্বীজেন্দ্র লাল] এবং কন্যাকে বিয়ে দেন সম্রাট জাহাঙ্গীরের জ্যোষ্ঠ পুত্র ভাবী সম্রাট খসরুর সাথে। [ঐ]

উত্তর–মধ্য ও পশ্চিম ভারতের অন্যান্য রাজা–মহারাজারাও এ মহাজন–পন্থা অনুসরণ করে মোগল যুবরাজ ও ওমরাহদের আত্মীয়ভুক্ত হন। অতঃপর নিকটাত্মীয়ের দাবীতে মোগল বাহিনীর প্রায় সবগুলো গুরুত্বপূর্ণ সেনাপতির পদ দখল করেন হিন্দু রাজা–মহারাজারা। মোগলশাহীর প্রশাসনের গুরুত্বপূর্ণ পদগুলোও ধীরে ধীরে তাদের করায়ত্ত হয়। মোগলদেরকে হাত করে নিয়ে তারা কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলার নীতি অনুসরণ করেন। সোয়া তিন শত বছর ধরে সারা ভারতে জেঁকে বসা তাদের 'পুরনো শত্রু' তুর্ক–আফগান মুসলমান শাসকদেরকে নির্মূল করেন তারা মোগলদেরকে সাথে নিয়ে। নূরজাহান ও আসফখার প্রাসাদ–কূটনীতির কাছে মার খেয়ে শাহজাহান ও আওরঙ্গজেবের

www.nagorikpathagar.org

জমানায় তারা এ তৎপরতায় খুব বেশী কামিয়াব হতে পারেননি। কিন্তু আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর তাদের সে সুযোগ মিলে যায়। আকবরের আমল থেকে রাজপুত রাজা-মহারাজারা নিকটাত্মীয়ের দাবীতে মোগলশাহীর অন্দরমহল ও দরবার দখল এবং সেনাবাহিনী করায়ত্ত করার যে কর্মসূচী বাস্তবায়নে আত্মনিয়োগ করেন দু'শত বছরব্যাপী ক্রিয়াশীল থেকে এতদিনে মোগল সাম্রাজ্যের সর্বত্রই তার প্রতিক্রিয়া মারাত্মক ব্যাধিরূপে আত্মপ্রকাশ করে। মোগলাই মুসলমানদের ঘরে ঘরে বিলাস-ব্যাভিচারে সম্বিতহারা মুসলিম নামধারী লম্পটেরা প্রাসাদষড়যন্ত্র ও আত্মঘাতী সংঘর্ষে লিপ্ত হয়ে নিজেদের ধ্বংস ডেকে আনে। আর সেই আত্মঘাতী সংঘর্ষের সুযোগ গ্রহণ করেই ভারতব্যাপী হিন্দু সাম্রাজ্য স্থাপনে ব্যগ্র হয়ে উঠে মারাঠা, রাজপুত, জাঠ ও শিখ সম্প্রদায়। তাদের সে কর্মপ্রবাহের ঢেউ এসে প্লাবিত করে বাংলার বর্ণহিন্দু উচ্চ শ্রেণীর মন-মানসিকতাকেও। সুরা ও নারীতে নিঃশেষিত পরবর্তীকালীন নিস্তেজ মোগলদের আমলে সারা উপ-মহাদেশের সকল এলাকা থেকে মুসলিম শাসনের নাম-নিশানা মুছে দেবার তৎপরতা তীব্র হয়ে ওঠে। মারাঠারা সমগ্র মধ্য ভারত জয় করে দিল্লী শহর লুণ্ঠন করে। মারাঠা-রাজপুত জাঠ-শিখদের বিভিন্ন সশস্ত্র বাহিনী, উপ-বাহিনী সমগ্র মধ্য, পশ্চিম ও উত্তর ভারতের মুসলমানদের অসংখ্য মসজিদ ধ্বংস করে, সম্পদ লুণ্ঠন করে ও তাদেরকে দলে দলে হত্যা করতে থাকে। এরূপ অবস্থায় প্রখ্যাত দার্শনিক শাহ ওয়ালিউল্লাহ দেহলবীর আকুল আবেদনে [শাহ ওয়ালিউল্লাহ আওর উনকি ইকতেসাদী তাহকিক, মওলানা ওবায়দুল্লা সিন্ধী; যে অতীত কথা কয়, এ, কে, এম, মহিউদ্দীন, পৃঃ ১৩] আহম্মদ শাহ আবদালী নয় দফা সসৈন্যে অভিযান পরিচালনা করেন। তাতে দিল্লীর উপ-কণ্ঠে এক রণক্ষেত্রেই এক লক্ষ মারাঠা সৈন্য নিশ্চিহ্ন হয় [The Sannyasi Rebellion. A. N. Chandra. পৃঃ ৬]। তা সত্ত্বেও হিন্দু শক্তিগুলোর মুসলিম বিধ্বংসী তৎপরতা কমবেশী অব্যাহত থাকে। দক্ষিণের পথ ধরে বর্গী বলে অভিহিত মারাঠা বাহিনী সুবে বাংলা অবধি লুটতরাজ চালায়। তাদের শিকার হয়ে ছিলো সুবে বাংলার সম্পদশালী মুসলিম পরিবারগুলো।

সমকালীন উচ্চ শ্রেণীর মোগলাই মুসলমানদের মধ্যে বিদ্যমান সুরা ও নারী চর্চার বিরোধী প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় তাদের প্রতি বীতশ্রদ্ধ মুসলিম সমাজে। তাঁরা শরীয়ত-পন্থী গোঁড়া মৌলবাদী হয়ে ওঠেন আর তরিকত-পন্থীরা সুফীবাদী ভাবধারা বিস্তারে ব্যাপৃত হন। এ সুফীদের দু'টি সম্প্রদায় ছিলেন কাদেরীয়া ও কলন্দরী তরিকার ফকিরেরা।

www.nagorikpathagar.org

নওয়াব মীর জাফর আলী খান ও তাঁরা পুত্র মীরন

www.nagorikpathagar.org

পক্ষান্তরে রাজপুত, জাঠ ও মারাঠাদের নেতৃত্বে হিন্দু পুনর্জাগরণ সূচীত হয়, হিন্দু সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ও রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতায় সক্রিয় হয়ে উঠেন। তারা সংঘবদ্ধভাবে হিন্দুরাজ পুনঃ প্রতিষ্ঠার জন্য মাঠে নামেন। নাগা সন্ন্যাসী বলে অভিহিত নাগপুর অঞ্চলীয় এ রকম সন্ন্যাসীরা রাজপুত ও মারাঠা সৈন্যবাহিনীর অংশ ছিলো। একমাত্র জয়পুর রাজের সৈন্যবাহিনীতেই ১০ হাজারের বশী নাগা সন্ন্যাসী কর্মরত ছিলো [সন্ন্যাসী রিবেলিয়ন, এ, এন, চন্দ্র, পৃঃ ২১]। হোলকার ও সিন্ধিয়া বাহিনীরও একাংশ ছিলো সন্ন্যাসীদের নিয়ে গঠিত [দি সন্ন্যাসী রিবেলিয়ান, এ, এন, চন্দ্র পৃঃ ২২]। বাংলার হানাদার বর্গী বলে পরিচিত মারাঠা বাহিনীতেও বিপুলসংখ্যক নাগা সন্ন্যাসী ছিলো [ঐ, পৃঃ ৫৭]। আহমদ শাহ আবদালীর হাতে মার খেয়ে রাজপুত মারাঠা শক্তিগুলো সাময়িকভাবে দুর্বল হয়ে গড়ার পর "এ সব সন্ন্যাসীরা বিভিন্ন রাজা-মহারাজাদের পক্ষ নিয়ে যুদ্ধ করতো এবং ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে সারা উপ-মহাদেশেই বিত্তশালী ব্যক্তিদের বাড়িতে ডাকাতি করতো" [ঐ পৃঃ ২২]। বাংলাদেশেও নাগা সন্ন্যাসীদের অনুরূপ ভূমিকা ছিলো। মধ্য ভারতের মাকানপুর কেন্দ্রিক কাদেরিয়া তরিকার ফকিরেরা, দিনাজপুরের বুরহানা ফকির সম্প্রদায় ও অন্যান্য সুফি ফকিরেরা মোগলাই সুবাদার, আমির-ওমরাহদের ইসলামবিমুখ ভোগবিলাসিতা ও লাম্পট্যলীলার দরুন মুসলমান সমাজের সমূহ বিপদ ঘনিয়ে আসতে দেখে বিশেষ বিচলিত ছিলেন। স্বাভাবিকভাবেই তাই তাঁদের ভূমিকা ছিল জুলুম-বিরোধী ও মুসলিম সম্প্রদায়ের সংহতির অনুকূলে। মোগল যুগের ২শ' বছরে গড়ে ওঠা বাংলার বিশেষ আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষিতে তাঁরা নিজেদের ভূমিকা পালন করেন। এ কারণে সে সব ফকিরদের ভূমিকা উপলব্ধির জন্য তৎকালীন বাংলার পরিস্থিতি সম্পর্কেও সম্যক ধারণা থাকা অপরিহার্য। বাংলায় মোগল সাম্রাজ্যের বিস্তৃতির সূত্রপাত হয় রাজপুত সেনাপতি মহারাজ মানসিংহের নেতৃত্বে। এবং বাংলার ভূমিব্যবস্থা পুনর্বিন্যস্ত হয় মোগলশাহীর ভূমিরাজস্ব বিভাগের সর্বেসর্বা সভাসদ রাজপুত টোডরমলের কর্তৃত্বে। বাংলার স্বাধীন সুলতান সুলেমান কররানী শহীদ হবার পরবর্তী পর্যায়ে বাংলার দুর্দমনীয় বার ভূঁইয়া জমিদারদেরকে মানসিংহ এবং তাঁর নিকটাত্মীয় ও উত্তরসূরীরা একে একে উচ্ছেদ করেন এবং সেসব জমিদারীর অধিকাংশ রাজপুত সেনাপতিদের প্রভাবে এবং অমাত্যবর্গের আনুকূল্যে রাজপুত ও উত্তর ভারতীয় কুলীন হিন্দু পরিবারগুলোর মধ্যেই বন্টন করা হয়। এভাবে পুটিয়া, চাঁচড়া, নলডাঙ্গা, বিক্রমপুর প্রভৃতি হিন্দু জমিদারীর পত্তন হয় [দি রোল অব জামিদারস ইন বেঙ্গল, শীরিন আখতার, পৃঃ ৩২]।

www.nagorikpathagar.org

অবশ্য মোগলাই মুসলমানেরাও কিছু কিছু জমিদারীর অধিকারী হন। বার ভূঁইয়া হিন্দু জমিদাররা ছিলেন অনার্য্য অকুলীন বঙ্গজ হিন্দু এবং মুসলমান জমিদাররা ছিলেন তুর্ক-আফগান বংশোদ্ভূত অথবা অনার্য্য শূদ্র সম্প্রদায় ও বৌদ্ধ ধর্ম থেকে ধর্মান্তরিত মুসলমানেরা। অবশ্য মোগল শাসন-আমলে পশ্চিম থেকে আমদানীকৃত ব্রাহ্মণ্যদেরকে পৃষ্ঠপোষকতা দিয়ে দিয়ে রাজশাহীসহ উত্তর বাংলায় প্রতিষ্ঠিত জমিদারীসমূহের অনেকগুলোই ইংরেজ আমল অবধি বহাল ছিলো। [ঐ, শিরীন আক্তার, পৃঃ ২১]। সেন রাজাদের প্রভাব বর্হিভূত বরিশাল অঞ্চলে ছিলো বঙ্গজ কায়স্থদের জমিদারী [ঐ, শীরিন আক্তার, পৃঃ ২১]। আকবর-জাহাঙ্গীর-শাহজাহানের আমলে পূর্বোক্ত জমিদারীগুলোর একটা বিরাট অংশ হস্তান্তরিত হয় মোগলাই মুসলমান, রাজপুত ও পশ্চিমা রাজা-মহারাজাদের কাছে। আওরঙ্গজেবের আমলে কিছু কিছু দেশবরেণ্য আলেম ও মাদ্রাসার জন্য জায়গীর মঞ্জুরী ব্যতীত ভূমিরাজস্বের এ ব্যবস্থার বিশেষ কোনো পরিবর্তন ঘটেনি। আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর দিল্লীর মসনদের অধিকার নিয়ে যখন দুর্বল দুশ্চরিত্র মোগলজাদারা হিন্দু সভাসদ, উপদেষ্টা ও আত্মীয়বর্গের ক্রীড়নক হিসেবে ষড়যন্ত্র ও সংঘাত-সংঘর্ষে লিপ্ত হয় এবং রাজপুত, মারাঠা জাঠ ও শিখদের দৌরাত্ম্যে মুসলমান সমাজ নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবার আশংকা দেখা দেয় তখন ইরানী মুসলিম বণিকের হাতে লালিত ও মোগল বাহিনীতে বেড়ে ওঠা দাক্ষিণাত্যের এককালের ব্রাহ্মণসন্তান মুর্শিদকুলী খাঁ সুবে বাংলায় প্রায় স্বাধীনভাবে শাসন পরিচালনা শুরু করেন (১৭১৭-১৭২৭)। আশৈশব মোগলাই পরিবেশে বেড়ে-ওঠা ও মোগলাই প্রশাসনে অভ্যস্ত মুর্শিদকুলী খাঁ মধ্য-পশ্চিম-উত্তর ভারতে পরিদৃষ্ট পরিস্থিতির মতো আসন্ন বিপদ এড়াবার আশায় বড় বড় অবাংগালী হিন্দু জামিদারকে হাত করার জন্য নতুন প্রশাসন নীতি অনুসরণ করেন। তিনি এসব বড় জমিদারকে আদায়কৃত খাজনার কমিশন প্রদানের ব্যবস্থা করেন, মনসবদারীপন্থায় তাদের অধীনে সৈন্যবাহিনী রাখার অনুমতি দিয়ে প্রশাসনিক ও সামরিক গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিক সংখ্যক উচ্চবর্ণের হিন্দুদেরকে নিযুক্তি দিয়ে তাঁদের সাথে পার্টনারশীপ-প্রশাসন প্রতিষ্ঠা করেন [শীরিন আখ্তার, পূর্বোক্ত, পৃঃ]। "মুর্শিদকুলী খাঁ অনেক মুসলমান কর্মচারীর জায়গীর বাংলাদেশ হইতে উড়িষ্যায় স্থানান্তরিত করেন। কয়েকজন মুসলমান জমিদার রীতিমত রাজস্ব আদায় করিতে অসমর্থ হওয়ায় তিনি তাদের জমিদারী কাড়িয়া লন এবং হিন্দুদের সহিত ইহার বন্দোবস্ত করেন। এই রূপে মাহমুদপুর (নদীয়া-যশোহর) ও জালালপুর পরগণার কয়েকটি মুসলমান জমিদারী নাটোর জমিদারীর প্রতিষ্ঠাতা রামজীবনকে দেওযা হয়। সোনারগাঁয়ের ঈসা খানের বংশধর দিগকেও কয়েকটি মুল্যবান পরগণা হারাইতে হয়।

www.nagorikpathagar.org

মুর্শিদকুলী খাঁ তাদের জমিদারীর আলেপশাহী ও মোমেনশাহী পরগণাদ্বয় কাড়িয়া লন এবং দুইজন বর্ণহিন্দু রাজস্ব কর্মচারীর সহিত ইহার বন্দোবস্ত করেন। এই ব্যবস্থার ফলে আলেপশাহী ও মোমেনশাহীতে দুইটি প্রতাপশালী হিন্দু জমিদারীর উৎপত্তি হয়। মুর্শিদকুলী খাঁ মনে করিতেন যে, হিন্দুগণ স্বভাবত শাসকদের প্রতি অনুগত থাকে। এইজন্য তিনি রাজস্বব্যবস্থার বিষয়ে হিন্দুদিগকে বিশ্বাসযোগ্য মনে করিতেন। তাঁহার পরবর্তী নবাবগণও তাঁহার প্রদর্শিত নীতি অনুসরণ করিয়া চলেন। ইহার ফলে বাংলাদেশের জমিদারীতে হিন্দুদের প্রাধান্য স্থাপিত হয় এবং এদেশে একটি অভিজাত হিন্দু জমিদার শ্রেণীর উদ্ভব হয়। রামজীবনের নাটোর (১৩৯টি পরগণা) জমিদারী---- দিঘাপাতিয়া জমিদারী, শ্রীকৃষ্ণ চৌধুরীর মোমেনশাহী জমিদারী, মুক্তাগাছা জমিদারী (৫৭টি পরগণা) প্রভৃতি ইঁহাদের অন্যতম" [বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস, এম, এ, রহিম পৃষ্ঠা ৩২, রিয়াজুস সালাতিন ও তাওয়ারিখে বাঙলা থেকে উদ্ধৃতি]। কোচবিহারের রাজার কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া বিভিন্ন অংশে মোগলরা প্রতিষ্ঠা করেন বর্তমান রংপুর জেলাধীন ফতেপুর, বামনডাঙ্গা, পাঙ্গা, মাথনা, গাড়িয়ালডাঙ্গা, কাজীরহাট, মহীপুর, তুসভাঙ্গা, টেপা, ডিমলা ও বৈকুণ্ঠপুর–এই এগারটি হিন্দু জমিদারী। [শীরিন আক্তার, ঐ, পৃষ্ঠা, ৩২]। মুর্শিদকুলী খাঁর শাসন ধারা অব্যাহত থাকায় তাঁর জামাতা নবাব সুজাউদ্দিন খানের সময়ে সুবে বাংলার প্রায় অর্ধেক এলাকা নিয়ে গঠিত ৬১৫টি পরগণা মাত্র ১৫টি জমিদারীর অন্তর্ভুক্তহয়– এর প্রায় সবাই ছিলেন পশ্চিম থেকে আমদানীকৃত বনেদী বর্ণহিন্দু। কৃষ্ণরাম রায়ের ইউসুফপুর (যশোহর), রামদেবের মুহম্মদশাহী (ভূষণা; ২৯ পরগণা), রোকনপুর (ফরিদপুর; ৫২ পরগণা), বিশ্বনাথের ইদ্রাকপুর (ঘোড়াঘাট; ৬০ পরগণা) জমিদারীগুলো এ সময়ে বিকাশ লাভ করে। এসব বড় বড় জমিদারীগুলোর মালিক ছিলেন মোগল যুগীয় পশ্চিমা কূলীন হিন্দুরা–বাংলাদেশী অনার্য্য বাংগালীরা নন। তাঁদের দেওয়া রাজস্বের পরিমাণ ছিল সেকালের মুদ্রামানে ৬৫ লক্ষ টাকা। সমগ্র বাংলার মোট রাজস্বের প্রায় অর্ধেক।

এসব বড় বড় জমিদারেরা সন্নিহিত এলাকার ছোট ছোট জমিদারীগুলোর ব্যবস্থাপনা তদারক করতেন। সেগুলোর রাজস্বও বড় জমিদারদের মধ্য থেকে নিযুক্ত বা সরাসরি নিযুক্ত চাকলাদার, চৌধুরী ইত্যাদি পদবীধারী উচ্চ পদস্থ হিন্দু কর্মচারীরাই আদায় করতেন। বড় জমিদারেরা আদায়কৃত সেসব রাজস্বের উপর কমিশন পেতেন। নাটোর জমিদারীতে মুর্শিদকুলী খাঁর সময়ে ছিলো ১৩৯টি পরগণা [আবদুর রহিম, ঐ, পৃঃ ৩১]। ১৭৪৮ সালে আলীবর্দী খাঁর

www.nagorikpathagar.org

সময়ে তার আয়তন দাঁড়ায় ১৬৪টি পরগণায় [শীরিন আক্তার, ঐ, পৃঃ ১৮]। অবশ্য বড় বড় হিন্দু জমিদারীগুলোর পাশাপাশি তখনও বাংগালী মুসলমান ও বাংগালী অনার্য্য হিন্দু মালিকানাধীন মাঝারি জমিদারী বিরাজ করছিল। তাছাড়াও ছিল বড় জমিদারীর অধীন বিপুলসংখ্যক তালুকদার, হাওলাদার, শিকদার ইত্যাদি ভূস্বামীরা। এসব মাঝারি ও ছোট ছোট জমিদার তালুকদারেরা ছিলেন বাংলার মাটি ও মানুষের সাথে সরাসরি সম্পৃক্ত। মুর্শিদকুলী খাঁর সময় থেকে বাংলার সামরিক ব্যবস্থাও পুনর্বিন্যস্ত হয়ে জমিদার-নির্ভর হয়ে পড়ে। বড় জমিদারদের অনেককে ৩, ৫ অথবা ৭ হাজারী মনসবদারী দেওয়া হয়- অর্থাৎ প্রয়োজনীয় মুহূর্তে নবাবকে সৈন্য দিয়ে সাহায্য করতে অঙ্গীকারাবদ্ধ থেকে তারা জমিদারী রাজস্বের একটি বিশেষ অংশ দিয়ে নিজেদের অধীনে ৩, ৫ অথবা ৭ হাজার সৈন্যের সেনাবাহিনী রাখার অধিকার লাভ করেন। এছাড়া মুর্শিদকুলী খাঁ থেকে আলীবর্দী খাঁ পর্যন্ত সময়ে (১৭১৭-১৭৫৬) সেনাবাহিনীর বখশী, সেনাপতি, রাজস্ব বিভাগের দেওয়ান, প্রশাসন বিভাগের নায়েবনাজীম প্রভৃতি বড় বড় পদগুলোতেও রাজা-মহারাজারা নিযুক্তি লাভ করেন। সেই সুবাদে এসব উচ্চ পদস্থ কর্মচারীদের জন্য সারা বাংলার জায়গীরস্বরূপ নির্ধারিত ৪১০টি পরগণার মধ্যে অনেকগুলো উচ্চ শ্রেণীর বর্ণহিন্দুদের হাতে চলে যায়। এর পাশাপাশি প্রশাসনিক ও সামরিক উভয় ক্ষেত্রেই পশ্চিমা কুলীন অর্থাৎ অবাংগালী উচ্চবর্ণের হিন্দুরা আশাতীতরূপে প্রাধান্য লাভ করে। মধ্য-পশ্চিম ও উত্তর ভারতের রাজনৈতিক আবহাওযা থেকে আত্মরক্ষার আশায় অনুসৃত এ পার্টনারশীপ-প্রশাসন ব্যবস্থার কারণেই "মুর্শিদকুলী হিন্দুদিগকে রাজস্ব বিভাগের দায়িত্বপূর্ণ পদে নিয়োগ করেন। তাঁহার শাসনকালে ভূপৎ রায়, দর্পনারায়ণ, রঘুনন্দন, কিঙ্কর রায়, আলম চাঁদ, লাহারীমল, দিলপত সিংহ, হাজারীমল এবং আরও কয়েকজন হিন্দু দীউয়ানও অন্যান্য উচ্চ পদে নিযুক্ত হন। মুর্শিদকুলীর জামাতা ও উত্তরাধিকারী নবাব সুজা উদ্দিনের আমলেও আলম চাঁদ, জগৎ শেঠ, যশোবন্ত রায়, রাজবল্লভ, নন্দলাল এবং আরও অনেক হিন্দু কর্মচারী দায়িত্বপূর্ণ রাজপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। লক্ষ্যণীয় যে, এ সব বর্ণহিন্দু রাজা-মহারাজা, কর্মচারীরাই নবাবমহলের বিভেদের উস্কানি দিয়ে তাদেরকে বশীভূত করে নিজেরা উত্তরোত্তর অধিক ক্ষমতা লাভের প্রচেষ্টায় মেতে ওঠেন এবং মুর্শিদকুলীর দৌহিত্র সরফরাজের বিরুদ্ধে তাঁর বিহারের গভর্ণরকে সক্রিয় সমর্থন দিয়ে বিদ্রোহ ঘটান। বিদ্রোহী আলীবর্দীর হাতে ১৭৪০ সালে সরফরাজ নিহত হন। রাজা-মহারাজাদের সমর্থনে আলীবর্দী নবাব হন। ফলে স্বভাবতঃই নবাব আলীবর্দীর সময়ে রাজপদে হিন্দুদের আরও উন্নতি হয়। এই সময় চিন রায়, বীরু দত্ত, কীরাত চাঁদ ও উমেদ রায় যথাক্রমে খালাসা বিভাগের দীউয়ান

www.nagorikpathagar.org

ছিলেন। জানকীরাম ও রামনারায়ণ বিহারের দীউয়ান ও নায়েব সুবেদারের আসন লাভ করেছিলেন। রায়দুর্লভ উড়িষ্যার নায়েব সুবাদার এবং রাজবল্লভ জাহাঙ্গীর নগরের দীউয়ান নিযুক্ত হন। শ্যামসুন্দর গোলন্দাজ সৈন্যদলের প্রধান ও রামরাম সিংহ গুপ্ত পুলিশ বিভাগের প্রধান ছিলেন। রবার্ট ওর্ম লিখিয়াছেন যে, নবাব আলীবর্দী রাজকার্যে ও ব্যবসাক্ষেত্রে হিন্দুদিগকে প্রাধান্য দিয়েছিলেন এবং ইহার ফলে শাসনকার্যে হিন্দুদের প্রভাব প্রতিপত্তি স্থাপিত হয়েছিল। [রবার্ট ওর্ম, মিলিটারী ট্রানজেকশান অব দি বৃটিশ নেশন ইন বেংগল, পৃঃ ৫৩]। নবাব সিরাজউদ্দৌলাও তাহার মাতামহের নীতি অনুসরণ করেন। তিনি মোহনলালকে প্রধানমন্ত্রী ও জানকীরামকে দীউয়ানের পদে নিয়োগ করেন। রায়দুর্লভ, রামনারায়ণ, রাজবল্লভ ও অন্যান্য বর্ণহিন্দু কর্মচারী দায়িত্বপূর্ণ পদে নিযুক্ত ছিলেন। সিরাজউদ্দৌলা মানিকচাঁদ ও নন্দকুমারকে যথাক্রমে কোলকাতা ও হুগলীর ফৌজদার পদে নিয়োগ করেন। [এম, এ, রহিম, সোশ্যাল এন্ড কালচারাল হিষ্ট্রী অব বেঙ্গল, দ্বিতীয় খন্ড, পৃঃ ৫৪, ৫৬]। সিরাজউদ্দৌলার আমলে উপরোক্তরা সবাই বহাল ছিলেন; উপরন্তু উপ-প্রধান সেনাপতি ছিলেন মহারাজা রায় দুর্লভ।

বাংলার রাজনীতিতে মোগলাই মুসলমান ও কুলীন বর্ণহিন্দুদের পারস্পরিক সম্পর্ক ও উহার ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার বহমান ঘটনাপ্রবাহের পাশাপাশি আর একটি কর্মকান্ডের অন্তঃস্রোত ১৭ শতকের মধ্যভাগ থেকে অনেকটা অলক্ষ্যে হলেও উত্তরোত্তর প্রবল হয়ে আত্মপ্রকাশ করতে থাকে। ১৬৫১ সালে শাহজাদা সুজার কাছ থেকে সাকুল্যে বার্ষিক মাত্র ৩ হাজার টাকা সালামীর বিনিময়ে ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পনী সমগ্র বাংলায় শুল্কমুক্ত অবাধ বাণিজ্যের অভিকার লাভ করে। তখন অন্যান্য দেশী বিদেশী ব্যবসায়ীরা ক্ষেত্রবিশেষে শতকরা আড়াই টাকা, সাড়ে তিন টাকা ও পাঁচ টাকা হারে বাণিজ্যশুল্ক প্রদান করতেন। শুল্কের ক্ষেত্রে ইংরেজরা রেয়াত পাওয়ায় পণ্য ক্রয়ের উপরেই সরাসরি তাদের শতকরা ৫ টাকা হারে মুনাফা নিশ্চিত হয়ে যায়। তখন অন্যান্য বিদেশী কোম্পনীগুলোর তুলনায় ইংরেজদের ব্যবসা বিস্তৃত হতে থাকে। ১৬৬৯ থেকে ৮৪ সালের মধ্যে উইলিয়াম ব্লেক, শিয়েন ব্রিজেন, ওয়াল্টার ক্লাভেল, ম্যাথিয়ানী ভিনসেন্ট, উইলিয়াম হেজেস প্রমুখ ঈস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর প্রধান কর্মকর্তারা সুবাদার ও ফৌজদারদের ঘুষ প্রদানের মিথ্যা হিসাব দেখিয়ে কোম্পানীর তহবিল থেকে সদলবলে অর্থ আত্মসাতের মাধ্যমে ব্যক্তিগত পূঁজি গঠন করে কোম্পানীর নামেই ব্যক্তিগত ব্যবসা শুরু করেন। দেশের মুসলমান ব্যবসায়ীরা ছিলেন ইংরেজদের প্রতিদ্বন্দ্বী। একারণে ইংরেজ

www.nagorikpathagar.org

কর্মকর্তারা মুসলমানদেরকে বাদ দিয়ে বর্ণহিন্দু ব্যবসায়ীদেরকে প্রথমে পণ্য সরবরাহকারী ও যোগানদার ব্যবসায়ী হিসাবে গ্রহণ করে নেয় এবং পরে হিন্দু লগ্নীকার মহাজনদের কাছ থেকে স্থানীয় মুদ্রায় আরো পূঁজি সংগ্রহ করে তাদেরকে পরোক্ষ পার্টনার হিসাবে গ্রহণ করে নেয়। এসব হিন্দু ব্যবসায়ীরা দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে ইংরেজ কুঠিগুলোতে মাল পৌছে দেবার সময় নিজেদের ব্যক্তিগত ব্যবসায়েও কোম্পানী শুল্ক মুক্ত ব্যবসায়ের দস্তক (ট্রাঞ্জিট পারমিট) ব্যবহার করতে থাকে। এবং শুল্ক ফাঁকি দিতে থাকে। এভাবে পরিচালিত তাদের চোরাচালানীর মুনাফা তারা ইংরেজদের প্রধান কর্মকেন্দ্র কোলকাতায় নিয়ে সঞ্চয় করে। ১৫৯৫ সালে গোবিন্দপুর, সূতানটি ও কলিকাথা (কলিচুন ও কাথাচুন তৈরীতে ব্যবহৃত ঝিনুক-শামুকের ডোবা বিল) গ্রাম তিনখানিতে প্রতিষ্ঠিত কোলকাতা বন্দর সারা বাংলার চোরাচালানীর পয়সায় এভাবেই ১৭৫৭ সালের মধ্যে ১ লক্ষ অধিবাসীর নগরীতে পরিণত হয়। ১৭৫৭ সালে কোলকাতা যুদ্ধের কালে মাদ্রাজ থেকে আনিত নতুন সেনা ইউনিটসহ কোলকাতায় ৮১১ জন সামরিক ও তৎসহ দ্বিগুনসংখ্যক বেসামরিক ইংরেজ কর্মচারীর অবস্থিতি ধরলেও তাদের মোট সংখ্যা তৎকালীন কোলতাকার মোট জনসংখ্যার $২\frac{১}{২}$% শতাংশও ছিল না। মুষ্টিমেয় ইংরেজকে সামনে রেখে আসলে কোলকাতা নগরী গড়ে তুলেছিলেন সারা বাংলার বর্ণহিন্দু রাজা-মাহারাজা শেঠ বণিকেরা। এটা ছিল মুসলিম শাসন উৎখাতের জন্য দক্ষিণ-পশ্চিম বাংলায় নির্মিত তাদের শক্তিশালী ঘাঁটি -ষড়যন্ত্র ও প্রস্তুতি গ্রহণের প্রধান কেন্দ্র। কোলকাতা মহানগরীতে বর্ণহিন্দু একাধিপত্য যে কত ব্যাপক ছিল তার প্রমাণ আমরা দেখতে পাই ১৯৪৭ সালের বাংলা বিভাগের প্রাক্কালেও। ১৯৩৭ সাল থেকে একটানা ১০ বছর মুসলিম মন্ত্রিসভার আমলে নানামুখী পৃষ্ঠপোষকতা দিয়ে কোলকাতায় মুসলমানদেরকে এনে জমায়েত করার পরেও '৪৬-এ দাংগার সময় দেখা যায় যে, মহানগরীতে মুসলমান অধিবাসীর সংখ্যা মোট জনসংখ্যার শতকরা ২৫ ভাগের কম [Mountbaten and the partition of India, lary & colins, Minits of the Viceroris Staff Meeting April, 25, 1977- P. 142] ১৮ শতকের প্রথম দশকেই, কলকাতার পত্তন-পর্বেই, সারা বাংলার বর্ণহিন্দুরা উহাকে তাদের জন্য নিরাপদতম স্থান ভাবতে শুরু করেন। ১৭০৩ সালে ভূষণার (নড়াইল) বিদ্রোহী জমিদার রাজা সিতারাম পরাজিত হবার পর তার পরিবার পরিজনেরা সমস্ত বিত্তসম্পদ নিয়ে পালিয়ে গিয়ে কোলকাতায় আশ্রয় গ্রহণ করে।

www.nagorikpathagar.org

১৭৫৭ সাল পর্যন্ত কলকাতার এ বৈশিষ্ট্য অব্যাহত থাকে। এবং তা রাখার জন্য মুর্শিদকুলী খাঁর নবাবী আমলে এবং নবাব সূজাউদ্দীন ও নবাব আলীবর্দীর শাসনকালে শুল্ক ফাঁকি দেওয়া ও চোরাচালানীর কারণে ইংরেজদের সাথে নবাবের যতবার বিরোধ দেখা দিয়েছে, জগৎশেট, উমি চাঁদ বাবুরা আপোষ ফয়সালা করে দিয়ে কোলকাতার বিকাশ অব্যাহত রেখেছেন। এমনকি কোলকাতাকে সুরক্ষিত দুর্গে পরিণত করার জন্য ১৭৪২ সালে বাবু ব্যবসায়ীরা চাঁদা তুলে মারাঠা প্রাচীর তৈরী করান। সিরাজউদ্দৌলার আমলেও রাজবল্লভের পুত্র কৃষ্ণদাস (কৃষ্ণ বল্লভ) নবাবের ঢাকাস্থ যাবতীয় সম্পদসম্পত্তি অপহরণ করে পালিয়ে গিয়ে কোলকাতাতেই আশ্রয় নেয়। পলাশী যুদ্ধের প্রাক্কালে ইংরেজদের সাথে সিরাজউদ্দৌলার বিরোধের এটিও ছিল অন্যতম তাৎক্ষণিক কারণ।

মুর্শিদকুলী খাঁ পার্টনারশীপ প্রশাসন ব্যবস্থার মাধ্যমে হিন্দু অভিজাত শ্রেণীর রাজা-মহারাজাদের মন জয় করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু ফল হলো উল্টো। মোগল যুগের প্রারম্ভ থেকে সিঁড়ি বেয়ে বেয়ে উচ্চ মঞ্চে আরোহণের পর তারা ব্যগ্র হয়ে উঠলেন মুসলমানদের কাছ থেকে সবকিছু কেড়ে নিতে। রবার্ট ওর্ম মন্তব্য করেছেন, "দেশ শাসনের সকল বিভাগে হিন্দুদের প্রভাব এতো ব্যাপকভাবে প্রসারিত হয়েছিল যে, তাদের সাহায্য ব্যতীত বা তাদের অজ্ঞাতে সরকারের কোন কাজই চলতে পারতো না।" [রবার্ট ওর্ম, পূর্বোক্ত, দ্বিতীয় খন্ড, পৃঃ ২৯] এস,সি হীল আরও স্পষ্টভাবে লিখেছেন যে, ১৭৫৪ খৃষ্টাব্দে স্কট তাঁর এক বন্ধুকে লিখেছিলেন, "হিন্দু রাজা ও জমিদারগণ মুসলমানদের শাসনে খুবই অসন্তুষ্ট এবং তারা মুসলমান শাসনের অবসানের জন্য সুযোগ অন্বেষণ করছে [S. C. Hill Bengal in 1756-57 ভূমিকা, পৃঃ ২৩, ১০২, ১১৬, ১৫৯]। রাজা কৃষ্ণ চন্দ্রের জীবনী লেখক রাজীব লোচন লিখেছেন যে, "হিন্দু জমিদার ও প্রধানগণ সিরাজউদ্দৌলাকে সিংহাসনচ্যুত করার জন্য ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছিলেন" [কে, কে, দত্ত, আলীবর্দী এন্ড হিজ টাইম, পৃঃ ১১৮]। পলাশী যুদ্ধের প্রাক্কালে ক্লাইভের সাথে বর্ধমান, দিনাজপুর ও নদীয়ার জমিদারদের পত্রযোগাযোগ থেকে স্পষ্ট প্রমাণ মেলে যে, অগ্রিম আনুগত্য প্রকাশ করে তারা ক্লাইভকে যুদ্ধযাত্রার দাওয়াত জানান [শীরিন আখতার, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১০৭] "নদীয়া, বর্ধমান, বিষ্ণুপুর, মেদিনীপুর, দিনাজপুর বীরভূমের রাজা-মহারাজারা মুর্শিদাবাদ সমবেত হয়ে দেওয়ান-ই সুবা মহারাজা মহেন্দ্রের কাছে অনেকগুলো দাবী পেশ করেন।-তাদের ক্রমবর্দ্ধিষ্ণু দাবী মিটাতে নবাব অপারগ

www.nagorikpathagar.org

হলে জগৎ শেঠের পরামর্শে তারা মহারাজা কৃষ্ণ চন্দ্রের নেতৃত্বে এক বৈঠকে মিলিত হয়ে সিরাজ-উদ-দৌলাকে উৎখাতের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। সভার পক্ষে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র কোলকাতায় মিঃ ড্রেকের সাথে সাক্ষাৎ করে তাকে নবাবের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রার আহবান জানান এবং সর্বমুখী সাহায্য-সহযোগিতার আশ্বাস দেন। 'Territorial Aristocracy of Bangal-the Nadia Raj; C.R. 1872 L.V., 107-110, উদ্ধৃতি শীরিন আখতার, পূর্বোক্ত, ১০৭]' সুবে বাংলার 'কুলিন' বর্ণহিন্দু রাজা-মহারাজারা আলীবর্দীকে দিয়ে নবাব সরফরাজকে উচ্ছেদ করে যেরূপ ফায়দা হাসিল করেন, নবাব আলীবর্দীর মৃত্যু মুহূর্তেও তেমনি দিওয়ান রাজবল্লভের নেতৃত্বে তাদের একদল সিরাজের বড় খালা ঘষেটি বেগমকে উস্কানি দিয়ে, সসৈন্যে সাথে করে নিয়ে মুর্শিদাবাদ আক্রমণের জন্য নগরীর দ্বারপ্রান্তে হাজির করেন। সিরাজউদ্দৌলা তাঁর খালার মন জয় করে তার সমর্থন পেয়ে যাওয়ায় দিশেহারা দেওয়ান রাজবল্লভ নিজ পুত্র কৃষ্ণ বল্লভকে দিয়ে নবাবের ঢাকাস্থ যাবতীয় অর্থবিত্ত সম্পদ-সম্ভার কোলকাতায় ইংরেজদের আশ্রয়ে পাচার করে দেন। অন্যদিকে সিরাজের খালাতো ভাই পূর্নিয়ার গভর্ণর শওকত জংকেও শ্যামসুন্দর বাবুরাই উস্কানি দিয়ে তাঁর বিরুদ্ধে অবতীর্ণ করেন।

মুর্শিদাবাদ দরবারকে ঘিরে ষড়যন্ত্রের গুটি চালছিলেন রাজা-মহারাজা, সভাসদ, উচ্চ পদস্থ 'কুলিন' হিন্দু সামরিক প্রশাসন ও রাজস্ব বিভাগীয় কর্মকর্তারা। আলীবর্দী খাঁ ও সিরাজউদ্দৌলা নিজেরা তুর্কী হলেও তাঁদের আমীর-ওমরাহরা ছিলেন মোগলাই মেজাজের, বিলাস-ব্যাভিচারের বিনিময়ে সবকিছু বিসর্জন দিতে প্রস্তুত। এদিক দিয়ে অবস্থা 'কুলিন' বাবুদের অনুকূলেই ছিল। কিন্তু অসুবিধা ছিল অন্যত্র। বাংলার বৃহত্তর জন-গোষ্ঠী ছিল বিপুলভাবে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ।

রাসূলাল্লাহর (দঃ) হিজরতেরও আগে, খৃষ্টীয় ৭ম শতকের ২য় দশক থেকে আরব বণিক ও সুফী দরবেশদের হাতে দীক্ষিত [মুহিউদ্দীন খান, ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা, সাতাশ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, পৃঃ ৩৪৫] এবং সাড়ে তিন শত বছরব্যাপী তুর্ক-আফগান শাসনামলে ব্যাপকভাবে অনার্য্য বাংগালী হিন্দু ও বৌদ্ধ সম্প্রদায় থেকে ধর্মান্তরিত মুসলমানদের সাথে বহিরাগত মুসলমানদের বংশ পরম্পরায় সংমিশ্রণে গড়ে ওঠা এসব মুসলমানেরা ছিলেন ষোলআণা বাংগালী। দেশের জনগোষ্ঠীর অপর বৃহৎ অংশ ছিল অনার্য্য "নিম্ন বর্ণের' বংগালী হিন্দু-প্রধানতঃ তফশিলী সম্প্রদায়ভুক্ত। এই

www.nagorikpathagar.org

দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে ছিল অটুট সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি; কোনো যুগেই কোন সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ হয়নি। কৃষক, কারিগর, জোতদার, তালুকদার, ছোট-খাটো জমিদারদের নিয়ে গঠিত বাংলার এই বাংগালী মুসলমান-হিন্দুর জীবন ছিল উপ-মহাদেশের অন্য সকল অঞ্চলবাসীর তুলনায় স্বচ্ছল ও সম্পদশালী। বাংলার এই জনসাধারণ ছিল শিক্ষিত, বিশেষকরে মুসলমান সমাজে একটিও অশিক্ষিত নর বা নারী খুঁজে পাওয়া অসম্ভব ছিল [উইলিয়াম হান্টার, দি ইন্ডিয়ান মুসলমান; শাহ ওয়ালিউল্লাহ আওর উনকি ইকতিসাদী তাহকিক, মওলানা ওবায়দুল্লাহ সিন্দী; নূর উদ্দিন আহমদ কৃত অনুবাদ 'শাহ ওয়ালিউল্লাহ দেহলবী ও তাঁর চিন্তাধারা' ম্যাক্সমুলারের উদ্ধৃতি, পৃঃ ১৪৮]। এসব অনার্য্য বাংগালী মুসলমান হিন্দুর উৎপাদিত নানা জাতীয় পণ্য তখন মুসলিম সওদাগরদের মাধ্যমে পর্তুগীজ, ওলন্দাজ, ফরাসী, আর্মেনীয়, ইংরেজদের হাত ঘুরে উপ-মহাদেশে, বর্হিবিশ্বে ও ইউরোপের বাজার দখল করে আছে। উর্বরা জমিতে উৎপাদিত ফসলে সুলতানী আমলে ১/১০ থেকে ৬/১০ অংশ, মোগল যুগে ১/৩ অংশ এবং নবাবী আমলে সর্বোৎকৃষ্ট জমিতে অর্ধেকাংশ খাজনা দিয়েও হিন্দু মুসলমান চাষীরা সচ্ছল ছিলেন, ২ ১/২ থেকে ৫% হারে মুল্ক দিয়েও মুসলমান সওদাগরেরা ছিলেন বিপুল সম্পদ-সম্ভারের মালিক [ডক্টর ইউসুফ হোসেন, গ্লিম্পসেস অব মিডিয়েভাল ইন্ডিয়ান কালচার; ফারুক মাহমুদ অনুদিত মধ্যযুগের পাকভারতীয় সংস্কৃতি; শীরিন আখতার, পূর্বোক্ত] তাদের কেউই মুসলিম শাসনের প্রতি বিরূপ ছিলেন না, কেউই ছিলেন না মুর্শিদাবাদের নবাবদের পতন দেখতে আগ্রহী। এ পরিস্থিতিতে পশ্চিমা কুলীন রাজা-মহারাজারা শুধুমাত্র নিজেরা কতদূর পেরে উঠবেন সে ব্যাপারে তাদের নিজেদের মনে যথেষ্ট সন্দেহ ছিলো।এ সন্দেহের কারণেই তারা সহযোগী হিসাবে গ্রহণ করেন ইংরেজদেরকে। ঘষেটি বেগম হাতছাড়া হওয়ায় ও শওকত জং নিহত হবার পর তারা সবাই মিলে ইংরেজ কোম্পানীকেই এ খেলায় যোগ্যতম রেসের ঘোড়া হিসাবে বেছে নিলেন। [সরকার, ঐ, পৃঃ ৪৮৬]। তাঁদের বিশ্বাস ছিল, মোগলদেরকে সাথে নিযে তুর্ক-আফগানদেরে উৎখাত করার মতো ইংরেজদেরকে সাথে নিয়ে মোগলাই মুসলমানদেরে উৎখাত করা সম্ভব হবে-মোগলেরা এ দেশে রয়ে গেলেও সাত সমুদ্র তের নদী পারের ইংরেজরা এদেশের মাটিতে শিকড় গাড়তে পারবে না। মুসলিম প্রাধান্য লোপ করার পর সহজেই তাদেরে বিতাড়িত করা যাবে। এ কারণেই ইংরেজদেরকে সামনে দিয়ে সর্বমুখী সহযোগিতা দান করতে থাকেন হিন্দু রাজা-মহারাজারা। কোলকাতার ৩রা ফেব্রুয়ারী ১৭৫৭ তারিখের যুদ্ধে সিরাজউদ্দৌলার বিরুদ্ধে ক্লাইভের মোট ৮১১ জন সৈন্যের পাশে তারাই দাঁড় করিয়ে দেন ১৪টি

www.nagorikpathagar.org

কামানসহ ১৩ শত এ দেশীয় সৈন্য [যদুনাথ সরকার, হিষ্ট্রী অব বেংগল, পৃঃ ৪৮২] পলাশীর প্রান্তরে ক্লাইভের ৮ শত ইংরেজ সৈন্যের সারিতে তারাই শামেল করে দেন ৮টি কামানসহ ২ হাজার ২শ' ৫০ জন দেশীয় গোলন্দাজ ও পদাতিক সৈন্য [সরকার,ঐ, পৃঃ ৪৮৭]। বৃদ্ধ অথর্ব লোভী মীর জাফরকে বেঈমানীর বেদীতে দাঁড় করিয়ে দিয়ে মুচকি হাসিতে পলাশীর যুদ্ধ নাটক উপভোগ করেন উপ-প্রধান সেনাপতি রাজা রায়দুর্লভ-আর তাঁর সঙ্গী সাথী সেই ষড়যন্ত্র নাটকের অন্যান্য ঝানু খেলোয়াড়েরা।

www.nagorikpathagar.org

পলাশীর পরের বাঁকে

পলাশীর আমবাগানে যুদ্ধ যুদ্ধ নাটক অভিনয়ের মধ্য দিয়ে বাংলার স্বাধীনতা-সূর্য অস্তমিত হয়। নেমে আসে স্বদেশী-বিদেশী লুঠেরা-দস্যুদের অবাধ লুটতরাজের অনুকূল অন্ধকার। আর তার পরিণতিতে ধ্বংস হয়ে যায় সেকালের পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা সমৃদ্ধিশালী ও সর্বাপেক্ষা শিক্ষিত একটি জাতি বাংলারমুসলমান।

চীনা রাজদূতগণ, মরক্কোর মুসাফির ইবনে বতুতা, মাহউয়ান প্রমুখ চীনা পর্যটকবৃন্দ,ইউরোপীয় পর্যটক মানুচী, দুয়ার্তে বারবোসা, মানরিক, রালফ ফিশ, মাষ্টার সীজার, বার্ণিয়ার, টাভার্ণিয়ার আলেকজান্ডার ডাউ প্রমুখ প্রদত্ত বিবরণ, সম্রাট বাবরের জীবনী, হুমায়ুনের জীবনী, আকবর নামা, আইন-ই আকবরী ইত্যাদিসহ সুলতানী ও মোগল আমলের বিপুলসংখ্যক ঐতিহাসিকের বর্ণনা এবং সতেরো ও আঠারো শতকের বাংলায় ব্যবসারত পর্তুগীজ, ওলন্দাজ, আর্মেনীয় ফরাসী ও ইংরেজ কোম্পানীগুলোর হিসাব-কিতাব ও চিঠিপত্র এবং তাদের কর্মচারীদের ব্যক্তিগত চিঠি থেকে তার ভূরি ভূরি তথ্য-প্রমাণ আজ উদ্ধার হয়েছে। তৎকালীন ইংরেজ পন্ডিতদের লেখা মূল গ্রন্থগুলোকে রেফারেন্স বা বায়া দলিল হিসেবে ব্যবহার করে গত একশত বছর ধরে কলকাতায়ী বর্ণহিন্দু বাবু বুদ্ধিজীবীদের রচিত ইতিহাস গ্রন্থগুলোতে অবশ্য এসব তথ্য খুঁজে পাওয়া অসম্ভব। তাঁরা ঘটনাটিকে চিত্রিত করেছেন মীর্জা জাফর আলী খাঁর নেতৃত্বে একদল বিশ্বাসঘাতকের অপকীর্তির ফলশ্রুতিতে তেজোদৃপ্ত দৃঢ় চরিত্র ইংরেজদের হাতে দুশ্চরিত্র সিরাজউদৌলা ও তার অনুসারী অনুসংগীদের পরাজয় বলে। তারা কেউ কেউ ঘটনাটির বর্ণনা করেছেন একটি শুভ "বিপ্লব" বলে [An advanced History of India, Majumder, Roychowdhury & Datta]। বাবুদের লিখিত এসব "তথ্যভিত্তিক" বক্তব্যের মূলকথা মেনে নিয়ে আমাদের কলেজপাঠ্য ইতিহাসের কোন কোন লেখক বড় জোর সাহস করে এটুকু বলেছেন যে, ইংরেজরা মুসলমানদের কাছ থেকে বাংলার মসনদ কেড়ে নিতে হিন্দু অমাত্যবর্গ ও প্রভাবশালী ব্যক্তিদের সহযোগিতা গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু আসলে ব্যাপারটা সম্পূর্ণ এর উল্টো। বাংলার মুসলিম শাসন উৎখাতের উদ্যোগ গ্রহণ করেন, ইংরেজরা নয়-বাংলার রাজা মহারাজা বর্ণহিন্দু বাবুরা। একটানা ৪০ বছর (১৭১৭-৫৭) ধরে নিরবচ্ছিন্ন ও পরিকল্পিত প্রয়াস চালিয়ে তা সফল করেছিলেন বাংলার নবাব

www.nagorikpathagar.org

দরবারের প্রভাবশালী বর্ণহিন্দু রাজা, মহারাজা, অমাত্যবর্গ, উচ্চপদস্থ বর্ণহিন্দু সামরিক ও বেসামরিক কর্মকর্তাবৃন্দ এবং সারা বাংলার অপ্রতিহত ক্ষমতার অধিকারী কুলীন হিন্দু জমিদার ও বণিক শ্রেণী। এ কাজে তারাই ইংরেজদের সহযোগিতা গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু অদৃষ্টের পরিহাস, বাংলার সিংহাসন দখলের অভিযানে ইংরেজদেরকে সামনে রেখে যাবতীয় কর্মকান্ডের ইন্তেজাম বাবুরা করলেও, হাতের কাছে সাজানো সিংহাসন পাবার পর ইংরেজরাই তাতে বসে পড়েন এবং সহযোগিতার জন্যে এগিয়ে দেয়া বাবুদের কাঁধের ওপর পা রেখে সিংহাসনে নিজেদের অবস্থান সুদৃঢ় করেন। অবশ্য রাজা মহারাজা বাবুরা তাতেই খুশি ছিলেন। কেননা তাদের লক্ষ্য ছিল সাড়ে পাঁচ শত বছর ধরে বাংলার মাটিতে অব্যাহত প্রাধান্যে বিরাজমান মুসলমানদেরকে উৎখাত ও নির্মূল করা। তারা জানতেন, বাংলার মাটিতে লালিত বর্ধিত সংখ্যাগুরু মুসলমানদেরকে নির্মূল করা সম্ভব হলে, সাত সমুদ্র তেরো নদী পারের গুটিকয়েক ইংরেজকে এক সময় হটিয়ে দেয়া সহজ হবে। এ কারণে সারা বাংলায় মুসলমানদের উপর চালিত সর্বমুখী লুটতরাজ, জুলুম-নির্যাতনে তারা ছিলেন ইংরেজদের বিশ্বস্ত ও অনুগত জুনিয়র পার্টনার। পলাশী-উত্তর অধ্যায়ে তাদের লুন্ঠন ও নির্যাতন এমনি উৎকট পাশব রূপ পরিগ্রহ করে যে, খোদ বৃটিশ পার্লামেন্টের সদস্যরা পর্যন্ত ঈস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর ভাগ্যান্বেষী কর্মকর্তাদের নিন্দা ভাষণে সোচ্চার হয়ে ওঠেন। দক্ষিণ এশীয় উপমহাদেশে বৃটিশ সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা হয়েও লর্ড ক্লাইভ ও ওয়ারেন হেস্টিংসকে স্বদেশে মর্মন্তুদভাবে নাজেহাল হতে হয়।

সেকালের ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর আর্থিক মদদে পালিত হয়ে বা সরকারী উচ্চ পদে আসীন থেকে যেসব ইংরেজ বুদ্ধিজীবীরা ইতিহাস রচনা করেন,তাদের লক্ষ্য ছিল একদিকে কোম্পানী পক্ষীয় দেশী-বিদেশী ব্যক্তিবর্গের অপরাধ খন্ডন ও মাহাত্ম্য কীর্তন এবং অন্যদিকে তাদের প্রতিপক্ষ মুসলিম ব্যক্তিত্বের চরিত্র হনন করে যাবতীয় ক্রিয়াকলাপের অপরাধমূলক দায়-দায়িত্ব তাদের কাঁধে চাপিয়ে দেয়া। সে কাজ সুচারুরূপে সম্পন্ন করার ব্যাপারে ইংরেজ ঐতিহাসিকেরা সাধ্যমতো চেষ্টা করেছেন। পরবর্তীতে পলাশী যুদ্ধের এক শতাব্দী পর কোম্পানীর 'জুনিয়র পার্টনার' বর্ণহিন্দু বাবুদের বংশধরেরা বুদ্ধিজীবীর স্তরে উন্নীত হবার পর তারাও দু'হাতে কলম চালিয়ে 'সিনিয়র পার্টনার'দের উদ্ভাবিত ও পরিবেশিত বানোয়াট যুক্তি ও তথ্যাবলীকে সাজিয়ে গুছিয়ে ঠাস-বুনুনীর ইতিহাস রচনা করেছেন। এ শতকের ৪০-এর দশক পর্যন্ত তারা সে ধারা অব্যাহত রেখেছেন। এ ক্ষেত্রে বাবু ঐতিহাসিকদের দিকপাল

www.nagorikpathagar.org

স্যার যদুনাথ সরকার, বাবু রমেশ চন্দ্র মজুমদার, ডঃ কালিকারঞ্জন কানুনগো, বাবু নিরোধ ভূষণ রায়, ডঃ সুধীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, ডঃ সুরেন্দ্র নাথ সেন, বাবু এইচ, সি, রায় চৌধুরী, বাবু কালিকীঙ্কর দত্ত প্রমুখেরা কেউই এ ঐতিহ্যের ধারা বদল করেননি–তাতে আমাদের অবাক হবার কিছু নেই। কিন্তু বাংলাদেশী বুদ্ধিজীবীদের কেউ কেউ যখন বৃটিশ–বর্ণহিন্দু ঐতিহাসিকদের ইতিহাসে বাঙ্গালী মুসলমানদের গৌরবগাঁথা কিংবা বাংলার বস্তুনিষ্ঠ ও তথ্য–নির্ভর ইতিহাস পেতে চান তখন সত্যিই অবাক হতে হয়।

বিষয়টি খোলাসা করার জন্য আমরা একটা তুলনামূলক চিত্রের সাহায্য নিতে পারি। ধরা যাক, আমার দাদা–পরদাদারা ছিলেন অঢেল বিত্ত সম্পদের মালিক। চোখ ধাঁধানো বিলাস সামগ্রীতে সজ্জিত তাদের সুরম্য আকাশচুম্বি প্রাসাদ ছিল নয়নাভিরাম। কামরাগুলোতে যেমন ছিল আলমিরা সিন্দুকের সারি, দহলিজে তেমনি ছিল শ্রেণীবদ্ধ মড়াই ভরা ধান চাউল। বাড়ীর সদরে অন্দরে শানবাঁধা পুকুর, অদূরের সড়কে ষোল ঘোড়ায় টানা গাড়ি, নদীর ঘাটে ময়ূরপঙ্খী নাও–এর বহর। বাড়ীর ঘর–বারান্দা, অঙ্গন–প্রাঙ্গণ লোকজন, চাকর–চাকরাণী, অতিথি–মুসাফির, আগত–অভ্যাগতের ভিড়ে মুখরিত, কলকোলাহলে জমজমাট। দূরবর্তী এলাকা থেকে যেসব লোকেরা কার্যব্যাপদেশে, মুসাফির ও পথচারী হিসাবে, আত্মীয় সুবাদে বা চাকর–বাকর কর্মচারী ইত্যাদিরূপে সে বাড়ীতে আসতো এবং অনেক সময় নানা কারণে কিছুকালের জন্য বসবাস করতো। স্ব স্ব এলাকায় ফিরে গিয়ে তারা আমার দাদা–পরদাদার সমৃদ্ধি প্রাচুর্য ও শানশওকতের বিস্ময়কর বর্ণনা দিতো। তারপর আমার দাদা–পরদাদারই কিছু সংখ্যক ঈর্ষাপরায়ণ আশ্রিত–অনুগৃহীত ব্যক্তি অন্তর্দাহে জ্বলে জ্বলে, ধান–কিনতে–আসা ব্যাপারীদের সূত্রে সুদূরের এক দস্যুদলের সাথে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়ে, পরদাদাদের ভ্রাতৃবিরোধের সুযোগ নিয়ে এক রাত্রিতে তাদের উপর চড়াও হলো, তাদেরকে হত্যা করলো। তারপর বাড়ীর যাবতীয় বিত্তসম্পদ, আলমারী–সিন্দুক, খাট–তক্তপোষ, তাকভর্তি গ্রন্থরাজি সবকিছুই লুণ্ঠন করে প্রধান অংশ দূরাগত দস্যুদেরকে দিয়ে নিজেরাও এক অংশ কব্জা করলো। কালে আমাদের দাদাদের অপ্রাপ্ত বয়স্কতার সুযোগ নিয়ে বাড়ীর ইট–পাথর পর্যন্ত খুলে নিয়ে নিজেদের জন্য ভবন নির্মাণ করলো এবং আমার বাপ–চাচাদেরকে বানালো ফাই–ফরমাসের চাকর–নোকর, মুটে –মজুর। তিন পুরুষব্যাপী প্রচারণায় আমার গ্রামবাসী তরুণ প্রজন্মের মনে ভ্রান্ত বিশ্বাস জন্মিয়ে দিল যে আমরা ভাই–ভাতিজারা বংশ পরম্পরায় তাদের সেবাদাস। এমন পরিস্থিতিতে তাড়া খেয়ে বা ঘর পালিয়ে দূরবর্তী

www.nagorikpathagar.org

এলাকাগুলোতে ঘুরতে গিয়ে, যদি আমার কোন এক ভাই সর্বত্রই শুনতে পায় আমার পূর্বপুরুষের গৌরবগাঁথা,তাদের কাছ থেকে শোনা কাহিনীর সত্যতা আমি কিভাবে যাচাই করবো? আমি কি আমার দাদা–পরদাদার বাড়ী লুন্ঠনকারী ডাকাতদের বংশধর বা তাদের সহযোগীদের বংশধর আমার হাল আমলের মনিব প্রতিবেশীদেরকেই জিজ্ঞেস করবো যে, আমার দাদার প্রাসাদে কতগুলো কামরা ছিল, কামরাগুলোতে কতগুলো সিন্দুকভর্তি সোনাদানা ছিল এবং দহলিজে সারিবদ্ধভাবে কতগুলো ধানের মাড়াই ছিল? আমার প্রশ্নের উত্তরে তারা কি সঠিক উত্তর দিয়ে নিজেদের বাপ–দাদাদের কলংকিত চরিত্র প্রকাশ করতে পারে? পারে না।

ব্যক্তিগত খান্দানের মতো ইতিহাস–ঐতিহ্যের প্রশ্নেও একই কথা প্রযোজ্য। তবু আমরা সে বেকুবিই করে চলেছি।

অহেতুক ঈর্ষার অন্তর্দাহে জ্বলে ব্রাহ্মণ্যবাদী বর্ণহিন্দুরাই বাংলায় মুসলিম শাসনের পতন ঘটিয়েছিল ইংরেজদের সহযোগিতায়। এ কাজে বর্ণহিন্দুর ভূমিকাই ছিল মুখ্য। ইংরেজরা সারা বাংলা মুলুককে শুল্ক না দিয়ে বাণিজ্য করার উদ্দেশ্যে চালিত নিজেদের শঠতা প্রবঞ্চনার জন্য ১৬৮৩ সাল থেকেই সুবাদার শায়েস্তা খানের সাথে বিরোধিতায় লিপ্ত হয়। মুর্শিদকুলি খানের সুবাদারী ও নবাবী আমলেও কোনদিন তাদের সাথে সুসম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। নবাব শুজাউদ্দিনের সাথেও বিরোধের সম্পর্কই বহাল ছিল। ১৭৪২ সালে আলীবর্দী খাঁর সাথে তাদের বিরোধ যুদ্ধাবস্থায় উপনীত হয়। কিন্তু তারা পলাশী যুদ্ধের পূর্বে বা প্রস্তুতি পর্বেও কোনদিন এদেশের শাসন ক্ষমতা হস্তগত করার আশা পোষণ করেনি। শেষ পর্যায়েও তাদের লক্ষ্য ছিল তাদের প্রতি সহানুভূতিশীল কোন ব্যক্তিকে ক্ষমতায় বসিয়ে বাণিজ্যিক মুনাফা ও চৌর্যবৃত্তির সুযোগ হাসিল করা। তারা লক্ষ্য করে যে, বর্ণ হিন্দুরা মুসলিম শাসনের অবসান ঘটাতে বদ্ধপরিকর। তাই তাদেরকে সহযোগিতা দিয়ে ইংরেজরা নিজেদের স্বার্থ উদ্ধারে তৎপর হন। [কোলকাতা দুর্গের পরিকল্পনা প্রণেতা কর্ণেল স্কটের সচিব চালর্স এফ,. নোবলের বর্ণনা, মোহর আলী, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৬৫০]।

বর্ণহিন্দুরাও আপন ঐতিহ্যের অনুসরণে কুটিল নীতির আশ্রয় নিয়ে ইংরেজদেরকে সামনে রেখে নিজেদের লক্ষ্য হাসিলে এগিয়ে যায়। ইংরেজদেরকে তারা দেশীয় সৈন্য সংগ্রহ করে দেয়; কোলকাতা, ঢাকা, কাশিম বাজার ও রাজশাহী কুঠির মাধ্যমে সারা বাংলায় ইংরেজদের সাথে

www.nagorikpathagar.org

ব্যবসারত ৮৩ জন ধনাঢ্য বর্ণহিন্দু বণিকের চাঁদার টাকায় মারাঠা প্রাচীর নামক প্রতিরক্ষা প্রাচীর ও পরিখা নির্মাণ করে কোলকাতা নগরীকে সুরক্ষিত করে সমগ্র বাংলা মুলুক থেকে বর্ণহিন্দু ধনিক-বনিক-প্রভাবশালী ব্যক্তিদেরকে নিয়ে সেখানে জমায়েত করা হয় [Beng. Pub. Cons. 6th July, 1736 &15th December, 1740; উদ্ধৃতি মোহর আলী, পৃঃ ৬৫০]। কোলকাতায় অনুষ্ঠিত গোপন বৈঠকে এই মর্মে সিদ্ধান্তগৃহীত হয় যে, মুসলমান শাসন উৎখাতের পর বর্ধমানের মহারাজা ত্রৈলোক্য চন্দ্রকে বাংলার (দক্ষিণ-পশ্চিম বাংলার) রাজা ও মহারাজা নন্দ কুমারকে বাংলার প্রধানমন্ত্রী করা হবে [চন্ডীচরণ সেন, মহারাজা নন্দকুমার ও শতবর্ষ পূর্বে বংগের সামাজিক অবস্থা, কোলকাতা, ১৮৮৫ ইং]। অন্যদিকে নদীয়ার মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র দেবের উদ্যোগে মুর্শিদাবাদে স্বরূপচাঁদ জগৎ শেঠের গৃহে ইংরেজ প্রতিনিধি মিঃ ওয়াটসন-এর উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত গোপন বৈঠকে 'ধীরে চল নীতি'র অনুসরণে সিরাজ-উদ-দৌলাকে উৎখাত করে আপাততঃ তাঁরই প্রবীণ আত্মীয়কে শিখন্ডী নবাব বানাবার পরিকল্পনা গৃহীত হয় [রাজীব লোচনের লেখা মহারাজা কৃষ্ণ চন্দ্রের জীবনী গ্রন্থ দ্রষ্টব্য]। অতঃপর মহারাজাদের সরবরাহ করা সেনাবাহিনীর পুরোভাগে ৮ শত গোরা সৈন্য নিয়ে লর্ড ক্লাইভ কোলকাতা থেকে অগ্রসর হন নবাবের রাজধানী মুর্শিদাবাদ আক্রমণ করতে। পথিমধ্যে যুদ্ধ হয় মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের জমিদারীভুক্ত পলাশী প্রান্তরে। জগৎ শেঠের নেতৃত্বাধীন দরবারী অমাত্যবর্গের পরিকল্পিত মিথ্যা প্রচারণার শিকার হয়ে নবাব সিরাজ-উদ-দৌলা তখন তাঁর নিজস্ব মূল সেনাবাহিনীকে নিয়োজিত রেখেছিলেন পশ্চিম বিহার সীমান্তে আহমদ শাহ আবদালীর বাহিনীকে মোকবিলার জন্য, আর মহারাজাদের মনসবভুক্ত ও তাদের সরবরাহকৃত সৈন্যদল নিয়ে পলাশীতে হাজির হন ইংরেজদেরকে মোকাবিলার জন্য [হীল, সিরাজ-উদ-দৌলা টু ওয়াটসন, ২য় খন্ড, পৃঃ ২৪১]। ফলে নবাবের পরাজয় ঘটে এবং সেখান থেকেই শুরু হয় সারা বাংলায় অবাধ লুটতরাজের অধ্যায়-বৃটিশ বর্ণহিন্দু যৌথ অভিযান।

স্মর্তব্য যে, ১৭৫৭ সালের ২৩শে জুন তারিখে যেদিন পলাশীতে বাংলার ভাগ্যবিপর্যয় ঘটে সেদিনও বাংলা মুলুক ছিল সারা পৃথিবীতে সবচেয়ে সমৃদ্ধ ও সম্পদশালী দেশ। তখনও বাংলার বার্ষিক রফতানী বাণিজ্যের পরিমাণ ছিল তৎকালীন মুদ্রায় সাড়ে সাত কোটি টাকা ও বর্তমান মুদ্রামানে পনেরো হাজার কোটি টাকা। কিঞ্চিদধিক আড়াই কোটি অধিবাসী অধ্যুষিত এই বাংলার, অনধিক এক হাজার কোটি টাকার আমদানী ব্যয় বাদ দিয়ে বৈদেশিক মুদ্রায়

www.nagorikpathagar.org

নীট আয় ছিল তৎকালীন সাত কোটি টাকা ও বর্তমান মুদ্রামানে প্রায় চৌদ্দ হাজার কোটি টাকা। আর তার পাশাপাশি তাঁত শিল্পের দক্ষ কারিগরদের মাসিক আয় ছিল তৎকালীন মুদ্রায় সাড়ে সাত টাকা, ওস্তাগর, সূতার প্রভৃতি দক্ষ শ্রমিকদের মাসিক ৪/৫ টাকা এবং একেবারে অদক্ষ অপদার্থদের জন্য নিম্নতম মাসিক মজুরি ছিল ২ টাকা। অথচ নিত্য ব্যবহার্য জীবনোপকরণের মূল্য এতো কম ছিল যে পাঁচ সদস্য বিশিষ্ট একটি পরিবারের ভাত, মাছ, গোশত, দুধ, ঘি, চিনি ইত্যাদি খেয়ে সাধারণ মানের কাপড় পরে একমাস চলার জন্যে প্রয়োজন হতো মাত্র ১ টাকা ৪ আনা। [বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস, আবদুর রহীম, পৃঃ ৫১৫]

নবাব ওমরাহ থেকে শুরু করে বাংলার পল্লীবাসী প্রতিঘরেই তখন কিছু না কিছু পরিমাণ সোনা রূপার মোহর-তংকা সঞ্চিত ছিল। মুর্শিদকুলী খাঁর শাসনকাল থেকে দীর্ঘ ৫৫ বছরের সঞ্চয় একত্রিত হয়ে নবাব সিরাজ-উদ-দৌলার কোষাগারে পূর্নিয়া যুদ্ধের পর সঞ্চিত ছিল সার্জন ফোর্থের প্রদত্ত হিসাব মতে মনিমুক্তা হিরা জহরের মূল্য বাদ দিয়ে, তৎকালীন মুদ্রায় ৬৮ কোটি টাকা অর্থাৎ বর্তমান মুদ্রামানে ১,৩৬,০০০,০০০০০০০/- (এক লক্ষ ছত্রিশ হাজার কোটি টাকা)। [S. C. Hill, Bengal in 1757-67, P,108] মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বাজেটের সাথে তুলনীয়।

পলাশীর নাটক শেষ করে সিরাজ-উদ-দৌলারই দীওয়ান রামচাঁদ বাবু মুনশী নবকিষেণ, লর্ড ক্লাইভ ও মীর জাফরকে নিয়ে নবাবের কোষাগারে হাজির হন বিত্ত-সম্পদ লুট করার জন্যে। দীওয়ান বাবুর তালিকার সাথে মিলিয়ে প্রাপ্ত সম্পদ তারা ভাগ বাঁটোয়ারা করে নেন। সিরাজউদ্দৌলার প্রাসাদে ও অন্দরমহলে রক্ষিত সম্পদ ভাগ করে নেন দীওয়ান রামচাঁদ, মুনশী নবকিষেণ, মীর জাফর খান ও আমীর বেগ খান [সিয়ারুল মুতাখখেরীন, (অনুবাদ), দ্বিতীয় খন্ড, পৃঃ ২৩৭] সিয়ারুল মুতাখখেরীনের লেখক গোলাম হোসেন ছিলেন ইংরেজদের পোষ্য খায়ের খা; তার হাত দিয়েই পরিকল্পিতভাবে এরূপ তথ্য লেখানো হলো যে ক্লাইভ হাজির থেকেও লুঠে অংশ নিলেন না-সব কিছু লুটে নেন দু'জন হিন্দুর সাথে মিলে দুজন মুসলমানও। নইলে তিনিই তো লিখে রেখে গেছেন যে, ১৭৬৫ সালে মীরজাফর খান কপর্দক শূন্য হয়ে ঋণ রেখে মারা যান। [সীয়ারুল মুতাখখেরীন, ২য় খন্ড পৃঃ ২৩]। অথচ আমরা জানি কর্নাটকে লুটতরাজের হোতা কর্ণেল রবার্ট ক্লাইভ ও এ্যাডমিরাল ওয়াটসন সাহেব একযোগে বাংলায় প্রবেশের পথেই পলতা নৌঘাটির উপকণ্ঠে জাহাজে বসেই পরস্পর অঙ্গীকারবদ্ধ হন যে, বাংলায় তারা

www.nagorikpathagar.org

একযোগে লুটপাট চালাবেন এবং লুণ্ঠিত বিত্তসম্পদ সমান সমান ভাগ করে নেবেন। [অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, সিরাজউদ্দৌলা, পৃঃ ২৫০]

পক্ষান্তরে ১৭৫৮ সালে মাসিক ৬০ টাকা বেতনে কোম্পানীর চাকুরীতে নিযুক্ত হয়ে ১৭৬৮ সালে মৃত্যুকালে রামচাঁদ, যে সম্পত্তি রেখে যান তার মধ্যে ছিল নগদ ৭২ লক্ষ টাকা, ১৮ লক্ষ টাকার ভূ-সম্পত্তি ও ২০ লক্ষ টাকার হীরা জহরত অর্থাৎ একুনে তৎকালীন মুদ্রায় ১ কোটি ১৮ লক্ষ ও বর্তমান মুদ্রামানে ২,৩৬০, ০০০০০০০/-(দুই হাজার তিনশত ষাট কোটি) টাকা এবং বড় আকারের ৮০টি স্বর্ণ নির্মিত ও ৩২০টি রৌপ্য নির্মিত কলসী। আর ৬০ টাকা মাসিক বেতনে ক্লাইভের অধীনে কর্মরত নবকিষেণ মায়ের শ্রাদ্ধে ব্যয় করেন তৎকালীন মুদ্রায় ৯ লক্ষ টাকা বর্তমান মুদ্রামানে ১৮০,০০০০০০০/- (এক শত আশি কোটি) টাকা। এবং মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের পোষা বানরের বিবাহ উৎসবে ব্যয় হয় তৎকালীন ১ লক্ষ টাকা বর্তমান মুদ্রামানে ২০ কোটি টাকা [সীয়ারুল মুতাখখেরীন, ঐ]। নবাব সিরাজ-উদ-দৌলার আত্মীয়-স্বজন এবং তার পক্ষীয় আমীর ওমরাহরাও সেকালের অনুপাতে অনেক বিত্তসম্পদের মালিক ছিলেন। তারা সবাই, এমনকি সেই সঙ্গে মীর জাফর, মীর কাসিমের আত্মীয়-স্বজনেরাও সব সম্পদ সম্পত্তি হারিয়ে মাত্র দুই দশকের মধ্যেই বিস্মৃতির অন্ধকারে হারিয়ে যান। এ অর্থবিত্তের মোটা অংশ লুণ্ঠন ও শোষণের পথ ধরে বিলেতে পাচার হয়ে ১৭৮৫ সালের মধ্যেই সারা ইংল্যান্ডে অসংখ্য ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠানের অভ্যুদয় ঘটায় ঠিকই, কিন্তু অবশিষ্ট অংশ অবশ্যই জুনিয়র পার্টনার বাবুদের হাতে চলে যায়। সারা বাংলার উচ্চ শ্রেণীভুক্ত অভিজাত ব্যক্তিদের কাছ থেকে লুণ্ঠিত সম্পদ-সম্পত্তির পরিমাণ যদি নবাবের সম্পত্তির অর্ধেকও হয় তাহলেও শুধুমাত্র সরাসরি লুণ্ঠনের মোট পরিমাণ দাঁড়ায় দুই লক্ষ কোটি টাকা। আজকের দরিদ্রতম দেশ বাংলার কোন মুসলমান সন্তানের পক্ষে এটা বিশ্বাস করাও অসম্ভব। কিন্তু অবিশ্বাস্য হলেও এটাই সত্য। এবং আরো বিস্ময়করভাবে সত্য যে, পরবর্তী একশত বছর ধরে বাংলার মুসলমান ও শূদ্র সম্প্রদায়ের নিকট থেকে নানাভাবে লুণ্ঠিত শোষিত মোট বিত্ত-সম্পদের তুলনায় এই দুই লক্ষ কোটি টাকাও আদৌ একটা ধর্তব্য পরিমাণ নয়। তবে তা উপলব্ধির জন্য আমাদের পলাশী যুদ্ধের প্রাক্কালীন বাংলার আর্থ-সামাজিক অবস্থা সম্পর্কে কিঞ্চিৎ ধারণা থাকা অপরিহার্য।

পলাশী যুদ্ধের প্রাক্কালে বাংলার জনসংখ্যা ছিল মোটামুটি পৌনে তিন কোটির কিছু কম। তাদের সংখ্যাগুরু অংশ ছিল মুসলমান। দ্বিতীয় বৃহত্তর অংশ

www.nagorikpathagar.org

ছিল অনার্য বাংগালী শূদ্র সম্প্রদায়। বর্ণহিন্দু কুলীন বাবুরা ছিলেন সংখ্যায় খুবই কম, কিন্তু দেশে আর্থ–সামাজিক রাজনৈতিক কাঠামোর সব গুরুত্বপূর্ণ স্থানে ছিল তাদের অবস্থান। দেশের শাসনভার ছিল মুসলমানদের হাতে কিন্তু প্রশাসনের ৬০ ভাগ দখল করে ছিলেন বর্ণ হিন্দু রাজা–মহারাজা ও কুলীনকুল এবং অবশিষ্ট ৪০ ভাগে ছিলেন মোগলাই ও বাংগালী মুসলমান। বহিরাগত এবং স্থানীয় ও মিশ্রজাত মুসলমানেরা ছিলেন সওদাগর কারিগর ও কৃষক। শূদ্র সম্প্রদায়ও প্রধানতঃ নিয়োজিত ছিলেন কারিগরি ও কৃষিকার্যে। সারা বাংলায় প্রায় ১ লক্ষ মকতব, কয়েক হাজার মাধ্যমিক বিদ্যালয় (মাদ্রাসা) ও ৮/১০টি বিশ্ববিদ্যালয় (সর্বোচ্চ মাদ্রাসা) চালু ছিল। পৃথকভাবে পড়তে আগ্রহী বর্ণহিন্দুদের জন্য ছিল পাঠশালা, চতুষ্পাঠী ও টোল। শূদ্রেরা মক্তব মাদ্রাসায় বৈষয়িক বিষয়ে লেখাপড়া করতেন। বর্ণহিন্দুরাও ফার্সী মাদ্রাসায় জাগতিক বিষয়াদিতে উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ করতেন।

সুরা ও নারীতে নিমগ্ন অধিকাংশ মোগলাই মুসলমানেরা ভোগবিলাস ও ভ্রাতৃঘাতী সংঘর্ষে লিপ্ত থাকায় রাজস্ব ও প্রশাসন পরিচালনা করতেন বর্ণহিন্দুরা। দরবারে প্রধান প্রধান অমাত্য পদে এবং ফৌজদার ও মনসবদার হিসেবে সেনা–সংগঠনের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে ছিলেন তারা অনেকেই। জমিদার হিসাবে রাজস্ব ও মফঃস্বলের আইন–শৃংখলা প্রশাসনের প্রায় সামগ্রিক দায়িত্ব ও ক্ষমতাই ছিল তাদেরই হাতে। তবে, সমগ্র সুবাহ ১৩টি চাকলায় বিভক্ত ছিল। চাকলার সামগ্রিক আইন–শৃংখলা রক্ষার দায়িত্বে থাকতেন ফৌজদার। কোন জমিদারের অধীন এলাকায় খুন–রাহাজানি, ডাকাতি, লুণ্ঠনের ঘটনা ঘটলে তাঁর কাছে জমিদারকে কৈফিয়ত দিতে হতো এবং ক্ষতিপূরণ করতে হতো। অন্যথায় ক্ষেত্রবিশেষে জমিদারী হারাবার ভয় ছিল। পলাশী যুদ্ধের পর দেশের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে ১৭৬৫ সাল পর্যন্ত বর্ণহিন্দু ও ইংরেজরা যৌথভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ ক'রে নিজ নিজ স্বার্থ হাসিল করেন। মীরজাফর ব্যর্থ ও অসহায় নবাব থাকায়, মীর কাসেম ৩ বছরে ৭টি যুদ্ধে জড়িত থাকায় এবং নাজমুদ্দৌলা পুরাপুরি শিখণ্ডী থাকায় বর্ণহিন্দু ও ইংরেজরাই কার্যতঃ সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করতে থাকেন।

পলাশী যুদ্ধের পরই মুর্শিদাবাদের কোষাগার ও প্রাসাদ লুণ্ঠিত হওয়ায় সরকার দেউলিয়া হয়ে হিন্দু জমিদার, চাকলাদারদের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েন। নবাবী লাভের জন্য ইংরেজদের দাবী অনুযায়ী ঘুষ সংগ্রহের প্রয়োজনে মীর জাফর ও মীর কাসেম এবং যুদ্ধের ব্যয় বাবদ মীর কাসেম রাজস্ব বৃদ্ধি ও

www.nagorikpathagar.org

উপ-রাজস্ব ধার্য করেন। বাড়তি রাজস্বের অজুহাতে জমিদারেরা প্রান্তিক পর্যায়ে মুসলমান ও শূদ্রাদি প্রজাদের উপর সকল প্রকার রাজস্ব বহুগুণে বাড়িয়ে দেন। দেশের অরাজক অবস্থায় তারা তখন স্বাধীন। নিজেদের মনসবী সেনাবাহিনী থেকে তারা মুসলমান সৈন্যদেরকে বিদায় দিয়ে হিন্দুদেরকে ভর্তি করে নেন। তারা পরগণা পর্যায়ে মুসলমান রাজস্ব ও শুল্ক কর্মচারীদেরকে এবং পরগনা ও চৌকি পর্যায়ে আইন-শৃংখলা বিষয়ক মুসলমান কর্মচারীদেরকে বাদ দিয়ে হিন্দুদেরকে গ্রহণ করেন-নবাব ক্ষমতাহীন থাকায় মুসলমানদের আবেদন শোনার কেউ ছিল না।

এ পরিস্থিতিতে ইংরেজরা প্রথমতঃ বৈদেশিক বাণিজ্যক্ষেত্রে সকল বিদেশী বণিকদেরকে বাংলাছাড়া করে দিয়ে মসলিন, সুতী কাপড়, রেশম ও রেশমী কাপড়, চিনি-চাউল, আফিম, সল্টপিটার ইত্যাদির রফতানীতে মনোপলি প্রতিষ্ঠা করে এবং বাজার নিয়ন্ত্রণ করে পণ্যগুলোর অভ্যন্তরীণ মূল্য অস্বাভাবিকভাবে নামিয়ে দেয়। ১৭৫৭ সালের আগে আরমেনিয়াসহ ইউরোপের ৭টি দেশের হাজার হাজার নাবিক শত শত জাহাজ নিয়ে বাংলার নদীতে নদীতে পণ্য খরিদ করে ফিরতো, অন্য সব কিছু বাদ দিয়ে কেবল মসলিন, মোটা সুতী বস্ত্র, রেশম ও রেমশী বস্ত্র ইউরোপ ও জাপানসহ সারা বিশ্বে রফতানি হতো দশ/বার হাজার কোটি টাকার। বাংলাকে বলা হতো সারা ইউরোপের বাজারগুলোর কাপড়ের গুদাম; নারী-পুরুষ, বৃদ্ধ-কিশোর মিলিয়ে অন্যূন ২৫ লাখ বস্ত্র শিল্পী নিয়োজিত থাকতেন কাপড় তৈরীর কাজে। গংগার পথে পাটনা হয়ে মধ্য ভারতে এবং করোমন্ডল উপকূলে, এমনকি পূর্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে চাউল রফতানি হতো; আফিম রফতানি হতো চীন, জাপানে, চিনি রফতানি হতো আরব, ইরান, ইরাক অঞ্চলে। সল্টপিটার প্রেরিত হতো ইউরোপে। লবণ চালান হতো মধ্য ভারত ও আসামে। মরিচ, আদা ও দারুচিনি রফতানি হতো ইউরোপে ও মধ্যপ্রাচ্যে-সব মিলিয়ে অন্যূন ১৫ হাজার কোটি টাকার পণ্য বাংলা থেকে বিশ্বের বাজারে ছড়িয়ে পড়তো। তৎকালীন পৃথিবীর সবচেয়ে সম্পদশালী দেশের এই বাণিজ্যে মনোপলি কায়েম করে, পরিকল্পিতভাবে কোম্পানী পণ্যের বাজার এতো নামিয়ে দিল যে, প্রায় ক্ষেত্রেই তা উৎপাদন ব্যয়ের চেয়েও নীচে নেমে গেল। বাংলার তাঁতী সম্প্রদায় ছিলেন মুসলমান। বর্ণহিন্দু সমাজে তাঁতীরা 'জোলা' বলে নিন্দিত বর্ণ থাকায় মুসলিম শাসনের শুরুতেই একই সঙ্গে সারা দেশে তারা ইসলাম কবুল করেন। অন্যান্য শিল্পোৎপাদন, বিশেষ করে মেদিনীপুর থেকে সন্দ্বীপ পর্যন্ত বিশাল বিস্তৃত উপকূলভাগের লবণ শিল্পে, মধ্য বাংলার চিনি শিল্পে ও বর্তমান উত্তর বাংলার

www.nagorikpathagar.org

সল্টপিটার ও লাক্ষা শিল্পে, সারা বাংলার রেশম শিল্পে নিয়োজিত ছিলেন মুসলমান ও শূদ্র সম্প্রদায়। পলাশী যুদ্ধের পর পণ্যের উৎপাদন ব্যয়ের চাইতে বিক্রয়মূল্য কম থাকায় তাদের রোজগারের পথ রুদ্ধ হয়ে গেল–কয়েক বছরেই সংসার চালাতে এবং ৪/৫ গুণ রাজস্ব দিতে দিতে তারা সর্বস্বান্ত হয়ে পড়ল। পক্ষান্তরে, ইংরেজরা বর্ণহিন্দু জমিদারদের প্রশাসনিক কর্মচারীদের পীড়নপ্রভাবকে কাজে লাগিয়ে বর্ণহিন্দু গোমস্তা, দালাল, ফড়িয়াদের মাধ্যমে সারা বাংলার গ্রামে–গঞ্জে আড়ত–গদী প্রতিষ্ঠা করলো।

এসব গদী ও আড়ত–এর বর্ণহিন্দু ম্যানেজার, গোমস্তা, দালালেরা, মহারাজা জমিদারের অধীন নায়েব গোমস্তা, থানার দারোগা, পরগণার শিকদার পাইক সিপাহী বাহিনীর সহায়তায় বলপূর্বক দাদন গ্রহণে বাধ্য করতো এবং প্রয়োজনে চাবুক মেরে উৎপাদন ব্যয়ের চাইতে কম মূল্যে তাদের তৈরী কাপড়, লবণ ও অন্যান্য সামগ্রী কেড়ে নিতো। অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে তাঁতীরা নিজেরা নিজেদের হাতের বৃদ্ধাংগুলি কেটে ফেললো এবং লবণ চাষীরা উপকূল অঞ্চল ছেড়ে পালিয়ে মধ্য বাংলায় চলে গেলো। [সুপ্রকাশ রায়, ভারতের কৃষক বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম, পৃঃ ৬৭–৯৯]

অর্থকরী রফতানি পণ্যের বাজারে যখন এই অবস্থা, নিত্য ব্যবহার্য পণ্যের বাজারে তখন ঠিক এর উল্টো পরিস্থিতি। গোঁদের উপর বিষ ফোঁড়ার সারি। দ্রব্যসামগ্রী উৎপাদিত হতো কোন না কোন বাবু জমিদারের অধীন এলাকায় এবং এক অঞ্চল থেকে অন্য অঞ্চলে যেতো তাদেরই অনেকের জামিদারীর মধ্যে দিয়ে। একই দ্রব্যের উপর তারা সবাই নানান রকম শুল্ক আদায় করতেন। নানা স্থানে প্রদত্ত রাহাদারী, নদী পারাপার, কুত খাজনা, চৌকি বা ঘাটকর, হাটকর, গুদামকর, দোকানকর ইত্যাদি বহু কর যোগ হতো মালের দামের সাথে [শিরীন আখতার, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৫৫–৫৬] উৎপাদন এলাকা থেকে বিভিন্ন জমিদারীর ভেতর দিয়ে বিক্রয় কেন্দ্রে যাবার পথে দ্রব্যসামগ্রীর উপর যে কর আদায় হতো তাতে করের পরিমাণ দাঁড়ায় উহার আসল দামের দ্বিগুণ [খাফি খান, মুনতাখাব আল–লুবাব, দ্বিতীয় খন্ড, অনুবাদ এইচ, এম, এলিয়ট ও জে ডাউসন, দি হিষ্টরী অব ইন্ডিয়া, ৭ম খন্ড, পৃঃ ২৪৮]।

সুলতানী আমলের প্রথম দিকে বাংলার জমির খাজনা ছিল প্রকারভেদে উৎপন্ন ফসলের এক দশমাংশ (খারাজ) ও এক পঞ্চমাংশ (উশর)। কালে তা সর্বোচ্চ এক তৃতীয়াংশ পর্যন্ত হয়। মোঘল যুগে আফগান জামিদারকে উৎখাত

www.nagorikpathagar.org

করে মহারাজা মানসিংহের স্বজাতীয় রাজপুত, মড়োয়াড়ী, কাশ্মীরী ও মধ্য ভারতীয় কুলীন হিন্দুদের জমিদারী প্রতিষ্ঠার পর খাজনার মোটামুটি হার ছিল উৎপন্ন সফলের নীট আয়ের অর্ধেক। বাবু জমিদারেরা সে খাজনার সাথে বেশুমার ধরনের উপখাজনা আবওয়াব আদায় শুরু করলে সম্রাট আওরঙ্গজেব ফরমান জারি করে যাবতীয় (৮০ প্রকার) আবওয়াব নিষিদ্ধ করেন [খাফি খান, মুনতাখার–উল–লুবার, ২য় খন্ড, অনুঃ ইলিয়ট এবং ডাউসন, The History of India, VII, P. 245-47] এবং খাজনা সর্বোচ্চ পর্যায়ে জমির নীট উৎপাদনের অর্ধেক নির্ধারিত করে [g. N. Sarker, Awrangjeb's farmans tr. The Revenue Rehulations of Awrangjeb I.A.S.B.-1906,11, 228, 233; N. A. Siddiqui, Land Revenue Administration, 1946] বাংলা মুলুকে বিঘাপ্রতি আট আনা ধার্য করেন। মুর্শিদকুলী খাঁর নবাবী আমলে বিঘাপ্রতি ধার্য হয় দশ আনা। ১৭৫৭ সাল পর্যন্ত সে হার মোটামুটি বহাল ছিল। ১৭২৭ সালে রাজস্ব আদায় হয় ১ কোটি ৪২ লক্ষ ৮৮ হাজার ১শ' ৮৬ টাকা (এ্যানালাইসিস অব দি ফাইনান্সেস অব বেংগল ইন ফিফথ রিপোর্ট, পৃঃ ১৮৯–১৯১)। আবাদী জমির পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়ায় ১৭০২ সালের ১ কোটি ২ লক্ষ টাকার স্থলে ১৭৫৭ সালেও রাজস্বের পরিমাণ দাঁড়ায় মোটামুটি ১ কোটি ৫২ লক্ষ টাকায়। কিন্তু ১৭৬১ সালের মধ্যেই তার পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় বিঘা প্রতি ২ টাকা হারে [দি রোল অব জমিন্দারস ইন বেংগল, শিরীন আখতার, পৃঃ ৬১]। যুদ্ধের পর টাকার তুলনায় পাউন্ডের মুদ্রামান ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পাওয়ায় ১৭৬৪–৬৫ সালে মীর জাফরের আদায়কৃত রাজস্বের পরিমাণ দাঁড়ায় ৮ লক্ষ ১৭ হাজার ৫শ' ৫৩ পাউন্ড [আর, সি, দত্ত, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৩৯–৪৮, ভূমিকা ৯; উদ্ধৃতি আবদুর রহীম, বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস, পৃঃ ৪৮]।

অথচ আশির দশকে বাংলার বাবু মহারাজা জমিদারেরা কোম্পানী সরকারকে খাজনা দিতেন ৩৭ লক্ষ ৭৫ হাজার পাউন্ড, কিন্তু তারা প্রজাদের কাছ থেকে আদায় করতেন ১ কোটি ৩০ লক্ষ পাউন্ড অর্থাৎ মীর জাফরের শাসনালের তুলনায় ১৬ গুণ এবং মুর্শীদকুলীর নবাবী আমলের (তৃতীয় দশকের) তুলনায় ৩২ গুণ [পি, ই, রবার্টস, পৃঃ ৫১]।

তখন হ্রাসপ্রাপ্ত মুদ্রামানের হিসাবে ধরলেও প্রতি বিঘা জমির খাজনা হয়ে দাঁড়ায় উহার মোট উৎপন্ন ফসলের ৩/৪ গুণ। অবস্থা দাঁড়ালো, জমি না চষলে

www.nagorikpathagar.org

সাত পুরুষের সঞ্চিত সোনা-দানা, কাঁসা-পিতল বিক্রি করে ৩ গুণ দামে চাউল কিনে খাওয়া যায়। কিন্তু জমি চষলে চাউলের দামের চেয়েও কয়েকগুণ বেশী খাজনা দিতে হয়। ১৭৬৯ সালের মধ্যেই বাংলার কৃষকদের অনেকেই চাষাবাদ বর্জন করতে বাধ্য হলো। প্রশ্ন উঠতে পারে খাজনা এতো বৃদ্ধি পেলো কিভাবে?

পলাশীর যুদ্ধের প্রাক্কালে আলীনগর সন্ধির অপমানজনক শর্ত ও ১০ই জুন তারিখে সম্পাদিত "বিশ্বাসঘাতকতা চুক্তি" দলিলে কোলকাতার পার্শ্ববর্তী ২৪ পরগণা এলাকা ইংরেজদেরকে দেয়া হয়। কোম্পানীর কোর্ট অব ডাইরেক্টরদেরকে লেখা কোলকাতা কাউন্সিলের এক পত্র থেকে জানা যায় যে, জমিদার উহার অন্তর্ভূক্ত ৪,৩৪,৮০৪ বিঘা জমির খাজনা বিঘাপ্রতি আট আনারও কম হারে ২,২২,৯৫৮ টাকা ১০ আনা ১ পাই দিতেন। [Murshid Kuli & His Times, P-87]

পলাশী যুদ্ধের পর তারা নিজেরা খাজনা আদায়ের ঝামেলা এড়াবার জন্যে ২টি পরগণার রাজস্ব নিলাম ডাকার মাধ্যমে ইজারা দেন। দেখা যায়, নব্য হিন্দু কোটিপতি বণিকেরা প্রথম বছরেই উক্ত এলাকা ৭,৬৫,৪০০ টাকায় নিলামে ডেকে নেয়। পরে নিলামে টাকার পরিমাণ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকে। ইজারাদারেরা প্রথম বছরই প্রজাদের কাছ থেকে বিঘাপ্রতি ২ টাকা বারো আনা আদায় করে [আব্দুর রহীম, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১১৬]। ফলে ইংরেজরা দেখতে পান, বাণিজ্যের চেয়েও ভূমি-রাজস্বে নির্ঝামেলা বিপুল মুনাফা মেলে। এর ফলে দেশের রাজস্বকে ব্যবসায়ে পরিণত করার জন্যে তারা ব্যাকুল হয়ে উঠেন। ১৭৬৫ সালের ১২ই আগস্ট তারা বাদশাহ দ্বিতীয় শাহ আলমের কাছ থেকে বার্ষিক ২৬ লক্ষ টাকা প্রদানের ওয়াদায় বাংলার দীওয়ানী ক্ষমতা গ্রহণ করেন এবং সে বছরই শিখণ্ডী নবাব নাজমুদ্দৌলার কাছ থেকে বার্ষিক বৃত্তি মঞ্জুরীর বিনিময়ে বাংলার প্রশাসনিক ক্ষমতাও নিয়ে নেন।

বর্ণহিন্দু জমিদার ও মনসবদারেরা ১৭৫৬ সালের কোলকাতা যুদ্ধের সময় থেকে ইংরেজদেরকে দেশীয় সৈন্য সরবরাহ করতে থাকেন। অতঃপর বক্সারের যুদ্ধ পর্যন্ত ১১টি যুদ্ধে তাদেরকে নিয়ে ইংরেজরা বিজয়ী হবার অবকাশে সেসব দেশীয় হিন্দু সৈন্যরা সরবরাহকারীদের চেয়ে ইংরেজদের প্রতি অধিক অনুগত হয়েওঠে।

www.nagorikpathagar.org

এমতাবস্থায় ক্ষমতায় পাকাপোক্ত হবার পরই ১৭৬৫ সাল থেকে কোম্পানী সরকার, প্রয়োজন ফুরিয়ে যাওয়ায়, খারিজ হওয়া প্রশাসনিক ও সামরিক জায়গীরসমূহ, সরকারের খাজনা বা খাস সম্পত্তিসমূহ এবং ছোটখাটো মুসলমান জমিদারীগুলো সব মিলিয়ে প্রায় ৬ শত পরগণা ১০ সালা ও ৫ সালা ইজারা ভিত্তিতে নিলাম করতে শুরু করেন, আর নব্য হিন্দু ধনিক বণিকেরা তা খরিদ করতে থাকেন। বাংলার ১৬৬০টি পরগণার প্রায় ১ হাজার পরগণা ছিল হিন্দু জমিদারীভুক্ত। সে সময়ে মাত্র ১৫টি জমিদারীভুক্ত ছিল ৬৫৬টি পরগনা। নাটোর জমিদারীতে মুর্শিদকুলী খাঁর আমলে ১৩৯টি, আলীবর্দী খাঁর আমলে ১৬৪টি এবং ১৭৬৫ সালের পর ১৮১টি পরগণা অন্তর্ভুক্ত হয় [কে, পি, সেন, বাংলার ইতিহাস, পৃঃ ৯৬]। সে সব বড় জমিদারীর কোনটি নিলামে উঠেছিল বলে ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় না। রাজা মহারাজারা এবং নিলামপ্রাপ্ত নতুন জমিদারেরা সরকার নির্ধারিত বর্ধিত খাজনার দোহাই দিয়ে নিজেরাও প্রজা ঠেংগিয়ে বিপুল বিত্ত সংগ্রহ করেছিলেন।

সব মিলিয়ে খাজনার পরিমাণ হয়ে দাঁড়ায় প্রতি বিঘায় ৪/৫ টাকা। ১৫ বছরে টাকার মুদ্রামান অর্ধেক হ্রাস পেয়েছিল ধরে নিলেও তখনকার ১ টাকা এখন ১ হাজার টাকার সমান। এক বিঘা জমিতে ৪/৫ হাজার টাকা খাজনা ! অবিশ্বাস্য।তবুওসত্য।

এরই পাশাপাশি, কাপড়, রেশম, আফিম, সল্টপিটার চিনি ছাড়াও, অভ্যন্তরীণ বাজারে ধান–চাউল, লবণ, পান–সুপারীর ব্যবসায়ে কোম্পানী সরকার সরকারী মনোপলি কায়েম করেন–বর্ণহিন্দু জমিদার ও তাদের প্রশাসনিক কর্মচারীদের সহায়তায় বর্ণহিন্দু গোমস্তা, দালাল ও ফড়িয়াদের মাধ্যমে তারা ব্যবসা চালাতে থাকেন। হিন্দুকর্মচারীরাও মানোপলির সুযোগে কোম্পানীর পক্ষচ্ছায়ে ধান–চাউলের ব্যবসায়ে লাভবান হতে থাকে। বর্ধিত লাভের সাথে সাথে তাদের লোভের মাত্রা এতদূর বৃদ্ধি পায় যে, ১৭৭০ সালের মাঘ মাসেই তারা সারা দেশের ধান–চাউল কিনে গুদামজাত করে ফেলে। এমনিতেই কৃষকেরা খাজনার ভয়ে চাষবাস ছেড়ে দেয়ায় সে বছর ফসলের পরিমাণ হ্রাস পায়। তার উপর মনোপলি। ফলে জৈষ্ঠ্য মাসেই দেশের নানা স্থানে মানুষ মরা মানুষের গোশত খেতে শুরু করে। [Willium Hunter, Annals of Rural Bengal, অনুঃ ওসমান গনি, পল্লী বাংলার ইতিহাস, পৃঃ ২৩] দেশের নানা স্থানে আষাঢ় মাসের মধ্যেই ইংরেজ কোম্পানী সরকারের হিসাব মতেই প্রতি ১৬ জনের ৫ জন ও শ্রাবণের শেষ নাগাদ ১৬

www.nagorikpathagar.org

জনের ৬ জন লোক দুর্ভিক্ষে প্রাণ হারায়। [হান্টার, ঐ, পৃঃ ৩৩] ভাদ্র মাসের দিকে গুদামের শস্য বাজারে আসায় এই কৃত্রিম দুর্ভিক্ষে মৃত্যুর হার কমতে শুরু করে। বছর শেষে দেখা যায়, বাংলার প্রায় তিন কোটি অধিবাসীর মধ্যে এক কোটিরও বেশী মারা গেছে। [হান্টার ঐ, পৃঃ ২৯-৩০] আর তাদের মধ্যে অন্ততঃ ৭৫ লক্ষ মুসলমান।

নবাব মুর্শিদকুলী খাঁর অতি উদারতার সুযোগ নিয়ে, মোগলাই সংস্কৃতির শিকার সুরা ও নারীতে নিমগ্ন বাংলার অভিজাত মুসলমানদেরকে প্রথমে নিশ্চিহ্ন করে, বাংলা ১১৭৬-এর মন্বন্তরের (১৭৭০) ভেতর দিয়ে বাংলার সংখ্যাগুরু সমৃদ্ধ সাধারণ মুসলমান সমাজকে সংখ্যালঘু সর্বাহারায় পরিণত করলেন বর্ণহিন্দু রাজা মহারাজা বাবুরা।

এখানেই শেষ নয়। বাংলায় ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর শাসন কায়েম হবার সাথে সাথে কোলকাতা নগরীতে দাস ব্যবসাও জমজমাট হয়ে ওঠে [কে, কে, দত্ত, হিস্টরী অব বেংগল সুবাহ]। '৭৬ -এর মহা মন্বন্তরে বাংলায় ১ কোটি লোকের মৃত্যু হবার পর ধ্বংস হয়ে যাওয়া মুসলমান পরিবারগুলোর কোন কোনটিতে দুই একজন করে এতিম বালক-বালিকা জীবন্মৃত অবস্থায় বেঁচে ছিল। বাবু বণিকেরা সারা বাংলার প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে তাদেরকে সংগ্রহ করে "বড় বড় নৌকা বোঝাই করে কলকাতায় নিয়ে এসে খোলা বাজারে জমায়েত করে" এবং ইংরেজ সিনিয়র পার্টনারদের মাধ্যমে তাদেরকে ক্রীতদাস হিসাবে ইউরোপের বিভিন্ন দেশে চালান দেয় [১৭৮৫ খৃষ্টাব্দে স্যার উইলিয়ম জোন্সের সাক্ষ্য, উদ্ধৃতি, কে, এম, আশরাফ, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৭৪; আবদুর রহিম, পূর্বোক্ত পৃঃ ২৪১]। এভাবে মুসলমানদের হাত থেকে শাসনদন্ড কেড়ে নিয়ে তাদের বিত্তবৈভব লুন্ঠন করে কৃত্রিম দুর্ভিক্ষ সৃষ্টির মাধ্যমে তাদেরকে ঝাঁকে ঝাঁকে হত্যা করে, বাংলার পুঁজি ও শিল্প একই সাথে বিলেতে পাচার করে দিয়ে সেই সঙ্গে মুসলিম সন্তানদেরকেও ক্রীতদাসরূপে চালান করে দিয়ে রাজা-মহারাজা বাবুরা তাদের অন্তর্দাহ আংশিকভাবে নিবৃত্ত করেন। ইতিহাসে পলাশীর ঘাট পেরিয়ে প্রথম বাঁকে এটাই বাংলার শ্মশান হবার করুণ বাস্তব চিত্র।

www.nagorikpathagar.org

www.pathagar.com

ওয়েসিস বুকস
OASIS
BOOKS

ওয়েসিস বুকস
একটি অঙ্গীকার

মানুষের কাছে ধর্মের প্রথম তাগিদ পড়ার জন্য। পবিত্র কোরআন শরীফের প্রথম নির্দেশ 'পড়'। 'পড় তোমার প্রভুর নামে।' কী পড়বো আমরা? এ কথা বলা হয়নি যে, স্রেফ ধর্মগ্রন্থই পড়তে হবে। এ কথাও বলা হয়নি যে, শুধু বিধিলিপির সন্ধানেই পাঠ পিপাসা নিবৃত্ত করতে হবে। পড়ার বিষয় গোটা জগত, সংসার। পড়াশুনার ক্ষেত্র দোলনা থেকে কবর পর্যন্ত বিস্তৃত। জানতে হলে পড়তে হবে। সত্য জানতে হলে আরো বেশী পড়তেহবে।

পাঠ পিপাসু সাধক মানুষের কাছে জ্ঞানের লিপিবদ্ধ দলিল, বই–পুস্তক তুলে দেবার দায়িত্ব প্রকাশকের। আমাদের দেশে প্রকাশনা জগতে শুধু সংকটই বিরাজমান নয়, সেখানে রীতিমত নৈরাজ্য আর অবক্ষয়ের বসত। উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম বাদে বেশীরভাগ বইপত্রই এখানে চটুল ইন্দ্রিয় প্রবৃত্তির উত্তেজক। এদেরকে 'বইপত্র' বলা চলে না। আর একদিকে আমাদের সমৃদ্ধ অতীত, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি আর ধর্ম বিশ্বাস ইসলামকে অবদমিত করার স্থূল প্রচেষ্টা লক্ষণীয়। যেখানে ধর্মের চর্চা চলছে সেখানেও শুধু ধর্মের আনুষ্ঠানিকতার অজস্র ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের ছড়াছড়ি। ইসলামের রাজনৈতিক ও সামাজিক অঙ্গীকার এবং আবেদনকে উহ্য রেখে এক অর্থে তারা ইসলামকে দিন দিন এক উদযাপনযোগ্য আনুষ্ঠানিকতায় পর্যবসিত করছেন।

সাহিত্য জগতে এ নৈরাজ্য আরও পীড়াদায়ক। সুন্দর সাহিত্য সৃজনীর স্থলাভিষিক্ত হয়েছে কামরতি সর্বস্ব লীলাযজ্ঞ। সাহিত্যের অনুষঙ্গ হিসাবে নয়; রতিযজ্ঞকে বেছে নেওয়া হয়েছে আধুনিক সাহিত্যের উপজীব্য হিসাবে। সমাজের বিশেষ করে বাংলাদেশের মুসলমান সমাজের ঐতিহ্য ও মূল্যবোধের সাথে সম্পূর্ণ বিরোধপূর্ণ সাহিত্যই আমাদেরকে বাধ্য হয়ে গলদঃ করণ করতে হচ্ছে।

সমাজ ও রাষ্ট্রের বিদ্যাবুদ্ধির বুনিয়াদ নির্মাণে সাহিত্যের অবদান অপরিসীম। নব্য ভঙ্গীতে বর্ণচোরা বর্ণবাদ আমাদের মন জগতে যে শ্রেষ্ঠত্বের আবহাওয়া রচনা করতে চলেছে, তা নিতান্তই অলীক। নাস্তিকতা এবং পৌত্তলিকতার মধ্যে নান্দনিক সৌকর্যের রঙ মিশে থাকতে পারে; কিন্তু আল্লাহর একত্ববাদে বিশ্বাসী মানুষের কাছে এহেন তথাকথিত শিল্পের আবেদন তার বিশ্বাসের মূল্যে বিপণনযোগ্য নয়। বিনিময়যোগ্যও নয়।

পড়াশুনা জগতে অবিশ্বাস, পৌত্তলিকতা এবং অতীত বিনাশের যে পরিকল্পিত আয়োজন, তার সীমা বহুদূর পর্যন্ত পৌঁছেছে। একে একদিনে রোধ করা যাবে না বটে। তবে অপ্রতিরোধ্যও যেতে দেওয়া চলে না। সাহিত্যের জবাব সাহিত্যেই হবে। লেখনীর প্রতিপক্ষে লেখনীকেই খাড়া করতে হবে। এই সাহিত্য প্রয়াসে "ওয়েসিস বুকস" ক্ষুদ্র প্রয়াস; তবে অঙ্গীকারাবদ্ধ পদক্ষেপ। নাগিনীর বিষাক্ত নিঃশ্বাসে দেশের সবুজ শান্ত মুখরিত প্রান্তরে আজ যে অসহ্য দাবদাহ তার মধ্যে নির্মল ও সত্য সাধনার মরুদ্যানের আশ্রয় গড়ে তোলার ওয়াদা নিয়েই 'ওয়েসিস বুকস'–এর পথপরিক্রমা শুরু। আমাদের নির্বাচন, গ্রন্থনাশৈলি এবং অনুবাদ কর্মে প্রস্ফুটিত করার চেষ্টা করবো এ দেশের সেই সমৃদ্ধ শিল্প সাহিত্যের ধারা, মাঝ পথে যার গতিকে রুদ্ধ করে দেয়া হয়েছিলো।

ওয়েসিস বুকস হোক আপনার আত্মজিজ্ঞাসা, আত্মানুসন্ধান এবং সুস্থ মন–মানসিকতা বিকাশের সাথী।